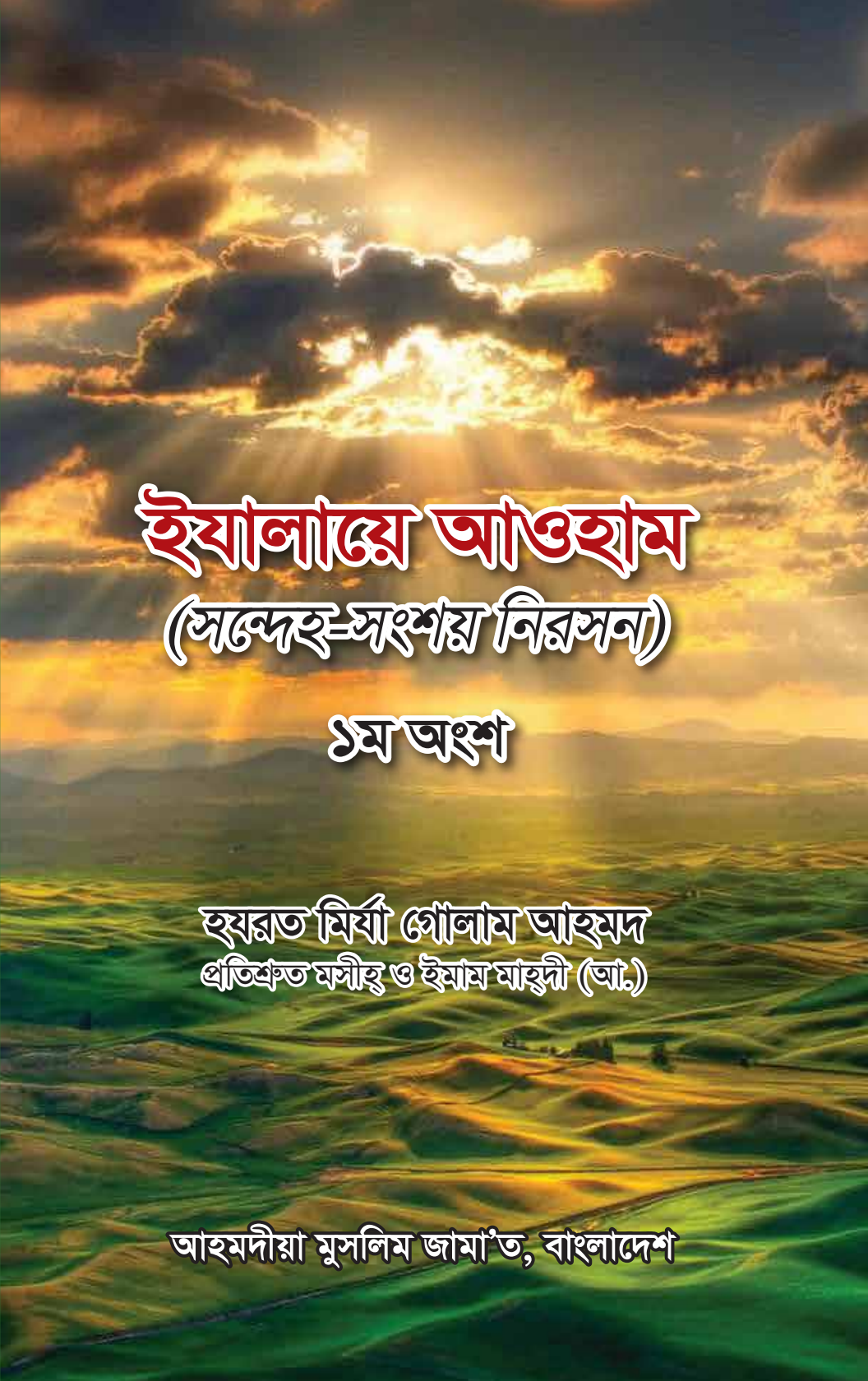


ইযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

১ম অংশ

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ



ইযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

১ম অংশ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ইযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

১ম অংশ



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ইযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

১ম অংশ

গ্রন্থস্বত্ব | **ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.**

প্রকাশনায় | **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**
৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল | **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

ভাষান্তর | **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

প্রকাশকাল | ডিসেম্বর ২০২৪

সংখ্যা | ১০০০ কপি

মুদ্রণে | ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Izala-e-Auhaam
(The Removal of Misconceptions)
Part-1

ইযালায়ে আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
১ম অংশ

by
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as]
The Promised Messiah and Imam Mahdi

1st Published in Bangladesh in December 2024

Translated into Bangla by
Maulana Ahmad Sadiq Mahmud

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN **978-984-991-070-1**

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা বাংলা ভাষায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় তবলীগের ময়দানে অত্যন্ত কার্যকরী তাঁর যুগান্তকারী পুস্তক 'ইযালায়ে আওহাম' পুস্তকটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পর একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের পুস্তক।

'ফতেহ ইসলাম' ও 'তওযিয়ে মারাম' প্রকাশের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরম বিরোধিতা শুরু হয়। তৎকালীন আলেম সম্প্রদায়ের বড়ো একটি অংশ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পুস্তকপুস্তিকা রচনা করতে থাকে, পাড়ায় পাড়ায়, শহরে বন্দরে সভা সমাবেশ করে, হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় এবং সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার অপকৌশল অবলম্বন করে। সেই দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লুধিয়ানা শহরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতার এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। এ পরিস্থিতির ভেতরই তিনি (আ.) 'ইযালায়ে আওহাম' নামের এই পুস্তকটি রচনা করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিলপ্রমাণের আলোকে বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.) যে মৃত্যুবরণ করেছেন তা তিনি এ পুস্তকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। এতে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআন থেকে ত্রিশটি আয়াত উপস্থাপন করেন। তাই পাঠকদের এ পুস্তক পাঠকালে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর উক্তি "আমাদের দাবির মূল ভিত্তি হচ্ছে হযরত ঈসা (আ.)-এর মুত্যু" মানসপটে রেখে এ পুস্তকটি পাঠ করা উচিত (লেকচার শিয়ালকোট)। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে থেকে মোট বারোটি মৌলিক আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব তিনি (আ.) এ পুস্তকে দিয়েছেন। আশা করি বাংলা ভাষাভাষি মানুষের জন্য এ পুস্তক পথের দিশারী হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের আলোকে 'ইযালায়ে আওহাম' পুস্তকটি পাঠক বান্ধব করে তোলার জন্য মূল পুস্তকের

বিপরীতে, বাংলা অনুবাদে পুস্তকের মূল অংশ একটানা উপস্থাপন করা হয়েছে, এরপর টিকাগুলো ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

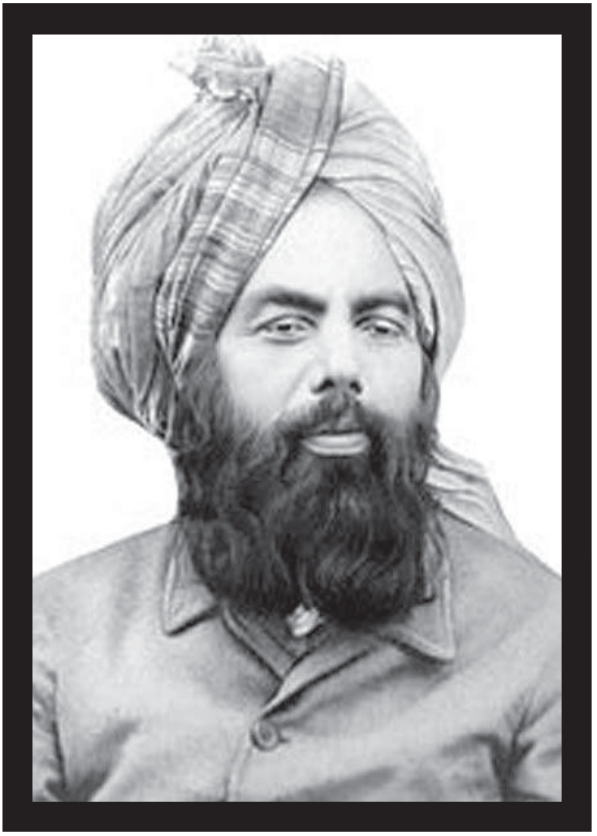
পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বুযূর্গ মোহতরম মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন এবং তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমীন।

আর এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তারা হলেন, সর্বজনাব মওলানা ফিরোজ আলম, আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোবারিজ আহমদ, শেখ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম। এছাড়াও যারাই একাজে অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন। আশা করি সত্যকে অনুসন্ধানে এ পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে এবং তাদের হৃদয়ের সকল সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত করে হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হতে সাহায্য করবে– মহান আল্লাহর সমীপে এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

আব্দুল আউয়াল খান চৌ. ১১.১২.২৪

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

লেখক পরিচিতি



প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন

ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন– কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হবার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২২০টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোটো ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	**ইযালায়ে আওহাম**	১
২.	**আমরা এবং আমাদের সমালোচকরা**	৭
৩.	**মসীহ্ কর্তৃক রূপক ভাষায় বর্ণিত তাঁর পুনরাগমনের চিহ্নাবলি এবং সূরা আল যিল্যালের তফসীর**	২২
৪.	**আমাদের ধর্মবিশ্বাস**	৪১
৫.	**প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১** (ফার্সি কবিতার অনুবাদ)	৫২
৬.	**প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে এ অধমকে যারা গ্রহণ করলেন আর যারা তাকে অস্বীকার করলেন এতদুভয়ের মাঝে নিরাপত্তা ও সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী কে বা কারা?**	৫৮
৭.	**ভারতবর্ষের আলেমদের সমীপে সবিনয় নিবেদন**	৬৫
৮.	**মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর**	১২৫
৯.	**টীকাসমূহ:**	১৮৩
	• প্রথম টীকা	১৮৫
	• দ্বিতীয় টীকা	১৮৬
	• তৃতীয় টীকা	১৮৮
	• চতুর্থ টীকা	১৮৯
	• পঞ্চম টীকা	১৮৯
	• ষষ্ঠ টীকা	২১৪
	• সপ্তম টীকা	২১৪
	• অষ্টম টীকা	২১৪
	• নবম টীকা	২১৪
	• দশম টীকা	২১৫
	• একাদশ টীকা	২১৬
	• দ্বাদশ টীকা	২১৭
	• ত্রয়োদশ টীকা	২২৭

ইযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)



হে সন্দিহানরা!

আসমানী মীমাংসার দিকে চলে আসুন।

হে প্রবীণরা! হে মৌলবী সাহেবান ও জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ! খোদা তা'লা আপনাদের দৃষ্টি উন্মোচিত করুন। ক্রোধ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সীমাতিক্রম করবেন না। আমার এ গ্রন্থের উভয় অংশ গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন, কেননা এতে আলো ও হেদায়াত রয়েছে। খোদা তা'লাকে ভয় করুন এবং কাফির আখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। খোদা তা'লা খুব ভালো জানেন যে, আমি একজন মুসলমান।

آمَنْتُ بِاللهِ وملائكته وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاتقوا الله ولا تقولوا لست مسلماً و اتقوا الملك الذي إليه ترجعون.

(অর্থ: আমি আল্লাহ্তে ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান রাখি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক–অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। অতএব আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। 'তুমি মুসলমান নও'– এমনটি বলো না আর সেই সর্বাধিপতিকে ভয় কর যার দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'– অনুবাদক)।

এ পুস্তক পাঠের পরও যদি সন্দেহ থাকে তাহলে আসুন এবং পরীক্ষা করুন! খোদা কার সাথে আছেন। হে আমার বিরোধী ধ্যানধারণা পোষণকারী মৌলবী, সুফি ও গদ্দিনশিনগণ যারা আমাকে কাফির আখ্যাদাতা ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী! আমাকে

নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, আপনারা যদি সম্মিলিতভাবে বা এককভাবে সেই সব ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে আমার মোকাবিলা করতে চান যা 'রাহমান' আল্লাহ্‌র বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে খোদা তা'লা আপনাদের লজ্জিত করবেন এবং আপনাদের গোমর ফাঁস করে দেবেন আর তখন আপনারা দেখতে পাবেন, তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এই মোকাবিলায় প্রকাশ্যে মাঠে নামবে এবং পত্রপত্রিকায় সাধারণ ঘোষণা দিয়ে আমার প্রভু আমার সাথে গ্রহণযোগ্যতার যে-সব সম্পর্ক রাখেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (খোদার সাথে) নিজের সম্পর্কের তুলনা করবে? স্মরণ রেখো! খোদা সত্যবাদী নিষ্ঠাবানদের সহায়ক। তিনি তারই সাহায্য করবেন যাকে তিনি সত্যবাদী বলে জানেন। চালাকি-চাতুর্য থেকে নিবৃত্ত হও।

কেননা তিনি নিকটেই রয়েছেন। তোমরা কি তাঁর সাথে লড়বে? কেউ কি অহংকারসুলভ লম্ফ-ঝম্প দেখিয়ে প্রকৃতপক্ষে উঁচু হতে পারে? কেবল কথার তীক্ষ্ণতায় সত্যকে কেটে ফেলতে পার? সেই সত্তাকে ভয় কর যাঁর ক্রোধ সব ক্রোধের ঊর্ধ্বে।

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

[অর্থাৎ 'নিশ্চয় যে তার প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে তার জন্য অবশ্যই এমন জাহান্নাম রয়েছে যেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না' *(সূরা তাহা: ৭৫)*– অনুবাদক]

বিনীত উপদেশক–
গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
(কাদিয়ান নিবাসী)
লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ والسلام على قوم موجع سيما على امام الأصفياء وسيد الانبياء محمدًا المصطفى واٰله واصحابه اجمعين. اللّٰهم ارزقنا انوار اتباعه واعطنا ضوءه بجميع انواعه برحمتك عليه واشياعه

(অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, শান্তি বর্ষিত হোক 'শোকাহত জাতি'র ওপর, বিশেষত পবিত্রদের ইমাম ও নবীদের নেতা মুহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁর 'আল' ও 'আসহাবে'র ওপর। হে আল্লাহ্! তাঁর অনুগমন ও অনুসরণের নূর তার সর্ববিধ কল্যাণসহ আমাদের দান কর। আমরা তাঁর এবং তাঁর অনুসারী জামা'তসমূহের স্বপক্ষে তোমার রহমতের প্রত্যাশী– অনুবাদক)।

এ প্রশ্নের উত্তরে যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃতদের জীবিত, অন্ধদের চক্ষুষ্মান এবং বধিরদের শ্রবণশক্তি দান করেছেন– এসব নিদর্শনের মধ্য থেকে 'মসীলে মসীহ্' (অর্থাৎ 'মসীহ্‌র সদৃশ' এ অধম) কী দেখিয়েছে?

প্রথমত এ স্থলে এ উত্তর যথেষ্ট যে, মুসলমানরা যে মসীহ্‌র জন্য অপেক্ষমান তাঁর সম্পর্কে হাদীসে আদৌ একথা লেখা নেই যে, তাঁর হাতে মৃত জীবিত হবে, বরং লেখা আছে, তাঁর ফুৎকারে জীবিতরা মারা যাবে। তাছাড়া খোদা তা'লা এ অধমকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন যাতে আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের জীবিত করা হয়, বধিরদের কান খোলা হয় ও কুষ্ঠদের পরিষ্কৃত করা হয় আর যারা কবরে পড়ে আছে তাদের বের করা হয়। এছাড়া এ-ও একটি সাদৃশ্যের বিষয় যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যেমন ইঞ্জিলে তওরাতের সঠিক সারসংক্ষেপ এবং প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করেছিলেন এ (রূপ) কাজের জন্যই এ অধম প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যেন উদাসীনদের বুঝাবার জন্য পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়। মসীহ্ কেবল তওরাতের আদেশাবলি জোরালো ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার জন্য এসেছিলেন। একইভাবে এ অধমও প্রেরিত হয়েছে পবিত্র কুরআনের আহ্‌কাম বিশদভাবে বর্ণনা করার জন্য। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, সেই মসীহ্ মূসাকে দেয়া হয়েছিল আর এই মসীহ্ মূসার সদৃশকে [তথা মুহাম্মদ (সা.)] কে দান করা হয়েছে।

অতএব এ যাবতীয় সাদৃশ্য তো সপ্রমাণিত এবং আমি সত্য সত্য বলছি, মসীহ্‌র হাতে জীবনপ্রাপ্তরা মরে গেছে কিন্তু যারা আমার হাতে আমাকে প্রদত্ত সুধা পান করবে, তারা কখনো মরবে না। যে-সব জীবনসঞ্চারী কথা আমি বর্ণনা করি এবং

যে-সব জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় তার অনুরূপ অন্য কেউ যদি বর্ণনা করতে পারে তাহলে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসি নি। কিন্তু এই সব জ্ঞানতত্ত্ব যা মৃত হৃদয়ের জন্যে জীবন সুধার মর্যাদা রাখে তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব না হলে তোমাদের কাছে এ অপরাধের কোন যুক্তি নেই (বলেই সাব্যস্ত হবে) যে তোমরা যার পক্ষ থেকে তিনি এসেছেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যা আকাশে উৎসারিত করা হয়েছে– পৃথিবীর কেউ একে রোধ করতে সক্ষম নয়। কাজেই তোমরা মোকাবিলা করার জন্য তড়িঘড়ি কোরো না এবং জেনেশুনে নিজেদেরকে খোদা তা'লার সেই অভিযোগের আওতাধীন কোরো না যে,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

[অর্থাৎ যে সম্পর্কে তোমার প্রকৃত জ্ঞান নেই তা নিয়ে আপত্তি তুলবে না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় –এগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে *(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭)*– অনুবাদক]। কুচিন্তা ও কুধারণা পোষণে সীমা ছাড়িয়ে যেও না। নিজেদের কথায় তোমরা ধরা পড়বে এমনটি যেন না হয়, সেই দুঃখজনক অবস্থানে তোমাদের আবার বলতে হয় :

مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ

[অর্থাৎ কী হলো যে, আমরা সেই সব লোকদের দেখতে পাচ্ছি না যাদের আমরা দুষ্কৃতি প্রবণদের অন্যতম বলে গণ্য করতাম *(সূরা সোয়াদ: ৬৩)*– অনুবাদক]।

ফার্সি কবিতার অনুবাদ

যে-ব্যক্তি তার অধৈর্য ও অনুদার চিত্ততা ও তার দরুন তাৎক্ষণিকভাবে সত্যের প্রতি অস্বীকৃতি জানায় সে বস্তুতই বুদ্ধিমান নয়।

সত্যান্বেষীর ধৈর্য ধরতে হবে। কেননা দুনিয়ায় প্রত্যেকটি বীজ যে-রকম গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সে অনুযায়ীই তাতে ফল ধরে।

মানুষের কিছুটা অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্যোতিরও প্রয়োজন, যাতে সত্য আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়।

সত্যবাদীদের অভ্যন্তরীণ সততাও নিষ্ঠা লুকিয়ে থাকতে পারে না। প্রচ্ছন্ন জ্যোতি মানুষের ললাটে ঝলক সৃষ্টি করে।

যে-ব্যক্তি প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ লাভের সুরা ভরা পেয়ালার পর পেয়ালা পান করে তার রসনা সবসময় তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ-সুখ প্রকাশ করতে থাকে।

হে মুসলমানরা! তোমরা যদি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ও তাঁর পবিত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী এবং ঐশী সাহায্যের প্রতিক্ষায় থাক তাহলে নিশ্চিত জেনো যে, সাহায্যের সময় এসে গেছে এবং এই কর্মকাণ্ড মানুষের পক্ষ থেকে নয়। কোন মানবীয় পরিকল্পনা এর ভিত্তি স্থাপন করে নি। বরং এটি সেই প্রভাতের উদয় যে সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থাবলিতে পূর্বেই সংবাদ দেয়া হয়েছিল। খোদা তা'লা একান্ত প্রয়োজনের সময়ে তোমাদের স্মরণ করেছেন। তোমরা এক ধ্বংসাত্মক গহ্বরে নিপতিত হবার দ্বারপ্রান্তে ছিলে কিন্তু তাঁর স্নেহশীল হাত ত্বরিত তোমাদের রক্ষা করেছে। অতএব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আনন্দে উল্লসিত হও যে, আজ তোমাদের সঞ্জীবিত হওয়ার দিন সমোপস্থিত। খোদা তা'লা সত্যবাদীদের রক্তে সিঞ্চিত নিজ ধর্মের উদ্যানটিকে কখনো বিনষ্ট হতে দিতে চান না। তিনি কখনো এটা চান না যে, অন্যান্য জাতির ধর্মগুলোর মতো ইসলামও একটি পুরোনো কেচ্ছা-কাহিনির আকর হোক যাতে সদ্য মজুদ কোনো কল্যাণ ও আশিস নেই। তিনি পূর্ণ অমানিশা বা অমাবস্যার যুগে নিজ পক্ষ থেকে জ্যোতি দান করে থাকেন। অন্ধকার রজনীর পর আলো উদ্ভাসিত করেন। অন্ধকার রাতের পর কি নতুন চাঁদের উদয়ের জন্যে অপেক্ষা করা হয় না? অমাবস্যার রাত তথা অন্ধকারের শেষ রাতটি দেখে তোমরা কি নির্ধারণ কর না যে, আগামী কাল নতুন চাঁদ উদিত হবে? পরিতাপ, তোমরা এ পৃথিবীতে বিরাজমান প্রকৃতির নিয়মকে তো খুব ভালো বোঝো কিন্তু এরই অনুরূপ এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিয়মটি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত!

হে কামনা-বাসনার পূজারি মৌলবী ও বকধার্মিক! আক্ষেপ, স্বর্গীয় দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হোক তা তোমরা একদমই চাও না, বরং তোমরা চাও, এগুলো সর্বদা বন্ধই থাক যেন তোমরাই গুরু হয়ে বিরাজ করতে পার। নিজেদের হৃদয়ে উঁকি মারো এবং নিজেদের ভেতরকার জগতকে যাচাই করে দেখো, তোমাদের জীবন কি সংসারাসক্তি থেকে মুক্ত? তোমাদের হৃদয়ে কি সেই মরিচা নেই যার কারণে তোমরা এক অন্ধকারে পড়ে আছ? যারা হযরত মসীহ্র সময়ে দিনরাত প্রবৃত্তি পূজায় নিমগ্ন থাকত, তোমরা কি সেই সব ফকীহ্ ও ফরিসির (অর্থাৎ ইহুদি পণ্ডিত ও পুরোহিতদের) চেয়ে কোন অর্থে কম? তাই এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা মসীলে মসীহ্র জন্য হযরত ঈসার সাথে সাদৃশ্যের বেশ কিছু উপকরণ নিজেদের হাতেই উপস্থাপন করছ, যাতে খোদা তা'লার অকাট্য যুক্তি সর্বতোভাবে তোমাদের ওপর প্রযোজ্য হয়। আমি সত্য সত্য বলছি, একজন কাফিরের মু'মিন হয়ে যাওয়া তোমাদের ঈমান আনার চেয়ে সহজতর বিষয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আসবে এবং এই মায়েদা বা স্বর্গীয় আতিথ্য থেকে অংশ লাভ করবে কিন্তু

তোমাদের এই মরিচা ধরা অবস্থার মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে। হায়, তোমরা যদি কিছুটা হলেও চিন্তাভাবনা করতে!

আর সাদৃশ্যের জন্যে মসীহ্‌র প্রথম জীবনের যে-সব মু'জেযা বা নিদর্শন দাবি করা হয় সে সম্পর্কে এক্ষণই বর্ণনা করে এসেছি, দৈহিকভাবে জীবিত করা কোনো গুরুত্বই রাখে না। আধ্যাত্মিক জীবন দানের জন্যে এ অধম প্রেরিত হয়েছে এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। অবশ্য মসীহ্‌র প্রকৃত কাজগুলোকে যদি সেসব টীকাটিপ্পনী বা সংযোজন-বিয়োজন থেকে পৃথক করে দেখা হয় যা প্রতারণামূলকভাবে বা ভুল বুঝার কারণে গড়া হয়েছে তাহলে অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় না। বরং মসীহ্‌র নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো সম্পর্কে যে পরিমাণ আপত্তি ও সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয় তা অন্য কোন নবীর অলৌকিক ক্রিয়া বা ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষেত্রে কখনো হয়েছে বলে আমি মনে করি না। পুকুর সম্পর্কিত কাহিনিটি কি খ্রিষ্টীয় নিদর্শনের চমক দূর করে দেয় না? আর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর অবস্থা তো এর চেয়েও শোচনীয়। ভূমিকম্প হবে, মহামারির প্রাদুর্ভাব হবে, যুদ্ধ বিগ্রহ হবে, দুর্ভিক্ষ ঘটবে– এসবও কি কোন ভবিষ্যদ্‌বাণী! এর চেয়েও আক্ষেপের বিষয় হলো, হযরত মসীহ্‌র যে পরিমাণ ভবিষ্যদ্‌বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে, সমপরিমাণ সঠিক প্রমাণিত হয় নি। তিনি ইহুদা স্কুউতিকে বেহেশতের বারটি সিংহাসনের মধ্যে একটি সিংহাসন দান করেছিলেন কিন্তু সে তা থেকে পরিশেষে বঞ্চিত থেকে যায়। পিটারকে তিনি কেবল সিংহাসনই নয় বরং আকাশের চাবিও দিয়ে দিয়েছিলেন আর কারো জন্য বেহেশতের দ্বার রুদ্ধ বা উন্মুক্ত হবার বিষয়টি তারই কর্তৃত্বাধীন রেখেছিলেন।

কিন্তু পিটার যে শেষ বাক্যটির মাধ্যমে হযরত মসীহ্‌ থেকে বিদায় নিয়েছিল তা হলো সে মসীহ্‌র সামনেই মসীহ্‌র প্রতি অভিসম্পাত করে ও কসম খেয়ে বলেছিল, 'আমি এ ব্যক্তিকে চিনি না। এরূপ আরো অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যা পূর্ণ হয় নি, কিন্তু এ বিষয়টি আপত্তির নয়; কেননা দিব্যদর্শনে লব্ধ বিষয়াদিতে 'ইজতিহাদী' (বুঝার বা বিশ্লেষণের) ভুলত্রুটি নবীদেরও হয়ে থাকে। হযরত মূসার কতক ভবিষ্যদ্‌বাণীও যে আকারে পূর্ণ হবে বলে তিনি আশায় বুক বেধেছিলেন সেভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন হয় নি। এ প্রসঙ্গে মোদ্দাকথা এটাই যে, হযরত মসীহ্‌র ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ অন্যদের চেয়ে বেশি ভুল সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু মূল ঐশীবাণীতে এ ভুল ছিল না বরং 'ইজতিহাদী' তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বুঝার ভুল ছিল। যেহেতু মানুষ ছিলেন এবং মানুষের রায় বা অভিমত সঠিক ও ভ্রান্ত উভয়টি হওয়া সম্ভব, তাই (তাঁর ক্ষেত্রে) এসব 'ইজতিহাদী' ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হয়।

এক্ষেত্রে খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরত ঈসা মু'জেযা দেখাতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলেন, তিনি কখনো কোন নিদর্শন দেখাতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এক স্তূপ পরিমাণ মু'জেযা তাঁর প্রতি আরোপ করছে। তারা দেখে না যে, তিনি নিজে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে যাচ্ছেন। তাই হিরোডিসের সামনে হযরত মসীহ্কে যখন উপস্থিত করা হয় তখন হিরোডিস মসীহ্কে দেখে খুব আনন্দিত হয়। কেননা তাঁর কাছে তার কোন মু'জেযা দেখার আশা ছিল। হিরোডিস যদিও এ সম্পর্কে মসীহ্কে অনেক আবেদন-নিবেদন করে, তবুও তিনি কোন উত্তরই দেন নি। তখন হিরোডিস তার সঙ্গীসাথীসহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। দেখুন, লুক: ২২ অধ্যায়।

এখন লক্ষ করা উচিত, হযরত মসীহ্র মধ্যে যদি খ্রিষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী 'ইক্বতিদারী' তথা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকত তাহলে নিশ্চয় হযরত মসীহ্ তাঁর ভক্ত এবং তাঁর নিজের দেশের বাদশাহ হিরোডিসকে কোনো অলৌকিক কাণ্ড দেখাতেন। কিন্তু তিনি কিছুই দেখাতে পারেন নি। বরং ফকীহী ও ফরিসিরা, (অর্থাৎ ইহুদি পণ্ডিত-পুরোহিতরা) রোম সম্রাটের দরবারেও যারা অনেক সম্মানের অধিকারী ছিল তারা একবার হযরত মসীহ্র কাছে নিদর্শন দাবি করলে তিনি তাদের উত্তেজিত হয়ে ক্রোধপূর্ণ সম্বোধন করে বলেন, 'এ যুগের পাপাচারী ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকেরা নিদর্শন খুঁজে* কিন্তু ইউনুস নবীর নিদর্শন ছাড়া তাদের অন্য কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না।' দেখুন মথি: ১২ অধ্যায় ৩৯ পদ। হযরত মসীহ্ যে ইউনুস নবীর নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এর দ্বারা হযরত মসীহ্ এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'ইউনুস নবী যেভাবে মাছের পেটে মারা যান নি, বরং জীবিত ছিলেন এবং জীবিতাবস্থায় বেরিয়ে আসেন, অনুরূপভাবে আমিও মরব না এবং কবরে মৃতাবস্থায় প্রবেশ করব না।'

আমরা এবং আমাদের সমালোচকরা

কতিপয় ব্যক্তি সমালোচনার আদলে এ অধমের দোষ গুনিয়েছে। যদিও মানুষ দোষমুক্ত নয় আর হযরত মসীহ্র একথা বলা যথার্থ যে, 'আমি নেক নই, নেক কেবল একজনই, অর্থাৎ খোদা।' কিন্তু এরূপ ছিদ্রান্বেষণ যেহেতু ধর্মীয় কার্যক্রমের

** প্রথম টীকা ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং সত্যের সন্ধানকারীদের সত্যের পানে আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, একারণে সংক্ষেপে কতক সমালোচনার উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম ছিদ্রান্বেষণঃ এ অধমের প্রথম যে ছিদ্রান্বেষণটি করা হয়েছে তা হলো, নিজের বইপুস্তকে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের জন্য কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। এর দরুন বিরুদ্ধবাদীরা উত্তেজিত হয়ে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ও তাঁর সম্মানিত রসূলের অবমাননা করেছে এবং গালিগালাজপূর্ণ বইপুস্তক প্রকাশ করেছে। অথচ কুরআন করীমে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে যে, বিরোধীদের উপাস্যদেরও গালমন্দ দেবে না পাছে তারাও না বুঝে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষবশত খোদা তা'লাকে গালমন্দ করে বসে কিন্তু প্রত্যাদিষ্টদের রীতির বিপরীতে এস্থলে গালমন্দ ও অভিসম্পাত করা হয়েছে।

উত্তরঃ স্পষ্টভাবে জানা উচিত, আপত্তিকারী মহোদয় উক্ত সমালোচনায় সেসব ভাষা বা শব্দ উপস্থাপন করেন, যা তাঁর দাবি অনুসারে এ অধম তার বইপুস্তকে ব্যবহার করেছে আর তা সত্যিই গালমন্দের অন্তর্ভুক্ত। আমি সত্য সত্য বলছি, আমার জানা মতে আমি কোথাও একটি শব্দও এমন ব্যবহার করি নি যা গালমন্দের আওতায় পড়ে। চরম প্রতারণামূলক বিষয় হলো, অধিকাংশ লোক গালমন্দ ও বাস্তব অবস্থা তুলে ধরাকে সমানভাবে দেখে আর দুটি ভিন্ন ভাবের মাঝে তারা পার্থক্য করতে জানেন না। বরং প্রত্যেক এমন কথাকে যা প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্তব ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে এবং যা নিজ স্থানে খাপ খায়, শুধু এর (মাঝে বিদ্যমান) কিছুটা তিক্ততার কারণে যা সত্য কথনের সাথে আবশ্যকীয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে, তারা গালমন্দ বলেই ধরে নেন। অথচ গালমন্দ ও কটুকথা কেবল সে বিষয়ের নাম যা বাস্তব ঘটনার বিপরীত এবং মিথ্যা হিসেবে কেবল কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক কঠোর ও কষ্টদায়ক বক্তব্যকে যদি কেবল এর (সাথে জড়িত) তিক্ততা ও কঠোরতার কারণে গালমন্দের আওতাভুক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের মানতে হবে যে, সমগ্র কুরআন গালমন্দে পরিপূর্ণ।

কেননা প্রতিমাসমূহের অসারতা ও হীনতায় এবং প্রতিমা পূজারিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও তাদের প্রতি অভিসম্পাত ও নিন্দাসূচক যে-সব কঠোর শব্দ কুরআন শরীফে ব্যবহার করা হয়েছে– এগুলো কখনো এমন নয় যা শ্রবণে প্রতিমা পূজারিদের অন্তর প্রফুল্ল হবে। বরং নিঃসন্দেহে এ শব্দগুলো তাদের ক্রোধের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি করে থাকবে। মক্কাবাসী কাফিরদের লক্ষ করে খোদা তা'লার–

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

[(অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যা কিছুর তোমরা উপাসনা করে থাক তা সবই জাহান্নামের ইন্ধন মাত্র *(সূরা আল আম্বিয়াঃ ৯৯)*– অনুবাদক] বলা কি আপত্তিকারীর

ধারণা অনুযায়ী কটু কথার অন্তর্ভুক্ত হবে না? কুরআন শরীফে খোদা তা'লার কাফিরদের 'শাররুল বারিয়্যাহ' আখ্যা দেয়া আর সকল হীন ও তুচ্ছ সৃষ্টি হতে তাদের নিকৃষ্ট আখ্যা দেয়া আপত্তিকারীর মতে কি গালমন্দ নয়? খোদা তা'লা কি কুরআন করীমে وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [তাদের প্রতি কঠোর হও'– *(সূরা আত তাওবা: ৭৩)*] বলেন নি? মু'মিনদের চিহ্নাবলির মাঝে কি أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ['কাফেরদের প্রতি কঠোর'– *(সূরা আল ফাতহ: ৩০)*] নির্ধারণ করা হয় নি? ইহুদিদের সম্মানিত উলামা ও ফরিসিদের হযরত মসীহ্ কর্তৃক 'শূকর ও কুকুর' বলে আখ্যায়িত করা এবং গলিলের মহা মর্যাদাবান শাসক হিরোডিসকে 'শৃগাল', সম্মানিত প্রধান (ইহুদি) পুরোহিত ও ফকীহ্দের 'বেশ্যাদের সাথে তুলনা করা এবং ইহুদিদের সম্মানিত নেতা যারা (রোমান) রাজত্বে উচ্চ মর্যাদাশীল ও রাজ্যসভায় আসন লাভকারী ছিল তাদেরকে ঘৃণ্য মর্মপীড়াদায়ক এবং ভদ্রতা বিবর্জিত শব্দাবলিতে স্মরণ করা যেমন– 'তোমরা জারজ (কুকর্মকারী, দুষ্ট, বজ্জাত, বেঈমান, আহাম্মক, ভণ্ড, শয়তান, জাহান্নামী, সাপ ও সাপের বাচ্চা'– এসব শব্দ কি আপত্তিকারীর অভিমত অনুযায়ী অশ্লীল ও নোংরা গালিগালাজ নয়? বস্তুত এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আপত্তিটি কেবল আমার এবং আমার বইপুস্তকের বিরুদ্ধেই নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আপত্তিকারী খোদা তা'লার সকল কিতাব ও সকল রসূলের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষেপাটে হৃদয়ে আক্রোশ সুলভ আক্রমণ চালিয়েছে এবং এ আপত্তির আঘাত সবচেয়ে বেশি আসে ইঞ্জিলের ওপর।

কেননা কঠোর ভাষা ব্যবহারে হযরত মসীহ্ অন্যান্য সব নবীর চেয়ে এগিয়ে। ইঞ্জিল সূত্রে প্রমাণিত, এরকম কঠোর ভাষণের কারণে ইহুদিরা হযরত মসীহ্কে মারার জন্যে পাথর উঠিয়েছে। প্রধান পুরোহিতের সম্মান হানির কারণে হযরত মসীহ্ চপেটাঘাতও খেয়েছেন। হযরত মসীহ্ যেমন বলেছিলেন, 'আমি সন্ধির জন্য আসি নি আমি তরবারি চালাতে এসেছি।' অতএব তিনি রসনার তরবারি এমনভাবে চালিয়েছেন যে, কোন নবীর কিতাব বা বাণীতে এমন কঠোর ও মর্মপীড়াদায়ক শব্দাবলি নেই যেমনটি ইঞ্জিলে রয়েছে। এই কথার ছুরির দরুন পরিশেষে মসীহ্কে কতই না দুঃখ সইতে হয়েছে! তেমনিভাবে হযরত ইয়াহ্ইয়াও ইহুদি ওলামা ও সম্মানিতদের সাপের বাচ্চা আখ্যা দিয়ে তাদের দুষ্কৃতি ও ষড়যন্ত্রে নিজের শিরশ্ছেদ করিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পবিত্র মহাপুরুষগণ কি চরম পর্যায়ের অভদ্র ছিলেন? বর্তমান যুগের অধুনা সভ্যতার নামগন্ধও কি তাদের স্পর্শ করে নি?

এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের নেতা ও মনিব (আমার মাতাপিতা তাঁর জন্যে উৎসর্গিত) হযরত খাতামুল মুরসালীন সৈয়্যদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন (সা.) পূর্বেই দিয়ে গেছেন। সেটি হলো, এ (সম্পর্কিত) আয়াতসমূহ যখন অবতীর্ণ হলো যে মুশরিকরা

'রিজ্‌স' (অর্থাৎ অপবিত্র), তারা 'শাররুল বারিয়া' (নিকৃষ্টতম সৃষ্টি), তারা নির্বোধ, শয়তানের বংশধর আর তাদের উপাস্যরা নরকের ইন্ধন, জাহান্নামের জ্বালানি, তখন আবু তালেব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ডেকে এনে বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কটু ভাষা ও গালমন্দের দরুন জাতি ভীষণ উত্তেজিত। তোমাকে এবং সেই সাথে আমাকেও মেরে ফেলার উপক্রম হয়েছে। তুমি তাদের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ আখ্যা দিয়েছ। তাদের সম্মানিত লোকদের নিকৃষ্ট সৃষ্টি আখ্যায়িত করেছ। তাদের পূজনীয় উপাস্যদের জাহান্নামের ইন্ধন ও নরকের জ্বালানি বলে আখ্যায়িত দিয়েছ। সাধারণভাবে তাদের সবাইকে 'রিজ্‌স' (অপবিত্র) ও শয়তানের বংশধর এবং নোংরা সাব্যস্ত করেছ। আমি তোমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলছি, "তোমার জিহ্বাকে থামাও, ভাষা নিয়ন্ত্রণ কর এবং কটু ভাষা প্রয়োগ ও নিন্দাবাদ থেকে নিবৃত্ত হও। নচেৎ জাতির সামনে দাঁড়ানোর শক্তি আমার নেই।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'হে চাচা! এটা গালমন্দ নয়, বরং বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ এবং একই বাস্তবতার একান্ত যথাযথ প্রয়োগ আর এ কাজের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। এর জন্য আমাকে যদি মৃত্যুর সম্মুখীনও হতে হয় আমি সানন্দে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত।

আমার জীবন এ পথেই উৎসর্গিত। আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ করা হতে নিবৃত্ত হতে পারি না। হে চাচা! আপনি যদি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের আশঙ্কা বোধ করেন তাহলে আমাকে প্রদত্ত আশ্রয় প্রত্যাহার করে নিন। খোদার কসম! আমি আদৌ আপনার মুখাপেক্ষী নই, আপনাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ঐশী আদেশ-নির্দেশ (মানুষের কাছে) পৌঁছানো থেকে কখনো বিরত হবো না। আমার কাছে আমার প্রভুর আদেশ-নির্দেশ নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।

খোদার কসম! এপথে আমি যদি মারাও যাই তাহলে আমার ইচ্ছা হলো, এরপর বার বার জীবিত হয়ে সবসময় যেন এ পথে মরতে পারি। এটি কোনো ভয় পাওয়ার বিষয় নয়। বরং তাঁর পথে দুঃখকষ্ট বরণ করে আমি পরম তৃপ্তি বোধ করি।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ বক্তৃতা করছিলেন আর তাঁর চেহারায় সত্য ও জ্যোতি শোভিত আবেগ দৃশ্যমান হচ্ছিল। যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ বক্তব্যটি শেষ করলেন তখন সত্যের আলো অবলোকনে অবলীলায় আবু তালেবের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, 'আমি তোমার এ উন্নত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম। তুমি তো অভিনব কোনো বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদায় আসীন রয়েছ। যাও আর নিজের কাজে রত থাক। যতদিন আমি জীবিত থাকি আর যতখানি

শক্তি কুলোয় ততদিন আমি তোমাকে সঙ্গ দেবো।' এখন সারকথা* হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর পবিত্র ভাষায় আবু তালিবের আপত্তির যে উত্তরটি দিলেন প্রকৃতপক্ষে সেটিই (আমার বিপক্ষে) প্রত্যেক আপত্তিকারীকে নিরুত্তর করার জন্য যথেষ্ট। কেননা গালমন্দ এক বিষয় আর (বাস্তব) ঘটনার বর্ণনা তা যতই তিক্ত ও কঠোর হোক না কেন ভিন্ন বিষয়। প্রত্যেক গবেষক ও সত্যবাদী ব্যক্তির কর্তব্য হয়ে থাকে, সত্য বিষয়কে পুরোপুরি বিপক্ষ বিপথগামীর কর্ণগোচর করে দেয়া। এরপর সে যদি সত্য শুনে অগ্নিশর্মা হয় তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের আলেমরা এ স্থানে যে "লা তাসুব্বু ...." আয়াতটি পেশ করেন– আমি অবাক, আমার উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের সাথে এর কি-বা সম্পর্ক! এ মহান আয়াতটিতে তো কেবল গালমন্দ করতে বারণ করা হয়েছে, এমনটি তো নয় যে, এতে সত্য প্রকাশে বারণ করা হয়েছে। আর সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ বিরুদ্ধাচারী যদি সত্যের অন্তর্নিহিত তিক্ততা দেখে একে গালমন্দ মনে করে এবং উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ শুরু করে তাহলে কি 'আম্‌রে মা'রূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ দেবার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া উচিত? এ ধরনের গালিগালাজ কি কাফিররা পূর্বে কখনো দেয় নি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সত্যের পক্ষে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন, কেবল তাই নয় বরং প্রতিমা উপাসকদের দৃষ্টিতে যে-সব প্রতিমা খোদার মর্যাদা রাখতো সেগুলোকে তিনি নিজ হাতে খণ্ডবিখণ্ড করেছেন। মিথ্যার সাথে আপোশ বা চাটুকারিতাকে ইসলাম আবার কখন বৈধ আখ্যা দিল? কুরআন করীমের কোথায় এরকম আদেশ রয়েছে? পক্ষান্তরে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু মিথ্যার সাথে আপসকে বারণ করে স্পষ্টভাবে বলেছেন, যারা তাদের পিতামাতার সাথে তাদের অবিশ্বাসের অবস্থায় চাটুকারিতামূলক ব্যবহার করে, তারাও তাদেরই মতো বেঈমান আর তিনি মক্কার কাফিরদের কথা বর্ণনা করে বলেন, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ *(সূরা আল কলম: ১০)* অর্থাৎ 'মক্কার কাফিররা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তুমি যদি সত্য গোপনের পন্থা অবলম্বন করে নমনীয়তা দেখাও তাহলে তারাও তোমার ধর্মের বিষয়ে তোমার সাথে মতৈক্য প্রকাশ করবে' কিন্তু ওরূপ মতৈক্য প্রকাশ করা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। মোটকথা, আপত্তিকারী কুরআনের যে আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন তা যদি কোনো বিষয়ের প্রমাণ বহন করে তবে তা হলো কেবল এ-ই যে, আপত্তিকারীর আল্লাহ্‌র পাক কালাম বোঝার সাথে কোন সংশ্রব নেই। তারা লক্ষ করে না যে, এ আয়াতটিকে সব রকম কঠোর বক্তব্য সম্পর্কিত বলে মনে করা হলে ন্যায়সংগত বিষয়ের নির্দেশ ('আমর বিল মা'রূফ') এবং অসংগত বিষয়ে নিষেধ ('নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার')-এর দ্বার যে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। অধিকন্তু এতে করে খোদা তা'লার

** দ্বিতীয় টীকা ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

কথা দু'টি স্ববিরোধী বিষয়ের সমাহার বলে মানতে হবে, অর্থাৎ স্বীকার করতে হবে, এক তো তিনি সব রকম কঠোর কথা বলতে বারণ করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কাফেরদের মন প্রফুল্ল রাখার তাগিদ দিয়েছেন, আবার নিজেই নিজের উক্তি বিরোধী কার্যক্রম আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং সব ধরনের গালমন্দ অস্বীকারকারীদের শুনিয়েছেন। শুধু তাই নয় বরং গালমন্দ করতে তাগিদ করেছেন। অতএব জানা উচিত, যে-সকল মৌলবী ধারণা করছেন সর্বক্ষেত্রেই খোদা তা'লা কঠোর বক্তব্য থেকে নিষেধ করেছেন– তা কেবল তাদের বুঝার ভুল। কেননা সত্য উপস্থাপনের জন্য যে-সব কড়া কথার প্রয়োজন যা স্বতঃসিদ্ধভাবে নিজের প্রমাণ নিজেই বহন করে তা প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে পরিষ্কারভাবে শুনিয়ে দেওয়া শুধু বৈধই নয়, বরং সময়ের আবশ্যকীয় দাবি যাতে তোষামোদের ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়। খোদা তা'লার মনোনীত বান্দারা এমন কঠিন বাণী প্রচারের সময় কোন অভিশাপকারীর অভিশাপ এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেন নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে যে মাত্রায় মুশরিকদের হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল তার আসল কারণ ওই সব কড়া ও কঠোর ভাষণই ছিল যাকে সেসব অজ্ঞরা গালমন্দ মনে করেছে– এ কথা কি জানা নেই? আর এ কারণেই অবশেষে অবস্থা 'বাগ্‌যুদ্ধ' থেকে 'অস্ত্র যুদ্ধ' পর্যন্ত গড়িয়েছেন। প্রাথমিক অবস্থায় তো সেসব লোক ওরকম ছিল না, বরং তারা একান্ত দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলত: عَشِقَ مُحَمَّدٌ عَلٰى رَبِّهٖ – অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন'; যেমনটি কি-না বর্তমান হিন্দু (ধর্মাবলম্বী) লোকজনও কোন নিভৃত-নির্জনবাসী ফকির-দরবেশকে কখনো মন্দ বলে না বরং নজর-নজরানা উপহার-উপঢৌকন দিয়ে থাকে।

এ স্থলে অতি আক্ষেপের সাথে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাকে জানাতে হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে যে আপত্তিটি করা হয়েছে তা কেবল জনসাধারণের পক্ষ থেকেই নয়, বরং আমি শুনেছি, কয়েকজন আলেমও এ আপত্তির হোতা। তাদের সম্পর্কে এমন ধারণা তো পোষণ করতে পারি না যে, তাঁরা কুরআন শরীফ ও সাবেক গ্রন্থাবলি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; এরকম ধারণা করার কোন অবকাশও নেই*। কিন্তু আমি জানি, ইউরোপের বর্তমান মিথ্যা সভ্যতা যা ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে তা আমাদের আলেম সম্প্রদায়ের অন্তরকেও কিছু মাত্রায় বশীভূত করে ফেলেছে। এই তীব্র ঝড় বয়ে যাওয়ায় তাঁদের চোখেও কিছুটা ধুলা পড়েছে। তাঁদের প্রকৃতি দুর্বলতা সেই অধপতনকে সাদরে বরণ করেছে। এ

** তৃতীয় টীকা ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

কারণেই তাঁরা এমন ধ্যানধারণায় জোর দেন যেগুলোর কোন ভিত্তি সহীহ্ হাদীস ও কুরআন করীমে খুঁজে পাওয়া যায় না তবে ইউরোপের নৈতিক দর্শনমূলক পুস্তকগুলোতে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের নৈতিক মূল্যবোধগুলোতে ইউরোপ এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক (যুবতী) নারীর দিক থেকে একজন নামাহরম পুরুষকে পুরোপুরি আশাহত করা সমীচীন মনে করা হয় নি কিন্তু কুরআন করীম কি ইউরোপের এসব নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে? পবিত্র কুরআন কি এমন লোকদের নির্লজ্জ ও বেহায়া বলে আখ্যায়িত করে না? আমি এ ধরনের উলামাকে কেবল আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে সাবধান করছি, তাঁরা যেন এরূপ ছিদ্রান্বেষণ ও এ ধরনের ধ্যানধারণা মনে স্থান দেবার কারণে সত্য ও সত্যকে চেনা হতে দূরে ছিটকে পড়েছে। তারা যদি আমার সঙ্গে লড়তে উদ্যত হয়ে থাকেন তাহলে নিজেদের শুষ্ক যুক্তির ভিত্তিতে যা ইচ্ছা বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি খোদা তা'লাকে ভয় করে কিছুটা চিন্তাভাবনা করেন তাহলে এটি এমন কোন বিষয় নয় যা তাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারে। নেক ও পুণ্যবান ব্যক্তির কর্তব্য হলো সত্যকে হাত ছাড়া হতে না দেওয়া। মানুষের নিজের যদি ভুল হয়ে যায় আর একজন অতি নগণ্য ব্যক্তির মুখ থেকেও সত্য নিঃসৃত হয় তাহলে তার উচিত নিজের ভুল স্বীকার করে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই নগণ্য ব্যক্তির কথা মেনে নেওয়া এবং أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ('আমি তার চেয়ে উত্তম') হওয়ার দাবি না করা। অন্যথায় অহংকারী ও আত্মম্ভরি অবস্থায় কখনো হেদায়াত লাভ হবে না বরং এমন ব্যক্তির ঈমানটুকুও ঝুঁকির মাঝেই থাকে।

(স্থান কাল পাত্র ভেদে) কঠোর ভাষা প্রয়োগের পেছনে একটি প্রজ্ঞা বা যুক্তি হলো, এতে করে ঘুমন্ত হৃদয়ও জাগ্রত হয় এবং যারা চাটুকারিতামূলকভাবে সত্য গোপন করা পছন্দ করে এমন ব্যক্তিদের মাঝে প্রেরণা সঞ্চার হয়। যেমন হিন্দুরা এমন এক জাতি যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির অভ্যাস হলো কেউ যদি তাদের জাগ্রত না করে তাহলে তারা কপটতাবশত সারা জীবন বন্ধু সেজে ধর্মীয় বিষয়াদিতে সহমত প্রদর্শন করে, পক্ষে সায় দিতে থাকবেন। বরং অনেক সময় তাঁরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় ও গুণগানে পঞ্চমুখ আর ইসলামের আওলিয়া দরবেশদের গুণকীর্তনেও লেগে যান; অথচ তাঁদের হৃদয় চরমভাবে তমসাচ্ছন্ন ও প্রকৃত সত্য থেকে যোজন যোজন দূরে। তাঁদের সামনে সত্যকে এর পূর্ণ দৃঢ়তা ও তিক্ততাসহ প্রকাশ করা এ কল্যাণকর ফলাফলে পর্যবসিত হয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কপটাচার দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ তারা নিজেদের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে যেন তাদের যক্ষ্মারূপ

সুপ্ত ব্যাধি জ্বরের আকারে প্রকাশ পেয়ে যায়। কাজেই এ ঝাঁকুনি একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট মানুষের মনে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা একজন অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে দারুণ আপত্তিকর, কিন্তু অন্যদিকে একজন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে, এ ঝাঁকুনিই মানুষকে সত্য অভিমুখী করার জন্য প্রথম ধাপ বিশেষ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রোগের কারণ অজানা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে-রোগের কোন চিকিৎসা হতে পারে না। কিন্তু উপসর্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে রোগের সবরকম প্রতিকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নবীগণ যে কঠিন শব্দ ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে আন্দোলিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। যাতে মানুষের মাঝে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং এই আঘাতে তারা জেগে ওঠে আর ধর্মের বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষক-সুলভ দৃষ্টি প্রসারিত করে আর সে পথে অগ্রপদচারণা করে তা সে পদচারণা বিরোধিতামূলকই হোক না কেন। একইভাবে সত্যের অনুসারীদের সাথে নিজেদের অন্তরের একটা সম্পর্ক রচনা করে; সে-সম্পর্ক বিরূপ ভাবাপন্ন সম্পর্কই হোক না কেন। এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেছেন: فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا [অর্থাৎ তাদের অন্তরে রয়েছে এক ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের সে ব্যাধি বাড়িয়ে দেন *(সূরা আল বাকারা: ১১)*– অনুবাদক]।

নিশ্চিতভাবে বুঝা উচিত, ইসলাম ধর্মকে সত্যিকার অন্তরে একদিন সেসব লোকই গ্রহণ করবেন যারা জোরালো জাগানিয়া প্রেরণা বা আন্দোলনের কারণে ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠে ব্যাপৃত হয়েছেন এবং উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সাথে এ পথে অগ্রসর হচ্ছেন, যদিও তাদের পদচারণা (আপাতত দৃষ্টিতে) বিরোধিতামূলকই হোক না কেন। হিন্দুদের সেই পূর্বেকার রীতি আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল যখন তারা আন্তরিকভাবে এ পদ্ধতিটিকেই বেশি পছন্দনীয় বলে মনে করত যে, মুসলমানদের সাথে কোন ধর্মীয় আলাপ আলোচনা করা উচিত নয় এবং তাদের কথায় সায় দিয়ে কোনভাবে কাজ চালানো উচিত। কিন্তু এখন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে এসে এবং ময়দানে দণ্ডায়মান হয়ে আমাদের (যুক্তিপ্রমাণের) ধারালো অস্ত্রসমূহের নীচে এসে গেছেন এবং হাতের নাগালে আসা সেই শিকারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছেন যার একই আঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। তাদের মৃগ-সুলভ চঞ্চল ছোটোছুটিকে ভয় করা উচিত নয়। তারা শত্রু নয় বরং তারা আমাদের শিকার। অচিরেই সে-যুগ আসন্ন যখন আপনারা চোখ মেলে কোনো হিন্দু দেখতে চাইলে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যকার একজনও দৃষ্টিগোচর হবে না। অতএব আপনারা তাদের রাগ বা উত্তেজনায় বিচলিত ও নিরাশ হবেন না। কেননা তারা ভেতরে ভেতরে

ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আর প্রায় ইসলামের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি আপনাদের সত্য সত্য বলছি, যাদের আপনারা আজ বিরোধিতাসুলভ রাগ বা ক্রোধে ভরা দেখতে পাচ্ছেন, স্বল্পকাল পরে তাদেরকে আর এরকম দেখতে পাবেন না। সাম্প্রতিককালে আর্যসমাজি হিন্দুরা যে আমাদের প্রেরণায় বাহাস-বিতর্কের পানে ধাবিত হয়েছে এতে তাদের আচরণ যত কঠোরই হোক এবং তারা গালিগালাজ ও নোংরা কথাবার্তায় ভরা যত বইপুস্তক প্রকাশ করুক, সত্যিকার অর্থে নিজেদের এই উত্তেজনা বা ক্রোধের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্য তাদের স্বজাতির মাঝে প্রবেশের দ্বার খুলে দিচ্ছে। আমাদের নাড়া দেবার কোনো কুফল নেই কিন্তু এই নাড়া দেওয়া বা প্রেরণা অদূরদর্শীদের দৃষ্টিতে কুৎসিত কিন্তু একদিন দেখো, এ ঝাঁকানি বা প্রেরণাই কীভাবে বড়ো বড়ো পাষাণহৃদয় লোকদের এ দিকে টেনে আনে আনছে– এ অভিমতটি কোন আনুমানিক ও সন্দেহমূলক অভিমত নয় বরং এটি এক নিশ্চিত ও অবধারিত ব্যাপার বটে। কিন্তু আক্ষেপ ওই সব লোকের প্রতি যারা কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না এবং তড়িঘড়ি আপত্তি করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। খোদা তা'লা কপটতা প্রদর্শন বা তোষামোদ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিক্ততার আশঙ্কায় খোলামেলাভাবে সত্য প্রকাশ করা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কোথাও আদেশ দেন নি।

فتدبروا ايها العلماء المستعجلون ألا تقرؤن القرآن مالكم كيف تحكمون۔

(অর্থ: অতএব হে ত্বরিতমতি উলামাবৃন্দ! আপনারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুন। আপনারা কি কুরআন শরীফ পাঠ করেন না? আপনাদের কী হয়েছে, এটি আপনাদের কেমন বিচার?– অনুবাদক)।

আমার একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু মৌলবী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব যিনি সদ্য পড়ালেখা শেষ করেছেন আর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত এক যুবক ও সূক্ষ্মচিন্তা-চেতনাশীল ব্যক্তি যার হৃদয়ে আমার সত্যিকার বন্ধু, প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের মুরব্বী ও শিক্ষকসুলভ সাহচর্যের অত্যন্ত উত্তম বরং অলৌকিক প্রভাব পড়েছে। এবার যখন তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আসেন তিনি প্রকৃত কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রণয়ন করে প্রকাশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কেননা উক্ত মৌলবী সাহেব এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝেন যে, প্রকৃত কৃষ্টি-কালচার বা সভ্যতার পথ আসলে সেটিই যে পথে নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) পদচারণা করেছেন। যে পথে কঠিন শব্দ ও কঠোর ভাষাকে কখনো কখনো তিক্ত ও তীব্র ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করাকে একেবারে হারাম জ্ঞান করা হয় নি। বরং এমন কঠোর শব্দাবলির যথাস্থানে

প্রয়োজনে সমীচীন মাত্রায় প্রয়োগ করা প্রত্যেক প্রচারক ও সদোপদেশদাতার সময়ানুগ কর্তব্য বটে। যা পালন করায় কোন সদোপদেশদাতার পক্ষে আলস্য বা অবহেলা এ কথার পরিচায়ক যে, আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করে অন্যের ভয় তার হৃদয় প্রবল যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত আর তার ঈমানী অবস্থা এমন দুর্বল যেমনটি হয়ে থাকে কোন কীটপতঙ্গের প্রাণ। অতএব আমি সেই বন্ধুর জন্য দোয়া করি, খোদা তা'লা যেন এরূপ পুস্তক প্রণয়নে 'রুহুল কুদুস' (তথা পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেন। আমার মতে তাঁর এ পুস্তকের নাম (কেবল) 'কৃষ্টি-কালচার বা সভ্যতা' রাখাই উত্তম হবে।

আমি জানতে পেরেছি, আমার এ বন্ধু (উক্ত পুস্তক প্রণয়নের) এ উদ্দীপনা পেয়েছেন জনৈক মৌলবী সাহেবের আপত্তি থেকে যার সাথে কাদিয়ান আসার পথে দৈবক্রমে লাহোরে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি এ অধম সম্পর্কে এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। **হে আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা! যদিও আবহমান কাল থেকে তোমার এ রীতিই চলে আসছে যে, তুমি শিশু ও নিরক্ষরদের বুঝার শক্তি দান করে থাকো এবং এ দুনিয়ার দার্শনিক ও ফিলোসফারদের চোখ, কান ও হৃদয়ের ওপর অন্ধকারের গভীর পর্দা টেনে দিয়ে থাকো। কিন্তু তোমার দরবারে আমার বিনীত নিবেদন হলো, এদের মধ্যে থেকেও একটি জামা'ত (দল) আমার দিকে আকৃষ্ট কর যেভাবে তুমি কয়েকজনকে এনেছও আর তাদেরকে চোখ, কান ও হৃদয় দান করো, যাতে তারা দেখে, শোনে ও বুঝে এবং তোমার সেই নেয়ামত যা যথাসময়ে তুমি অবতীর্ণ করেছ এর মর্যাদা উপলব্ধি করে তা অর্জনে মনোযোগী হয়। তুমি চাইলে এমনটি করতে সক্ষম। কেননা তোমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আমীন, সুম্মা আমীন।**

দ্বিতীয় ছিদ্রান্বেষণ হলো, এ অধম নাকি মালিখোলিয়া বা উন্মাদনার কারণে 'মসীহ্ মওউদ' (তথা প্রতিশ্রুত মসীহ্) হওয়ার দাবি করে বসেছে!

এর উত্তর হলো, এমনিতে তো আমাকে কেউ উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক বলায় আমি অসন্তুষ্ট হতে পারি না বরং আমি আনন্দিত। কেননা অবুঝ-নির্বোধরা সকল নবী ও রসূলকেই তাঁদের নিজ নিজ যুগে এ নামেই আখ্যায়িত করেছে। জাতির পক্ষ থেকে নবীগণ আবহমান কাল থেকে এ অভিধায় অভিহিত হয়ে এসেছেন। এছাড়া এ কারণেও আমি আনন্দিত যে, আজ সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হচ্ছে যা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল যে, তোমাকে উন্মাদও বলা হবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, উক্ত দাবিটিতে উন্মাদের কী লক্ষণ ও চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো? কাণ্ডজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন বিষয়টি রয়েছে যার কারণে আপত্তিকারীদের কাছে উন্মাদনার সন্দেহ হলো? এ বিষয়ের মীমাংসা ও নিষ্পত্তির ভার আমরা

আপত্তিকারীদের বিবেকবুদ্ধির ওপরই ন্যস্ত করছি। তাঁদের সম্মুখে আমার নিজের বক্তব্য এবং আমার বিরুদ্ধবাদীদের কথা ও বিবৃতি উপস্থাপন করছি যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের উভয় শ্রেণির মাঝে উন্মাদ কে? সুস্থ বিবেক উভয়ের মধ্য থেকে কার বক্তব্য ও বিবৃতিকে উন্মাদের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে এবং কার বর্ণনা ও বিবরণকে যুক্তিসংগত সাব্যস্ত করে?

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আকাশ থেকে অবতরণ ও পৃথিবীতে পুনরায় আগমনের যে অপেক্ষা করা হয় সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য যেভাবে খোদা তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমার প্রতি প্রকাশ করেছেন তা এই যে, দুনিয়াতে মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌র পুনরায় আগমনের কোন উল্লেখ কুরআন করীমে কোথাও নেই। কুরআন করীম চিরকালের জন্য তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়েছে। অবশ্য কিছু হাদীসে পৃথিবীতে মসীহ্‌র পুনরায় আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে যা রূপক ভাষায় পরিপূর্ণ। এসব হাদীসের প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্টত প্রকাশ পায় যে, এস্থলে প্রকৃতপক্ষে এটি বুঝানো হয় নি যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ.)ই পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন বরং এটি একটি সূক্ষ্ম রূপকের ব্যবহার যার অর্থ হলো– মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌র যুগের ন্যায় ও অনুরূপ এক যুগে মানুষের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি স্বভাবচরিত্রে, শক্তিসামর্থ্য ও নিজ পদমর্যাদাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যে মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌র অনুরূপ ও সদৃশ হবেন। মরিয়ম পুত্র মসীহ্ যেভাবে হযরত মূসার ধর্মের সংস্কার কাজ সাধন করেছিলেন আর যেভাবে তিনি তওরাতের শিক্ষার প্রকৃত রূপ ও সারবত্তা পুনরায় অবারিত করেছিলেন, যা ইহুদিরা ভুলে গিয়েছিল সেভাবেই এই দ্বিতীয় মসীহ্ মূসার মসীল, অর্থাৎ জনাব খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর ধর্মের সংস্কারের কাজ সমাধা করবেন। মসীলে মূসার এই মসীহ্ তার আচরিত জীবন এবং অন্যসব ফলাফলের ক্ষেত্রে যা জাতির ওপর তাদের আনুগত্য বা অবাধ্যতার অবস্থায় প্রভাব ফেলবে– হুবহু মূসাকে প্রদত্ত মসীহ্‌র সদৃশ হবে। এখন যে বিষয়টি খোদা তা'লা আমার কাছে উন্মোচিত করেছেন সেটি হলো, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্।

বদ্ধমূল প্রাচীন ধ্যানধারণা অনুযায়ী মুসলমান আলেমদের দাবি হলো, মরিয়ম পুত্র মসীহ্ আক্ষরিকভাবে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে দুহাতের ভরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং পূর্ব দামেস্কের মিনারের কাছে নামবেন। আবার কিছু লোক বলেন, মিনারের ওপর নামবেন। সেখান থেকে মুসলমান লোকজন তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামাবে আর ফেরেশতারা সেখান থেকেই বিদায় নিয়ে চলে যাবে। মসীহ্ উত্তম পোশাক পরিহিত অবস্থায় নামবেন, উলঙ্গ অবস্থায় নয়। এরপর মাহ্‌দীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হবে। তবে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও তাঁর বয়স পূর্বের বত্রিশ কি তেত্রিশই থাকবে যুগের এ দীর্ঘ পরিক্রমা তাঁর দেহ ও বয়সের ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না। তাঁর নখ ও চুল ইত্যাদিও আকাশে উঠে যাওয়ার সময় যা ছিল তার চেয়ে হয়ত বৃদ্ধি পাবে না এবং তাঁর গঠন-গড়নেও কোন রকম পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু পৃথিবীতে নামার পর পুনরায় পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে। তিনি কোন প্রকারের যুদ্ধবিগ্রহ করবেন না বরং তাঁর মুখের ফুৎকারে এমন প্রভাব থাকবে যে, যত দূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি যাবে, এতে শুধু কাফির মরতে থাকবে। অর্থাৎ তাঁর দম ও নিঃশ্বাসেই জীবিতদের মেরে ফেলার বৈশিষ্ট্য থাকবে, অবশ্য পূর্বে ছিল মৃতদের জীবিত করার বৈশিষ্ট্য। অতঃপর আমাদের উলামা নিজেদের এই প্রথম বক্তব্য বিস্মৃত হয়ে এর বিপরীতে এ বক্তব্য পেশ করে থাকেন যে, তিনি যুদ্ধবিগ্রহ করবেন এবং একচক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জাল তাঁর হাতে নিহত হবে আর ইহুদিরাও তার নির্দেশে নিহত হবে। একদিকে তারা বলে এ প্রতিশ্রুত মসীহ্ সেই আল্লাহ্‌র নবী মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌ই হবেন, যার প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, জিবরাঈল (আল্লাহ্‌র ওহী নিয়ে) যার ওপর অবতীর্ণ হতো আর তিনি ছিলেন খোদা তা'লার মহান পয়গম্বরদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে আবার এ-ও বলেন যে, মসীহ্ পুনরায় পৃথিবীতে এসে তাঁর নবুওয়্যতের নামও নেবেন না। বরং নবুওয়্যতের পদবী হারিয়ে আগমন করবেন এবং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতভুক্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানদের মতো কুরআনী শরীয়ত মেনে চলবেন; সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় অন্যদের পেছনে নামায পড়বেন। কেউ কেউ বলে, তিনি 'হানাফী' হবেন, ইমাম আযম (আবু হানিফা)-কে নিজের ইমাম জ্ঞান করবেন। কিন্তু (সুফিমতবাদের) চার মতবাদের মধ্যকার কোনটির তিনি অনুসারী হবেন সে সম্পর্কে অদ্যাবধি স্পষ্টভাবে কিছু বর্ণনা করা হয় নি– তিনি কি 'কাদেরি' হবেন নাকি 'চিশতি' বা 'সোহরাওয়ার্দী' হবেন নাকি হযরত মুজাদ্দিদ সারহিন্দির মতো 'নাক্‌শবন্দী' হবেন। মোটকথা, এরা প্রথমে তাঁকে আল্লাহ্‌র নবী উপাধি দিয়ে আবার এতটা তাঁকে নীচে নামিয়েছে যে, প্রকৃতিস্থ কোন মানুষ এরকম কাজ কখনো করতে পারে না। এরপর রূপকের আবরণে মোড়ানো তাঁর বিশেষ কাজকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন ও শূকর বধ করবেন। এখন আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ক্রুশগুলো ভেঙ্গে ফেললেও এতে কী লাভ হবে? ধরুন! তিনি যদি দশ বা বিশ লাখ ক্রুশ ভেঙ্গেও ফেলেন তাহলে খ্রিষ্টানদের যেভাবে ক্রুশপূজার মোহ পেয়ে বসেছে তাতে তারা কি আরো (বহু সংখ্যক) ক্রুশ তৈরি করে নিতে পারবে না? এছাড়া 'শূকর বধ করবেন' মর্মে যে দ্বিতীয় বাক্যটি বলা হয়েছে– এটিও আক্ষরিক অর্থে নিলে এক অদ্ভুত বাক্য দাঁড়ায়। হযরত মসীহ্‌র পৃথিবীতে

নামার পর সর্বোত্তম কাজটি কি এটাই হবে যে, তিনি শূকর শিকার করে বেড়াবেন আর অনেক কুকুর তাঁর সঙ্গে থাকবে? যদি এটাই সত্য হয়ে থাকে তাহলে তো শিখ, চামার ও (শূকরখোর) উপজাতিগুলো, যারা শূকর শিকার করতে খুব ভালোবাসে তাদের জন্য এটা এক সুখবর বিশেষ, এই সুযোগে তাদের খুব লাভ হবে! কিন্তু এই 'শূকর বধ'-এর ফলে খ্রিষ্টানদের হয়ত আদৌ কোন লাভ হবে না। কেননা খ্রিষ্টান জাতি শূকর শিকারের ব্যাপারটিকে আগেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। এ মুহূর্তে কার্যত লন্ডনেই শুকরের মাংস বিক্রির জন্য হাজারটি দোকান রয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত যে, কেবল এই সহস্র দোকানই নয় বরং দৈনিক আরো পঁচিশ হাজার শূকর লন্ডন থেকে মফস্বলের লোকদের জন্য বাইরে পাঠানো হয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, এটি কি আল্লাহ্‌র নবীর মর্যাদাসম্মত বিষয় যে, তিনি পৃথিবীতে জনমানবের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসবেন, কিন্তু এসে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় একটি ঘৃণ্য প্রাণি শিকারে নষ্ট করবেন? অথচ তওরাত অনুযায়ী শূকর স্পর্শ করাও কঠিন পাপের অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি আমি এও বলতে চাই যে, প্রথমত শিকার খেলাটাই নিষ্কর্মাদের কাজ। তবুও শিকারের প্রতিই যদি হযরত মসীহ্ আকৃষ্ট হয়ে থাকেন আর দিনরাত এ কাজটিই তাঁর পছন্দের কাজ হয়ে থাকে তাহলে হরিণ, জেব্রা, খরগোশ, নীল গাঁই ইত্যাদি পবিত্র প্রাণি কি দুনিয়াতে কম আছে নাকি? যে কারণে তাঁকে একটি নাপাক প্রাণির রক্তে নিজ হাত রঞ্জিত ও অপবিত্র করতে হবে!

হযরত মসীহ্ দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতরণোত্তর জীবনীর যে চিত্র আমার জাতি এঁকে রেখেছেন এর পুরোটাই আমি উপস্থাপন করেছি। এবার বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষ এতে চিন্তাভাবনা করুন, কী মাত্রায় এতে প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধী বিষয়াদি রয়েছে! কী পরিমাণ এতে স্ববিরোধ রয়েছে! এগুলো কতটা নবীর মর্যাদা বিরোধী কথা! কিন্তু এস্থলে এ-ও স্মরণ থাকা উচিত যে, এসব অর্থহীন বিষয়ের স্তূপ 'সহীহাইনে' (তথা বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থদ্বয়ে) নেই। 'আগমনকারী মসীহ্ কি প্রকৃতপক্ষে ও সত্য সত্যই সেই প্রথম মসীহ্ই হবেন'– এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ্) ইঙ্গিতটুকুও করেন নি, বরং তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এমন দুটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যা চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে দিয়েছে যে, প্রথম মসীহ্ই এক আর দ্বিতীয় মসীহ্ অন্য কেউ। কেননা একটি হাদীসের বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'ইবনে মরিয়ম তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন।' এরপর বর্ণানুক্রমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'তিনি তোমাদের একজন ইমাম হবেন যিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে হবেন।' অতএব এ শব্দগুলোতে

গভীরভাবে প্রণিধান করা উচিত। মহানবী (সা.) 'মরিয়ম পুত্র' শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি তোমাদের একজন ইমাম হবেন, যিনি তোমাদেরই মধ থেকে হবেন এবং তোমাদেরই মাঝেই জন্মগ্রহণ করবেন।' অন্য কথায়, 'ইবনে মরিয়ম' শব্দটি দ্বারা মানুষের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারতো তা দূরীভূত করার জন্য এর পরবর্তী বাক্যটিতে ব্যাখ্যাস্বরূপ বলে দিয়েছেন যে, তাকে তোমরা সত্য-সত্যই অবিকল মরিয়ম পুত্র (মসীহ্) বলে ধরে নিও না। بل هُو امامكم منكم (অর্থ: 'বরং তিনি হবেন তোমাদের ইমাম তোমাদেরই মধ্য থেকে– অনুবাদক)।

আর দ্বিতীয় হাদীসটি যা উক্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রদান করে সেটি হলো, প্রথম মসীহ্র অবয়ব মহানবী (সা.) এক রকম বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় মসীহ্র অবয়ব ভিন্ন বর্ণনা করেছেন, যা এ অধমের অবয়বের সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখন চিন্তা করা উচিত, উক্ত উভয় শারীরিক গঠন ও অবয়বের মধ্যে যে প্রকাশ্য ভিন্নতা রয়েছে এটা কি অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে না যে, প্রকৃতপক্ষে প্রথম মসীহ্ একজন আর দ্বিতীয় মসীহ্ ভিন্ন জন?

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আমাদের আলেমদের নাছোড় মনোবৃত্তি হলো 'ইবনে মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তাঁদের মধ্যকার কিছু বুদ্ধিমানের কাছে যখন হাদীস "মরিয়ম পুত্র (মসীহ্) নামবেন ও ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শূকর বধ করবেন"– এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তারা 'মরিয়ম পুত্র' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করলেও 'ক্রুশ' ও 'শূকর' সম্পর্কে কিছুটা চাপা গলায় আমাদের মতো রূপকের আশ্র নিতে শুরু করেন। অতএব তারা তাদের কার্যক্রমে নিজেরাই অভিযুক্ত সাব্যস্ত হন। কেননা এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে এ যুক্তি বর্তায় যে, উল্লিখিত তিনটি কথা, অর্থাৎ 'ইবনে মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়া', 'ক্রুশভঙ্গ করা' এবং 'শূকর বধ করা' এর মাঝে– দুটির সম্পর্কে তো নিজেরাই স্বীকার করেন যে, রূপক বিষয় হিসেবে এর অর্থ ভিন্ন, কাজেই এখানে যে 'ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন' বলে তৃতীয় কথাটি রয়েছে এতে কেন রূপকভাবে অন্য কোন ব্যক্তি বুঝাবে না? এখন আমি জিজ্ঞেস করি, এসব স্ববিরোধিতাপূর্ণ ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, নাকি যুক্তি গ্রাহ্য ও সহজবোধ্য যে, সব জ্ঞানতত্ত্ব এ অধমের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করে নেওয়া ন্যায়সংগত কর্তব্য?

যুক্তির নিরিখে এর বাইরে আরো কয়েক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব পুরাতন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বহু কঠিন আপত্তি বর্তায়। এ আপত্তিগুলো থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেগুলোর একটি হলো, কুরআন করীমের কোন স্থান (অর্থাৎ আয়াত) থেকেও প্রমাণিত নয় যে, মরিয়ম পুত্র হযরত মসীহ্‌কে তাঁর সেই জড়দেহসহ আকাশে উঠানো হয়েছিল। বরং কুরআন করীমের কয়েক জায়গায় মসীহ্‌র মৃত্যুবরণের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। একটি জায়গায় স্বয়ং মসীহ্‌র পক্ষ থেকে নিজ মৃত্যুর স্বীকৃতি রয়েছে। সেটি হলো–

كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

[অর্থাৎ আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সম্পর্কে সাক্ষী ছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত তথা মৃত্যু দিলে তখন কেবল তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে আর তুমি সববিষয়ের পর্যবেক্ষক।। *(সূরা আল মায়েদা: ১১৮)*– অনুবাদক]।

এখন যেহেতু মৃত্যু প্রমাণিত হলো তাই এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মরণশীল মানুষের মতো তাঁর জড়দেহ মাটিতে সমাহিত হয়ে থাকবে। কেননা কুরআন করীম স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করছে, কেবল মাত্র তাঁর আত্মা আকাশে গিয়েছে, জড়দেহ যায় নি। এ কারণেই হযরত মসীহ্ উক্ত আয়াতে তাঁর মৃত্যুবরণের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। যদি তিনি জীবিতাবস্থায় জড়দেহসহ আকাশের দিকে উড়ে যেতেন তাহলে নিজের মৃত্যুবরণের কথা কখনো উল্লেখ করতেন না। এমনটি কখনো বলতেন না যে, আমি মৃত্যুবরণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছি। এখন এটা স্পষ্ট যে, আকাশে যেহেতু কেবল তাঁর আত্মা গিয়েছে (কেননা মৃত্যুর পর কেবল আত্মাই যায় দেহ যায় না– অনুবাদক) সেহেতু নাযিল হওয়ার সময় দেহ কোথা থেকে সঙ্গে আসবে?

সেসব আপত্তির মাঝে আরেকটি হলো, নতুন ও পুরাতন দর্শন সর্বসম্মতিক্রমে কোন মানুষের পক্ষে তার জড়দেহসহ পৃথিবীর তীব্র শীতল স্তরে পৌঁছাও অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করে। বরং বিজ্ঞানের নতুন গবেষণা এটি প্রমাণ করেছে যে, কোন কোন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছার পর ওই স্তরের হাওয়া মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন হানিকর প্রমাণিত হয়েছে যে, সেখানে জীবিত থাকাও সম্ভব নয়। অতএব সে দেহের চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির পৃষ্ঠ বা স্তর পর্যন্ত উপনীত হওয়া কতই না বাজে ধারণা।* সেগুলোর মধ্যকার আরেকটি আপত্তি হলো, যাঁরা আকাশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁরা অবশ্যই এগুলোর গতিশীলতাও (movement) স্বীকার করে থাকেন আর গতিও

** চতুর্থ টীকা ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

চাকা ঘোরার মত বলে মনে করেন। এখন যদি ধরা হয় যে, হযরত মসীহ্ জড়দেহসহ আকাশে গিয়েছেন তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তিনি সবসময় ওপর দিকেই অবস্থান করতে পারেন না। বরং কখনো ওপর দিকে থাকবেন, আবার কখনো পৃথিবীর নীচে এসে যাবেন। এ কারণে তিনি যে ওপর দিক থেকেই অবতীর্ণ হবেন একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এটি কি সম্ভব নয় যে, তিনি ভূপৃষ্ঠের নীচে দিয়ে বেরিয়ে আসবেন? কেননা সত্যিকার অর্থে কোন জায়গায় তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হলো না, সকালে যদি আকাশের উপরিভাগে থাকেন, তবে সন্ধ্যায় আবার পৃথিবীর নীচে। অতএব তাঁর জন্য এরকম বিড়ম্বনা বিধেয় বলে ধরে রাখা কত-না অশিষ্টাচারের শামিল!

সেসব আপত্তির একটি হলো, আমরা যদি কথার কথা ধরেও নেই যে, হযরত মসীহ্ তাঁর জড়দেহসহ আকাশে উঠে গেছেন তাহলে একথাও স্বীকার না করে আমাদের গত্যন্তর নেই, মানুষসহ সকল প্রাণিকুলের ন্যায় সেই দেহও আবশ্যকীয়ভাবে কালের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবে এবং কালের পরিক্রমায় অপরিহার্যভাবে একদিন অবশ্যই তাঁর জন্য মৃত্যু অবধারিত। অতএব, এমতাবস্থায় প্রথমত হযরত মসীহ্র সম্পর্কে মানতে হবে যে, তিনি তাঁর আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে আকাশেই মৃত্যুরবণ করে থাকবেন এবং অন্য নক্ষত্ররাজিতে বসবাসরত জনবসতির কোন কবরে কবরস্থ হয়ে থাকবেন, বর্তমানে যেমনটি স্বীকার করা হয়। তারপরও যদি মনে করা হয় যে, এখনো তিনি জীবিত আছেন তাহলে এতো যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি নিশ্চয় থুড়থুড়ে বুড়ো হয়ে গিয়ে থাকবেন এবং কোন ধর্মীয় কর্তব্য পালনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন। সুতরাং এমন অবস্থায় দুনিয়াতে তাঁর আগমন অযথা কষ্ট স্বীকার ছাড়া কোনভাবে লাভজনক হতে পারে বলে মনে হয় না।

মসীহ্ কর্তৃক রূপক ভাষায় বর্ণিত তাঁর পুনরাগমনের চিহ্নাবলি এবং সূরা আল যিল্যালের তফসীর

হযরত মসীহ্ তাঁর পুনরাগমনের চিহ্নসমূহ বর্ণনা করে বলেন, "সে দিনগুলোতে সূর্য তড়িত অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না ও তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়বে এবং আকাশের শক্তিগুলো নড়বড়ে হয়ে যাবে। তখন আদম-সন্তানের চিহ্ন আকাশে প্রকাশ পাবে এবং আদম-পুত্রকে তোমরা মহাশক্তি ও মহিমার সাথে আকাশের মেঘে ভর করে আসতে দেখবে। জোরে জোরে শিংগা বেজে উঠার সাথে সাথে 'মনুষ্যপুত্র' (মসীহ্) তার ফেরেশতা (বা দূত)দের পাঠাবেন। তারা তাঁর মনোনীতদের আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে একত্রিত

করবেন। যখন তোমরা এসব কিছু দেখতে পাবে তখন বুঝবে, 'মনুষ্যপুত্র' (মসীহ্) কাছে এসে গেছেন, এমন কি দরজায় উপস্থিত। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতক্ষণ এসবকিছু ঘটে না যায় (এবং) এ যুগের মানুষ গত না হয়, আকাশ ও পৃথিবী টলে যাবে কিন্তু আমার কথাগুলো টলবে না। তবে সেই দিন ও সেই মুহূর্তের কথা আমার পিতা ছাড়া ফেরেশতাদের কেউ জানে না।

নূহের সময়ে যে অবস্থা হয়েছিল, ইবনে আদমের আসবার সময়ে ঠিক সেই অবস্থাই হবে। বন্যার আগের দিনগুলোতে নূহ জাহাজে ঢোকা পর্যন্ত লোক খাওয়া-দাওয়া করেছে, বিয়ে করেছে, বিয়ে দিয়েছে। যে পর্যন্ত না বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারল না। ইবনে আদমের আসাও ঠিক সেই রকমই হবে, অর্থাৎ নূহ কর্তৃক নৌকা নির্মাণের আগে মানুষ যেভাবে সুখেশান্তিতে বসবাস করত যখন পৃথিবী বা আকাশ থেকে কোন দুর্যোগ তাদের ওপর আপতিত হয় নি, সেভাবেই মনুষ্যপুত্র তথা মসীহ্ও মানুষের সুখশান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আসবেন। তাঁর আগমনের পূর্বে কোন রকম নৈরাজ্য বা দুর্যোগ মানুষের ওপর আপতিত হবে না। বরং সাধারণভাবে সুখেশান্তিতে মানুষ তাদের কাজকর্মে মশগুল হবে।" *(দেখুন মথির ইঞ্জিল, ২৪ অধ্যায়)।*

হযরত মসীহ্র এ বর্ণনায় যত স্ববিরোধ রয়েছে পাঠকবৃন্দ তা অনুধাবন করে থাকবেন। কেননা তিনি তাঁর অবতরণের পূর্বে এ বিষয়টিকে আবশ্যকীয় বলে নির্ধারণ করেছেন যে, তখন সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, চাঁদ আলো দেবে না আর নক্ষত্ররাজি আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে খসে পড়ে যাবে। উল্লিখিত চিহ্নগুলো যদি বাহ্যিক (বা আক্ষরিক) অর্থে নেয়া হয় তাহলে এরকম অর্থ স্পষ্টতই ভ্রান্ত, প্রকাশ্যভাবে খণ্ডনীয়। কেননা সূর্য অন্ধকার হলে আর চাঁদ আলো না দিলে সে অবস্থায় দুনিয়া কী করে নূহের যুগের মতো শান্তিতে বসবাসযোগ্য থাকতে পারে? একথা না হয় ছেড়েই দিন, দুনিয়া হয়তো তখনো কষ্টেসৃষ্টেই সময় কাটিয়ে দিল, কিন্তু ভূপৃষ্ঠে নক্ষত্র পতনে কি বিশ্ববাসীর মধ্যকার কেউ রক্ষা পেতে পারে? সত্য কথা হলো আকাশের একটি নক্ষত্রও ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা কোন নক্ষত্র দৈর্ঘ্য-প্রস্থে গোটা পৃথিবীর চেয়ে ক্ষুদ্র নয়। সব নক্ষত্রের পৃথিবীতে ঝড়ে পড়ার কথা বাদই দিলাম কেবল একটি নক্ষত্রই পতিত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে চাপা দিতে পারে। আবার সেগুলো খসে পড়লে একজন মানুষেরও কোন ক্ষতি হবে না বরং মানুষ হযরত নূহের যুগের মতো মসীহ্ অবতীর্ণ হওয়ার আগে নিরাপদে সুখেশান্তিতে বসবাস করবে আর মসীহ্কে প্রবল শক্তিমত্তা ও প্রতাপের সাথে আকাশের মেঘমালায় ভেসে আসতে দেখবে!

অতএব হে সত্যান্বেষীগণ! নিশ্চিত জানবেন, এগুলো সবই রূপক বিষয় আর কখনো এগুলো বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার হয় নি। হযরত মসীহ্‌র বলার উদ্দেশ্য কেবল এটুকুই যে, সেটি ধর্মের জন্যেও এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হবে। তখন এমন বিপথগামিতার আধার বিরাজ করবে যে 'সূর্যের আলোক' অর্থাৎ রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর শরীয়ত ও কিতাবের আলো দেখেও মানুষ তাদের চোখ খুলবে না। কেননা তাদের কুপ্রবৃত্তির পর্দার কারণে কুরআনী শরীয়তের মতো সূর্য তাদের জন্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর চন্দ্রও তাদের আলোকিত করবে না। অর্থাৎ আওলিয়াদের দ্বারাও তাদের কোন লাভ হবে না। ধর্মহীনতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন খোদার প্রিয়জনদের ভালোবাসাও তাদের অন্তরে আর থাকবে না। 'আকাশের নক্ষত্ররাজিও খসে পড়বে' অর্থাৎ খোদপ্রেমিক আলেমরাও মৃত্যুবরণ করবেন। সর্গীয় শক্তির ভীত নড়ে যাবে, অর্থাৎ আকাশ ওপর দিকে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে ঊর্ধ্বলোকে) কাউকে আকর্ষণ করতে পারবে না। মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মাটির (পার্থিবতা) দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে, অর্থাৎ মানুষের ওপর অবাধ্য প্রবৃত্তির আকর্ষণ হবে প্রবল। তখন যুদ্ধবিগ্রহ হবে না এবং সাধারণ মানুষের সুখশান্তিতেও ব্যাঘাত ঘটবে না। বরং নূহের যুগের মতো একটি শান্তি স্থাপনকারী সরকারের অধীনে সেই সব লোক বসবাস করবে যাদের মাঝে 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' আবির্ভূত হবেন। স্মরণ রাখা উচিত, হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগ নিজ সামাজিক নিয়মনীতির দিক দিয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এক যুগ ছিল। মানুষ তাদের সুদীর্ঘ আয়ু পরম স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও কল্যাণ এবং নিরাপত্তার মাঝে অতিবাহিত করছিল। এ কারণেই মানুষ চরমভাবে গাফিল ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। জানা নেই তখন কোন ব্যক্তি শাসন ছিল নাকি গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সর্বসাধারণের জন্যে সার্বিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়েছিল। মোটকথা, ওই যুগের মানুষ আরাম এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে জীবনযাপনে এ যুগের সেসব লোকের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা ব্রিটিশ সরকারের স্নেহের ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করে।

সরকারের পক্ষ থেকে যে বিপুল মাত্রায় আরাম ও সুখশান্তির উপায় উপকরণ প্রজাদের জন্যে সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলো গণনা করাও দুষ্কর। অন্য কথায়, তাদের ইহজীবনকে বেহেশততুল্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অত্যধিক আরাম ও নিরাপত্তার কারণে মানুষের অন্তরে এ আপদ ভর করেছে যে, জাগতিক জীবন অতি সুমিষ্ট বিবেচিত হয়ে প্রতিনিয়ত এর প্রতি মোহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেদিকেই তাকান মানুষের মধ্যে কেবল এ আকাঙ্ক্ষাই ফুঁসে উঠছে যে, দুনিয়ার এই বাসনাটা পূর্ণ হোক আর ওই মনোবাসনাও চরিতার্থ হোক আর শান্তি ও নিরাপত্তা

বিস্তার লাভের কারণে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের কদর বেড়ে যাচ্ছে। যে-সব কৃষিজমি শিখদের আমলে কেউ বিনামূল্যেও নিতে চাইতো না তা লাখ লাখ টাকায় বিক্রয় হচ্ছে আর আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার এত পথ খুলে গেছে যে, মানুষ ময়লা-আবর্জনা ও হাড়গোড় বিক্রির মাধ্যমে এমনভাবে লাভবান হচ্ছে যা এর পূর্বের যুগে উত্তম শ্রেণির শস্যদানা বিক্রয়েও ততটা লাভবান হওয়া সম্ভব হতো না। কেবল এমন আরাম বা সুযোগ সুবিধাই নয়, বরং চোখ তুলে তাকালেই দেখা যাবে, সব ধরনের জীবনোপকরণ তথা সফরের ও গৃহাভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধার সেসব উপকরণাদি বেরিয়ে এসেছে যা এর আগের যুগে সম্ভবত স্বপ্নেও কেউ দেখে নি। অতএব এই সদাশয় সরকারের যুগটিকে যদি হযরত নূহ্ (আ.)-এর শান্তিপূর্ণ যুগের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এ যুগটি নিঃসন্দেহে উত্তম সাব্যস্ত হবে।

এখন এ বিষয়টি যেহেতু প্রমাণ হলো যে, সত্য মসীহ্ কখনো এমন যুদ্ধবিগ্রহ ও অত্যাচার-নিপীড়নমূলক যুগে আসার প্রতিশ্রুতি দেন নি, যে যুগে কোন ব্যক্তি শান্তিতে বসবাস করতে পারে না এবং নেক ও পুণ্যবান লোকদের আটক করে আদালতের সোপর্দ করা হয় আর তাদের হত্যা করা হয়; বরং হযরত মসীহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, তেমন নৈরাজ্যপূর্ণ যুগগুলোতে মিথ্যা মসীহ্রাই খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মাঝে সৃষ্টি হবে। যেভাবে সেই পূর্বের যুগগুলোতে মসীহ্ হওয়ার দাবিদার বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই হযরত মসীহ্ জোর দিয়ে বলেন, সেই প্রাথমিক যুগগুলোতে আদৌ আমার আগমন ঘটবে না। গোলযোগ, নৈরাজ্য, অত্যাচার-নিপীড়ন এবং যুদ্ধবিগ্রহের যুগে কখনো আমি আসব না বরং শান্তির যুগে আসব।' তবে সেই সময় পরম শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য কারণে অধার্মিকতার রাজত্ব হবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাবে, যেমনটি নূহের যুগে হয়েছিল। অতএব এটি অতি উত্তম এমন এক চিহ্ন যা হযরত মসীহ্ তাঁর পুনরাগমনের লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আপনারা চাইলে এটি গ্রহণ করতে পারেন।

এস্থলে এ প্রশ্নেরও সদুত্তর আবশ্যকীয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ কোন উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধার জন্য আবির্ভূত হবেন। যদি মনে করা হয় যে, তিনি দাজ্জালকে বধ করার জন্য আসবেন, তাহলে এ ধারণাটি অত্যন্ত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য। কেননা একজন কাফিরকে হত্যা করা এমন কোন বড়ো কাজ নয় যার জন্য একজন নবীর প্রয়োজন দেখা দেবে। বিশেষ করে যেখানে বলা হয়েছে, 'মসীহ্ যদি হত্যা নাও করেন তবুও দাজ্জাল নিজে নিজেই গলে বিলীন হয়ে যাবে।' বরং প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমন নির্ধারণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির ওপর

ইসলাম ধর্মের সত্যতার অকাট্য যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাতে পৃথিবীর সকল জাতি ঐশী অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে যায়; 'মসীহ্‌র নিঃশ্বাসে কাফির মরবে মর্মে (হাদীসে) এদিকেই ইঙ্গিত।' অর্থাৎ স্বতঃস্পষ্ট যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। মসীহ্‌র দ্বিতীয় কাজটি হবে ইসলামকে (মানবসৃষ্ট) ভুলভ্রান্তি ও অন্যায় সংযোজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সামনে সেই শিক্ষা উপস্থাপন করা যা সঞ্জীবনী শক্তি ও সততায় পূর্ণ। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র তৃতীয় কাজটি হবে দুনিয়ার সকল জাতির সোচ্চার হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি সঞ্চার এবং নিষ্ঠাবান হতে কপট ও মুনাফিকদের পৃথক করা।

অতএব উক্ত তিনটি কাজ খোদা তা'লা এ অধমের ওপর ন্যস্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আদিকাল থেকে এটাই নির্ধারিত যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তার যুগের 'মুজাদ্দিদ' (ঐশী সংস্কারক) হবেন। খোদা তা'লা তার মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের 'তাজদীদ' তথা সংস্কারকার্য সাধন করবেন। খোদা তা'লা চেয়েছেন যে, এ তিনটি সেই বিষয় এ অধমের মাধ্যমে প্রকাশিত হোক। অতএব তিনি তাঁর অভিপ্রায় পূরণ করবেন এবং নিজের বান্দাকে সাহায্য করবেন।

যদি বলা হয় হাদীসসমূহ যখন পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলছে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে 'নাযিল' হবেন, দামেস্কের পূর্বে মিনারের কাছে অবতরণ করবেন আর দুইজন ফেরেশতার কাঁধে তাঁর হাত থাকবে, তখন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এ বর্ণনাটি কেন অস্বীকার করা হবে ? এর উত্তর হলো, 'আকাশ থেকে অবতরণ বলতে এটা বোঝায় না যে, আক্ষরিক অর্থে মাটির দেহধারী সত্তা আকাশ থেকে নামবে বরং সহীহ্ হাদীসসমূহে তো আকাশ শব্দটিও নেই। আর 'নুযূল' তথা অবতরণ শব্দটিও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-ব্যক্তি এক স্থান থেকে রওনা দিয়ে অন্য স্থানে গিয়ে অবস্থান করে তার বেলায়ও এটাই বলা হয় যে, সে এখানে 'নাযিল' হয়েছে, তথা সে এখানে অবস্থান করছে। আরো যেমন বলা হয়, অমুক স্থানে সৈন্যদল বা যাত্রীদল অবতরণ করেছে, এতে কি এটা মনে করা যায় যে সেই সৈন্যদল বা যাত্রীদল আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে? এছাড়াও খোদা তা'লা কুরআন শরীফে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-ও আকাশ থেকেই অবতরণ করেছেন বরং আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন লোহাও তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন। (দেখুন! যথাক্রমে সূরা আত তালাক: ১১, ১২ ও সূরা আল হাদীদ: ২৬– অনুবাদক)। অতএব এটা স্পষ্ট বিষয় যে, আকাশ থেকে 'নুযূল' বা অবতরণ সে-আকারে ও সেভাবে হয় না যেভাবে মানুষ ভাবছে।

রূপকের ব্যবহার সার্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও, যাতে হাদীস পরিপূর্ণ আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিব্যদর্শন ও স্বপ্নসমূহও তাতে পরিপূর্ণ; তবুও দামেস্ক শব্দটির অর্থ (সিরিয়ার) দামেস্ক করা প্রমাণবিহীন একটি দাবি আর অনাবশ্যক বিষয়কে আবশ্যক জ্ঞান করা বইকি*। এও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, ঐশী ভবিষ্যদ্‌বাণীতে কোন কোন বিষয় গোপন রাখা হয়, আর কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে সবকিছু প্রকাশ করা হবে– এমনটি খুবই বিরল। কেননা ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোতে মহান স্রষ্টা, আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনায় তাঁর সৃষ্টির এক রকম পরীক্ষা করাও অভিপ্রেত হয়ে থাকে। আর তাই বেশির ভাগ ভবিষ্যদ্‌বাণী নিম্নবর্ণিত আয়াতটির সত্যায়নস্থল বা সত্যায়নকারী হয়ে থাকে–

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا

[অর্থ: এর মাধ্যমে তিনি অনেককে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে এর মাধ্যমে তিনি হেদায়াত দান করেন' *(সূরা আল বাকারা: ২৭)*– অনুবাদক] এ কারণেই সবসময় বাহ্যিকতার পূজারিরা ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতার সময় ভুল করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্বীকারকারী ও উদ্দিষ্ট সত্য গ্রহণে বঞ্চিত ওই সব লোকই হয়ে থাকে যারা চায়, যেভাবে তারা বুঝে থাকে বা ধারণা করে, ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতিটি হরফ যেন বাহ্যিক আকারে সেভাবেই পুরা হয়, অথচ সেভাবে কখনো পুরা হয় না। যেমন হযরত মসীহ্ (আ.) সম্পর্কে বাইবেলের কোন কোন ভবিষ্যদ্‌বাণীতে লেখা ছিল যে, তিনি বাদশাহ্ হবেন কিন্তু মসীহ্ যেহেতু নিরীহ গরীব-মিসকিনের মতো আত্মপ্রকাশ করেছেন, সে কারণে ইহুদিরা তাঁকে গ্রহণ করে নি। এ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের কারণ কেবল (বাহ্যিকতার পূজা বা) শব্দ-পূজাই ছিল, অর্থাৎ তারা রাজত্ব বা শাসন শব্দটিকে নিছক বাহ্যিক ও স্থূল অর্থে গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আমাদের নেতা ও অভিভাবক মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তওরাতে হযরত মূসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ ছিল যে, তিনি (সা.) বনি ইসরাঈলের মাঝে এবং তাদের ভাইদের মধ্য থেকে জন্ম হবেন। এ কারণেই ইহুদিরা উক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীর মর্ম বা বিষয়বস্তু এ বলেই ধরে নিয়েছে যে, তিনি (সা.) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে জন্ম গ্রহণ করবেন। অথচ বনী ইসরাঈলের ভাই বলতে (প্রকৃতপক্ষে) বনী ইসমাঈল বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে খোদা তা'লা কোটি কোটি মানুষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করার জন্য 'বনী ইসরাঈলের ভাইদের' পরিবর্তে 'বনী ইসমাঈল' শব্দ লিখে দিতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনি সেরূপ করেন নি। কেননা

---

* *পঞ্চম টীকা ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*

মাঝে একটা গ্রন্থি রেখে তিনি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরীক্ষা নিতে চান। এ কারণেই এবং এ লক্ষ্যেই উপমা ও রূপকের ভাষায় অনেক সংবাদ দেয়া হয়। এতে দৃষ্টিপাতকারীরা দুদলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সেই দল যারা কেবল মাত্র বাহ্যিকতার পূজারি ও বাহ্যদর্শী হয়ে থাকে। যারা রূপককে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে ভবিষ্যদ্‌বাণীকে আক্ষরিক আকারে পূর্ণ হতে দেখতে চায়। এটি সে শ্রেণি যারা নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে প্রকৃত সত্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকে ও হতভাগাই থেকে যায় বরং চরম পর্যায়ের শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পর্যন্ত বিষয় গড়ায়।

পৃথিবীতে যত জন নবী ও রসূল এসেছেন যাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ভবিষ্যদ্‌বাণী মজুদ ছিল তাঁদের কঠিন অস্বীকারকারী ও ঘোরতম শত্রু সেসব লোকই হয়েছে যারা ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর শব্দমালাকে বাহ্যিক ও আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখতে চেয়েছে। যেমন এলিয়া নবীর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া এবং মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন সম্পর্কে বাইবেলে এভাবে লেখা আছে যে, এলিয়া নবী যাকে আকাশে উঠানো হয়েছে সে নবীই পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন। এ বাহ্যিক শব্দগুলোকে ইহুদিরা আক্ষরিক অর্থে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। যদিও হযরত মসীহ্‌র মতো একজন মহান নবী সুস্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দেন যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন বলে যে, এলিয়ার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে তিনি যাকারিয়ার পুত্র সেই ইয়াহিয়া বটে, যিনি তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা তাঁকে গ্রহণ করে নি। বরং এসব কথার দরুনই হযরত মসীহ্‌র প্রতি তারা ভীষণ চটে যায় এবং হযরত মসীহ্ সম্পর্কে ধারণা করতে শুরু করে যে তিনি তওরাতের বাক্যসমূহকে ভিন্ন অর্থ পরিয়ে বিকৃত করতে চান। কেননা তাদের বাহ্যদর্শী পার্থিব ধারণার কারণে তাদের আশাভরসা তাতেই দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ছিল। এখনো তাদের সেই অলীক ধারণাই তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, সত্যি সত্যি এলিয়া ইহুদিদের মাঝে সর্বসাধারণের চোখের সামনে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। ফেরেশতারা তাঁর ডানে ও বায়ে ধরে তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাসের (জেরুযালেমে) কোন উঁচু ভবনের ছাদে নামিয়ে দেবে। তারপর কোন সিঁড়ির সাহায্যে হযরত এলিয়া (ইলিয়াস) নীচে নেমে আসবেন আর ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইহুদিদের সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। যেহেতু তাদের এলহামী পুস্তকাদিতে এও লেখা আছে যে, মসীহ্‌র আগমনের পূর্বে এলিয়ার অবতরণ আবশ্যকীয়, এ জটিল ধাঁধার কারণেই, অর্থাৎ তাদের ধারণা অনুযায়ী এলিয়া যেহেতু এখনো আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন নি, কাজেই তারা মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌র ওপর ঈমান আনতে পারে নি এবং পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, 'কে আপনি তা আমরা

জানি না। কেননা যে মসীহ্‌র জন্য আমরা অপেক্ষমান তার আসার আগেই এলিয়া আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে মসীহ্‌র আগমনের পথ সুগম করা আবশ্যক।'

এর উত্তরে যদিও হযরত মসীহ্ জোর দিয়ে বারবার তাদের বলেন, 'যে এলিয়ার আসার কথা তিনি যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়া বা যোহনই বটে যাঁকে তোমরা শনাক্ত কর নি।' কিন্তু ইহুদিরা মসীহ্‌র এ বক্তব্যটি কখনো মেনে নেয় নি বরং মনে করেছে, এ ব্যক্তি (তথা মসীহ্ নাউযুবিল্লাহ্) তওরাতের ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোতে স্বেচ্ছাচারিতামূলক পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ ঘটাচ্ছেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক গুরুকে বিশেষ এক মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দেয়ার উদ্দেশ্যে (ভবিষ্যদ্‌বাণীর) বাহ্যিক অর্থে মনগড়া পরিবর্তন আনছে। অতএব বাহ্যিকতার পূজাই ইহুদিদের প্রকৃত সত্য অনুধাবন থেকে বঞ্চিত রাখে এবং কেবল শব্দের ওপর জোর দেয়া এবং রূপক ভাষ্যকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে নেয়ার কারণে চিরস্থায়ী অভিশাপের ভাণ্ডার তাদের ভাগে আসে অথচ তারা নিজেদের ক্ষমার্হ ও অপারগ বলে মনে করত। কেননা বাইবেলের বাহ্যিক শব্দাবলির (আক্ষরিক অর্থের) ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আমাদের মুসলমান ভাইও একই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে আছেন এবং হযরত মসীহ্ সম্পর্কে ইহুদিদের মতো তাদের অন্তরেও এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তারা তাঁকে আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে। তারা সবিস্ময়ে এ বিরল ঘটনা নিজ চোখে দেখবে যে, হযরত মসীহ্ হলুদ রঙের পোশাকে আকাশ থেকে নেমে আসছেন এবং ডানে-বামে ফেরেশতারা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। আর হাটবাজার ও গ্রামগঞ্জের সব মানুষ বিশাল এক মেলার মতো একত্রিত হয়ে দূর থেকে তাঁকে নামতে দেখবে এবং ছোটো-বড়ো সকলেই চিৎকার করে বলবে, এইতো এলেন এইতো এলেন। পরিশেষে তিনি দামেস্কের পূর্বে মিনারের ওপর নামবেন। সিঁড়ির মাধ্যমে তাঁকে নীচে নামানো হবে। একের অন্যের সাথে আস্‌সালামু আলাইকুম এবং কুশল বিনিময় হবে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এ লোকগুলো খেয়াল করেন না যে, দুনিয়া একটি পরীক্ষার স্থান এখানে এ ধরনের নিদর্শন কখনো প্রকাশ পায় না। নতুবা ইসলামের তবলিগ করার অর্থ হলো 'ঈমানু বিল গায়েব'; কিন্তু তাদের কথা অনুসারে বিষয়টি অদৃশ্যে বিশ্বাসের সীমার বাইরে চলে যাবে। আমি ইতঃপূর্বে লিখে এসেছি, মক্কার কাফিররা এ ধরনের মু'জিযাই সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছেও দাবি করেছিল। তাদের পরিষ্কার এ উত্তর দেয়া হয়েছিল যে, এমনটি হওয়া আল্লাহ্‌র রীতি পরিপন্থি।

আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের জাতির লোক রূপক বিষয়কে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে কঠিন সমস্যায় নিপতিত হয়েছে আর এমন সংকটের সম্মুখীন হয়ে আছেন যে, এখন সেগুলো হতে সহজে বের হওয়া তাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে বেরিয়ে আসার যে-সব পথ রয়েছে সেগুলোকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। যেমন সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মসীহ্ যখন আকাশ থেকে অবতরণ করবেন তখন তাঁর পোশাক হলুদ রঙের হবে– এ শব্দগুলো দ্বারা বাহ্যিক পোশাক বলেই ধরে নেওয়া কত অবান্তর ধারণা! হলুদ রঙের কাপড় পরার কোন কারণ জানা যায় না। কিন্তু এ শব্দগুলোকে দিব্যদর্শনভিত্তিক রূপক বর্ণনা আখ্যা দিয়ে স্বপ্ন তত্ত্ববিদদের ভাবধারা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা করতে চাইলে তা যুক্তিযুক্ত অর্থ হবে।

হযরত মসীহ্ তাঁর আবির্ভাবের সময়, অর্থাৎ যখন তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি করবেন তখন তিনি কিছুটা অসুস্থ হবেন, তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা তখন খুব একটা ভালো থাকবে না। কেননা স্বপ্নের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত পুস্তকাদি অনুযায়ী হলুদ রঙের পোশাক পরার এটাই ব্যাখ্যা। এটা স্পষ্ট যে, এ ব্যাখ্যাটিই দিব্যদর্শন ও স্বপ্নের জগতের সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও সহজেই অনুমেয়। কেননা স্বপ্নতত্ত্বের গ্রন্থাবলিতে পরিষ্কার লেখা আছে, কোন ব্যক্তিকে যদি হলুদ রঙের পোশাক পরা দেখা যায় তাহলে এর তা'বীর করা উচিত সেব্যক্তি অসুস্থ বা অসুস্থ হতে যাচ্ছে। হায়! গবেষক-সুলভ রুচি অনুযায়ী আমাদের তফসীরকারক ও হাদীসবিদগণ যদি (হাদীস বর্ণিত) উক্ত বাক্যের এ অর্থই করতেন, অর্থাৎ বলতেন যে মসীহ্ আবির্ভূত হয়ে যখন তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার বিষয়টি জনগণের কাছে প্রকাশ করবেন তখন তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা ভালো থাকবে না বরং নিশ্চিতভাবে তিনি কোন না কোনভাবে দৈহিক অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগবেন যা তাঁর আবির্ভাবের জন্য বিশেষ উর্দিতুল্য একটি লক্ষণ হবে। এই তত্ত্বমূলক অর্থ করলে সেটি কত উত্তম ও সূক্ষ্ম হতো, কিন্তু আক্ষেপ! আমাদের আলেমরা তেমনটি করেন নি। বরং তাঁরা তাদের অতি সরলতা ও ভুল ধারণার বশবর্তীতার কারণে হুবহু ইহুদিদের মতো অপেক্ষা করছেন যে, সত্যি সত্যি (সশরীরে) মসীহ্ আকাশ থেকে যখন অবতীর্ণ হবেন তখন জাফরানে রঙিন করা হলুদ রঙের এক পোশাক তাঁর গায়ে পড়া থাকবে। হায়! এ শ্রেণির উলামার যদি কখনো এ রকম স্বপ্ন দেখারও অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে থাকত যে, (স্বপ্নে) তারা হলুদ রঙের কাপড় পরে আছেন, এরপর তারা রোগে ভুগতেন তাহলে আজ তাদের দৃষ্টিতে আমার এ কথাগুলো গুরুত্ব পেতো ও গ্রহণ করার যোগ্য বলে প্রতীয়মান হতো। সমস্যা হলো

আধ্যাত্মিক জগতে তাদের বিচরণ নেই, বরং বলা যায় এতে তাদের প্রবেশাধিকারই নেই। তাই তো ইহুদি আলেম-উলামার মতো প্রত্যেক বিষয়কে তারা আক্ষরিক রূপ দিতে চায়। পক্ষান্তরে আরো একটি শ্রেণি রয়েছে যাদের আল্লাহ্ তা'লা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দান করেছেন– তাঁরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়াদিকে ঊর্ধ্বলোকের নিয়মকানুন অনুসারে অনুধাবন করতে চান এবং তারা রূপক ও উপমার যথার্থতা স্বীকার করেন। কিন্তু পরিতাপ! তারা সংখ্যায় খুবই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ জাতীয় লোকই আমাদের জাতির মাঝে বিপুলভাবে ছড়িয়ে রয়েছেন যারা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণেই বদ্ধপরিকর। মোটেই বুঝেন না, ওহী, এলহাম ও কাশফ সম্পর্কে খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন স্পষ্টভাবে তাদের ধ্যানধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। শত-সহস্রবার স্বপ্নে অভিজ্ঞতা হয়, একটি জিনিস দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে বুঝায় অন্য কোন এক জিনিস। মানুষ (স্বপ্নে) এক ব্যক্তিকে আসতে দেখে এরপর সকালে তার সদৃশ বা অনুরূপ অন্য কেউ এসে যায়। নবীদের বাণী ও বর্ণনায় রূপকার্থে বা উপমার ভাষায় অনেক কথা থেকে থাকে। দেখুন! আমাদের নেতা ও অভিভাবক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীনদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে প্রথমে সে মারা যাবে যার হাত লম্বা হবে। এ হাদীস শুনে নবী-পরিবারের সবার এ বিশ্বাসই জন্মেছিল যে, লম্বা হাত বলতে বাহ্যত দৈহিকভাবে হাত লম্বা হওয়াকেই বোঝায়। একপর্যায়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীগণ পরস্পরের হাত মাপতে শুরু করেন। কিন্তু সবার আগে যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন মারা গেলেন তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, লম্বা হাত দ্বারা ত্যাগ স্বীকার ও বদান্যতার গুণ বুঝায়। এ গুণটি যয়নব রাযিআল্লাহু আনহার মধ্যে অন্য সবার চেয়ে বেশি দৃশ্যমান ছিল।

'জন্মান্তর'-এর ধারায় হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম দুনিয়ায় পুনরাগমন করবেন– এমন ধারণা বস্তুতপক্ষেই সবচেয়ে বেশি পরিত্যাজ্য এবং লজ্জাজনক। জন্মান্তরবাদ মান্যকারীরা দুনিয়ায় এমন ব্যক্তির পুনরাগমনে বিশ্বাসী যার আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু যারা সার্বিকভাবে পরিপূর্ণতার সব মার্গ অতিক্রম করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এমন সব ব্যক্তিকে উক্ত মতবাদ মান্যকারীদের মতে (কেবল) এক সুদীর্ঘকালের জন্যে মুক্তিখানায় প্রবেশ করানো হয়। পক্ষান্তরে আমাদের (মুসলিম) বিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতবাসীদের ক্ষেত্রে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি হলো, 'তারা সেখান থেকে কখনো বহিষ্কৃত হবেন না'। কাজেই আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের আলেমবৃন্দ কেন হযরত মসীহ্কে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে বের করতে চান? নিজেরাই মানুষকে এ কিচ্ছা শোনান

যে, হযরত ইদ্রিস (আ.) যখন মৃত্যুর ফেরেশতার অনুমতি নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করেন তখন 'মালাকুল মওত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা চাইলেন, তিনি যেন বেরিয়ে আসেন, কিন্তু হযরত ইদ্রিস বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করলেন এবং এ আয়াত وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ [অর্থ: 'আর তারা কখনো সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না'– শুনিয়ে দিলেন। *(সূরা আল হিজর: ৪৯)*– অনুবাদক]। এখন আমি জিজ্ঞেস করি, হযরত মসীহ্ (আ.) কি এ আয়াতটি থেকে লাভবান হওয়ার অধিকার রাখেন না? এ আয়াত কি তাঁর ক্ষেত্রে 'মনসুখ বা রহিত বলে গণ্য হবে?! যদি বলা হয়, তাঁকে এই অধঃপতিত অবস্থায় এজন্য প্রেরণ করা হবে যে, কিছু সংখ্যক লোক অন্যায়ভাবে তাঁকে খোদা বানিয়েছিল! কিন্তু এটাতো তাঁর অপরাধ নয়। আল্লাহ্ বলেন, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [অর্থ: 'ভারবহনকারী কোন আত্মা কখনো অন্য কারও বোঝা বহন করবে না' *(সূরা আল আনআম: ১৬৫)*– অনুবাদক]।

এ বিষয়টিও একান্ত ভেবে দেখার দাবি রাখে যে, সত্যি সত্যি মসীহ্ ইবনে মরিয়মই বেহেশত থেকে বেরিয়ে দুনিয়ায় নেমে আসবেন– এরকম ধারণা পবিত্র কুরআনের বিশদ বর্ণনাসমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কুরআন করীম তিনটি জায়গায় হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মারা যাওয়ার কথা অতি পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করে এবং হযরত মসীহ্র পক্ষ থেকে এ অজুহাত উপস্থাপন করে যে, খ্রিষ্টানরা যে তাঁকে (তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী) খোদা বানিয়েছে– এ কারণে হযরত মসীহ্র বিরুদ্ধে কোন এলযাম বা অভিযোগ নেই। কেননা তিনি এই বিপথগামীতার যুগ আসার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মোটকথা, কুরআন করীমের শিক্ষা হচ্ছে হযরত মসীহ্ (আ.) বহু যুগ আগে মারা গিয়েছেন। এখন আমাদের আলেমবৃন্দের যদি কুরআন মজীদের তুলনায় হাদীসের প্রতি বেশি ভালোবাসা থেকে থাকে তাহলে তাদের ওপর বাধ্যতামূলক কর্তব্য ন্যস্ত হয় তারা যেন হাদীসসমূহের এমন অর্থ করেন যাতে কুরআন করীমের বিষয়বস্তুর অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া আবশ্যকীয় হয়ে না দাঁড়ায়। আমি যথাসম্ভব চিন্তা করে দেখেছি আর খোদিত অক্ষরে লেখার মতো এ বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, এ অবধি আমাদের মৌলবীগণ কুরআন করীমের সাথে হাদীসসমূহের সমন্বয় বিধানের দিকে এক বিন্দু পরিমাণও মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি। ঘটনাচক্রে যে দিকে খেয়াল ধাবিত হয়েছে সেটার ওপরই তারা জোর দিয়ে চলেছেন। আমি নিশ্চিত জানি, হাদীসসমূহের বাহ্যিক শব্দাবলি থেকে তাদের সৃষ্ট ধ্যানধারণা এবং কুরআন করীমের মধ্যে সমন্বয় করে দেখানো আমাদের উলামাবৃন্দের পক্ষে আদৌ কোন সহজসাধ্য বিষয় নয়। বরং এ বিষয়ের দিকে যখন তারা মনোযোগী হবেন তখন তাদের সৎচেতনা, অন্য কথায় তাদের বিবেক স্বয়ং তাদেরকেই অভিযুক্ত

করবে, যে-সব ধ্যানধারণা বাহ্যিক আকারে, স্থূল অর্থে তাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রয়েছে সেগুলোকে তারা কক্ষনও কুরআন করীমের স্বতঃস্পষ্ট আয়াতসমূহের সাথে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখাতে পারবেন না, অথবা কুরআন করীমের ঐসব আয়াতের ক্ষেত্রে কোন 'তা'বীল' বা সমন্বয়কারী ব্যাখ্যার পথও খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন না। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, কোন হাদীস যখন এর অর্থ ও মর্মের দিক দিয়ে কুরআন করীমের সুস্পষ্ট শিক্ষামালার পরিপন্থি সাব্যস্ত হয় তখন কুরআন করীমে বিশ্বাস স্থাপন করা অগ্রগণ্য। কেননা হাদীসের মর্যাদা কখনো কুরআন মজীদের মর্যাদার সমকক্ষ নয়। হাদীসের প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতার মানকে দুর্বল করতে পারে এমন যে-সব সংশয়-সন্দেহ ও আশঙ্কা রয়েছে সেসব আশঙ্কার একটিও কুরআন করীমের ওপর আরোপিত হতে পারে না। কাজেই কেনইবা আমরা কুরআন মজীদকেই অগ্রাধিকার দেবো না? কুরআনের শুদ্ধতার ওপর তো সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে এবং কুরআন করীম যে সংরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছে, এর পক্ষে অতি উচ্চমানের যুক্তিপ্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। বস্তুত আমাদের আলেমবৃন্দের ওপর 'ওয়াজিব' ও অবশ্য কর্তব্য হলো, তারা যেন এ প্রসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপনের পূর্বে প্রথমে কুরআন করীম এবং হাদীসসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মাঝে পরস্পর পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করে দেখানো এবং যুক্তি-সংগতভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেয়া যে, কুরআন করীম যেখানে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ করা সাব্যস্ত করে, সেখানে তাঁর মারা যাওয়া ও বেহেশতে প্রবেশ করা সত্ত্বেও তাঁর সেই দেহ যা কুরআনের প্রাঞ্জল বর্ণনা অনুযায়ী ভূগর্ভে সমাহিত; সেটি কীভাবে আকাশ থেকে নেমে আসবে?

এক্ষেত্রে কেবল কুরআন করীমই তাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি নয়, বরং সহীহ্ হাদীসসমূহও সম্পূর্ণ বিপরীত ও প্রকাশ্যভাবে তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন সহীহ্ বুখারী শরীফে "ইমামুকুম মিনকুম" (তোমাদের ইমাম; তোমাদেরই মধ্য থেকে হবেন) হাদীসটি যদি নানা রকম 'তা'বীল' ও ব্যাখ্যার যাঁতাকলে পিষ্ট করা না হয় এবং হাদীসটির দৃশ্যমান যে শব্দাবলি রয়েছে তদনুযায়ীই এর অনুবাদ করা হয় তাহলে এ হাদীসটির অর্থ হলো, তিনি তোমাদের নেতা হবেন এবং তোমাদেরই মধ্য থেকে হবেন, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ একজন মুসলমান (উম্মতি) হবেন। যে মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌র ওপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাঁকে আলাদা এক উম্মত দেয়া হয়েছিল, সত্যি সত্যি সেই মসীহ্ আকাশ থেকে নেমে আসবেন– এমনটি নয়। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত, ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল (রহ.) তাঁর প্রণীত 'সহীহ্ বুখারী'-তে আগমনকারী মসীহ্ সম্পর্কে কেবল 'ইমামুকুম মিনকুম'– হাদীস বর্ণনা করে নীরব হয়ে গেলেন তা হতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত

ইসমাঈল বুখারীর ধর্মবিশ্বাস ছিল যে, সত্যি সত্যি মরিয়ম পুত্র মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে নাযিল হবেন না। আর (আকাশ থেকে সশরীরে) নাযিল হওয়ার পক্ষে তিনি কখনো মত পোষণকারী ছিলেন না। বরং তিনি 'ইমামুকুম মিনকুম'- বাক্যটিতে পরিষ্কার ও প্রকাশ্যভাবে তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসটির কথা ব্যক্ত করে গেছেন। বরং যেভাবে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মূসার আত্মার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেভাবে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই হযরত ঈসার রূহের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করেছেন। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত মূসার কথোপকথন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই এ হাদীস পাঠে এরকম কোন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না যে, হযরত মসীহ্কে যদি সশরীরে আকাশে ওঠানো হয়ে থাকে তাহলে হযরত ইব্রাহীম ও মূসা এবং অন্যসব নবীকেও সশরীরে ওঠানো হয়ে থাকবে। কেননা মে'রাজের রাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদের সবাইকে বিভিন্ন আকাশে একই অবস্থায় দেখতে পান। এমন নয় যে হযরত মসীহ্র মাঝে পার্থিব দেহসহ ওঠানোর কোন বিশেষ পোশাক বা কোন চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন, আর অন্য নবীদের মাঝে ঐরকম পোশাক বা চিহ্ন দেখতে পান নি। হাদীসে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ নেই। মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীসের পাঠকগণ ভালোভাবে জানেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাতে যে-সকল নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের সবার অভিন্ন অবস্থা একইভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ্র কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন নি। আমাদের উলামাবৃন্দের পক্ষে উক্ত বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেওয়া কি আবশ্যিক নয়? 'সূরাতুল কদর'-এর অর্থে গভীর মনোনিবেশে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায়, সেটি হলো, আল্লাহ্ তা'লা এ সূরায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যখন কোন ঐশী সংস্কারক পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখন তাঁর সাথে আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন। তারা প্রকৃতঅর্থে যোগ্য লোকদের সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেন। কাজেই এ আয়াতগুলোর অর্থ ও মর্মের এ নতুন উপকারী দিকটি সামনে আসে যে, ভীষণ ভ্রষ্টতা ও উদাসীনতার যুগে অকস্মাৎ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমে অলৌকিকভাবে মানুষের চেতনা ও ইন্দ্রিয়গুলোতে আপনা আপনি ধর্মীয় সত্যানুসন্ধানের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে শুরু করলে এটি এ বিষয়ের লক্ষণ ও চিহ্ন বলে সাব্যস্ত হবে যে, কোন ঐশী সংস্কারক জন্ম গ্রহণ করেছেন, কেননা 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্রাত্মার অবতরণ ছাড়া উল্লিখিত আলোড়ন বা গতিময়তা সৃষ্টি হতে পারে না। এ আলোড়ন বা গতিশীলতা মানুষের যোগ্যতা ও স্বভাবচরিত্র অনুযায়ী দুপ্রকারের হয়ে থাকে। একটি পরিপূর্ণ আলোড়ন অপরটি অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ গতিময়তা হচ্ছে সেই গতিময়তা যা মানবাত্মায় স্বচ্ছতা ও সরলতা প্রদান করে

এবং বোধবুদ্ধি ও উপলব্ধিক্ষমতাকে পর্যাপ্তমাত্রায় প্রখর করে সত্যের পানে পরিচালিত করে। আর অসম্পূর্ণ গতিশীলতা হলো সেটি, যাতে 'রুহুল কুদুস' বা পবিত্রাত্মার উদ্দীপনে বুদ্ধি ও বোধক্ষমতা কিছুটা প্রখর হলেও স্বভাবজ সম্ভাবনার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটি সত্যমুখী হতে পারে না। বরং আয়াত فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا *(সূরা আল বাকারা: ১১)*-এর সত্যায়নস্থল হয়ে যায় অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির সক্রিয়তার ফলে সে ব্যক্তির পরবর্তী অবস্থা পূর্বাবস্থার চেয়েও খারাপ হয়ে যায়; যেমনটি সকল নবীর যুগে হয়ে এসেছে। তাঁদের আবির্ভাবের সাথে যখন ফেরেশতাদেরও আবির্ভাব ঘটেছে, তখন ফেরেশতাদের অভ্যন্তরীণ প্রণোদন ও উদ্দীপণে প্রত্যেকের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতি সচরাচর সক্রিয় হয়ে যায়। তখন সঠিকপথ সন্ধানী ও সচ্চেতা ব্যক্তিরা সেসব খোদাভীরু লোকের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। আর যারা দুষ্কৃতকারী ও শয়তানের বংশধর ছিল তারা সেই আলোড়নের কারণে উদাসীনতার ঘোর থেকে জেগে ওঠে এবং ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগীও হয়, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু প্রকৃতিগত সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণে সত্যগ্রহণে তৎপর হতে পারে নি। অতএব ঐশী সংস্কারকের সাথে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের নির্ধারিত ক্রিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়পটে কার্যকর হয় বটে কিন্তু এর প্রভাব সচ্চেতাদের ওপর শুভ এবং অসচ্চেতাদের ওপর অশুভ আকারে প্রতিফলিত হয়।

باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ روید در شورہ بوم و خس

(অর্থাৎ 'বারিবর্ষণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো, এতে করে বাগানে সুবর্ণ ফুল-ফলাদি উৎপন্ন হয় এবং ক্ষার জমিতে পেঁচক ইত্যাদির জন্ম হয়।'– অনুবাদক)।

আর যেমন আমি একটু আগে বর্ণনা করে এসেছি,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا – এ মহান আয়াতটি উল্লিখিত সেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত প্রভাবের দিকেই ইঙ্গিত করে।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবকালে একটি 'লাইলাতুল কদর' হয়ে থাকে, যখন সেই নবী ও তাঁকে প্রদত্ত কিতাব ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হয় এবং ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতরণ করে। কিন্তু সবচেয়ে মহান 'লাইলাতুল কদর' হলো সেটি, যা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ লাইলাতুল কদরের ব্যাপ্তি ও পরিধি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ হতে কিয়ামতকাল

অবধি বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত। তাঁর যুগ হতে এ যাবৎকাল অবধি হৃদয় ও মস্তিষ্করূপী শক্তিবৃত্তিতে যে গতিয়মতা ও সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়ে চলেছে তা সবই উল্লিখিত লাইলাতুল কদরের প্রভাবই বটে; পার্থক্য শুধু এটুকু যে, পুণ্যবানদের বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিপূর্ণ ও বক্রতামুক্ত আলোড়ন আন্দোলন দেখা যায় আর দুর্ভাগাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ বক্র ও ভ্রান্তভাবে সক্রিয় হয়। যে যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের কোন নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত জন্মলাভ করেন তখন এ আলোড়নসমূহ এক তীব্রতার সাথে ক্রিয়াশীল হয়। বরং সেই নায়েব মাতৃগর্ভে আসার সময় থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে মানববৃত্তি ও মেধায় ('লাইলাতুল কদর' জনিত) আলোড়ন একটু একটু হতে শুরু হয়ে যায় এবং তাদের সহজাত সামর্থ্য ও সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের মাঝে গতি সঞ্চারিত হয়। আর সেই নায়েবের স্বীয় পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার সময়ে তো এই আলোড়ন বা গতিময়তা অত্যন্ত তীব্ররূপ ধারণ করে।

অতএব, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক নায়েবের আবির্ভাবকালে যে **'লাইলাতুল কদর'** নির্ধারণ করা হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া 'লাইলাতুল কদর'-এর একটি শাখা বা অন্য কথায় তারই একটি প্রতিবিম্ববিশেষ। খোদা তা'লা এই লাইলাতুল-কদরের পদমর্যাদা পরমভাবে উন্নীত করেছেন– যার সম্পর্কে মহান আয়াত فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই **'লাইলাতুল কদর'**-এর যুগে সকল প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানমূলক বিষয় জগতজুড়ে প্রকাশিত ও সম্প্রসারিত করা হবে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিরল ও অপূর্ব জ্ঞানরাশি দুর্লভ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বিস্ময়কর সব শিল্পকারখানা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়া হবে। মানবীয় শক্তিবৃত্তিতে তাদের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন সামর্থ্য ও সম্ভাবনার নিরিখে জ্ঞানবুদ্ধি সম্প্রসারণের যে-সব যোগ্যতা ও প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে বা সেগুলো যতদূর উন্নতি করতে পারে– ততদূর সবকিছুই প্রকাশ করে দেয়া হবে তবে এই সবকিছু ঐ সময়ে ('লাইলাতুল কদর' প্রসূত) আলোড়ন ও গতিময়তার কারণে সংঘটিত হতে থাকবে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত পৃথিবীতে জন্মলাভ করবেন। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিই সূরা আয-যিলযালে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কেননা সূরা যিলযালের পূর্বে সূরা আল-কদর অবতীর্ণ করে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত 'সুন্নত' তথা চলমান রীতি হলো তাঁর মহান কালাম (বা বাণী) কদরের রাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তাঁর নবীও কদরের রাতেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। কদরের রাতেই ঐ সকল ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে থাকে যাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় পুণ্যের প্রতি প্রেরণা জাগে আর ভ্রষ্টতার আমানিশাপূর্ণ রাত থেকে শুরু করে সত্যের

প্রভাত উদিত হওয়া পর্যন্ত তারা সোচ্চার হৃদয়কে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার কাজে নিয়োজিত ও তৎপর থাকে।

পুনরায় এ সূরাটির পরেই খোদা তা'লা সূরা আল-বাইয়্যেনায় নজির বা দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেন যে:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (সূরা বাইয়্যিনা: ২)

অর্থাৎ আহলে কিতাব (ইহুদ-নাসারা) ও মুশরিক-পৌত্তলিকরা যে-সকল মহা বিপদে নিপতিত ছিল, তা থেকে তাদের মুক্তি পাওয়ার স্বয়ং খোদা তা'লা সৃষ্ট পথ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। অর্থাৎ তিনি সেই মহিমান্বিত রসূলকে পাঠালেন, যাঁর সাথে অত্যন্ত জোরদার আলোড়ন আন্দোলন সৃষ্টিকারী ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করলেন, আর এই সাথে তাঁর মহিমান্বিত কালাম তথা কিতাবও অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এরপর অনাগত ভবিষ্যতের জন্য খোদা তা'লা সূরা যিলযালে সুসংবাদ দান করেন: إِذَا زُلْزِلَتِ (অর্থাৎ 'যখন পৃথিবীকে আলোড়িত করা হবে'– অনুবাদক) শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেন যে, তোমরা যখন এ চিহ্নসমূহ প্রত্যক্ষ করবে তখন বুঝে নিও যে, ঐ **'লাইলাতুল কদর'** অত্যন্ত মহিমার সাথে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে এবং কোন ঐশী সংস্কারক খোদা তা'লার পক্ষ থেকে **'হেদায়াত'** প্রসারী ফেরেশতাগণসহ (আবির্ভূত) হয়েছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا – وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا – وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا – يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا – بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا – يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ – فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ – وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (সূরা আল যিলযাল: ২-৯)

অর্থাৎ শেষ যুগে যখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মহামর্যাদাবান কোন সংস্কারক আসবেন, আর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবে, সে-সময়ের লক্ষণ ও চিহ্ন হলো, পৃথিবীকে যতটা আলোড়িত করা সম্ভব তা করা হবে, অর্থাৎ মানবপ্রকৃতি ও তার মন-মস্তিষ্কে নিহিত মেধা ও বৃত্তিসমূহকে চূড়ান্ত মাত্রায় নাড়া দেওয়া হবে। বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি ও পাশবিক এবং হিংসাত্মক ধ্যানধারণা চরম উত্তেজনার সাথে সক্রিয় হয়ে উঠবে। ভূমি এর সব বোঝা বের করে দিবে"– অর্থাৎ মানবহৃদয় সব সুপ্ত সামর্থ্য ও

সম্ভাবনাকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসবে। বা তাদের ভেতরে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে বা তাদের হৃদয়ে ও মন-মস্তিষ্কে নিহিত উত্তম গুণ, বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও যোগ্যতা যা-ই প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা সবই প্রকাশ পেয়ে যাবে। মানবীয় শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনার চূড়ান্ত নির্যাস বেরিয়ে আসবে। মানুষের মাঝে নিহিত যাবতীয় প্রতিভা বা যে-সব আবেগ-অনুভূতি তথা আকর্ষণ রয়েছে তা সম্ভাবনার স্তর পেরিয়ে বাস্তবরূপ ধারণ করবে। মানবেন্দ্রিয়ের সকল প্রকার প্রখরতা মানববুদ্ধিমত্তার সকল সূক্ষ্মদর্শিতা দৃশ্যপটে এসে যাবে এবং সুপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রচ্ছন্ন কৌশল বিদ্যার সকল কবরস্থ সম্পদ ও ধনভাণ্ডার পুরোটা মানুষের করতলগত হবে আর সকল ক্ষেত্রে নিজের চিন্তাচেতনা ও বুদ্ধি-মেধাপ্রসূত চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে চরম শিখরে উন্নীত করবে। আর সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মাঝে যে-সব সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রয়েছে শত রকম আলোড়ন আন্দোলনের দরুন সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং লাইলাতুল কদরে (কদরের রাতে) যুগ-সংস্কারকের সাথে অবতরণকারী ফেরেশতাগণ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার মাঝে নিহিত সামর্থ্যের অনুপাতে অলৌকিক মাত্রায় প্রভাব ফেলবে। অর্থাৎ পুণ্যবান-সচ্চেতা মানুষ তাদের সৎ চেতনা ও সৎ ধ্যানধারণায় উন্নতি করবে এবং যাদের দৃষ্টি জাগতিকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ তারা সে-সকল ফেরেশতার আলোড়নে জাগতিক বুদ্ধিমত্তায় ও সামাজিক কলাকৌশলে এমন নিপুণতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করবে যে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিমাত্র বিস্মিত হয়ে স্বীয় অন্তরে বলবে, 'এসব বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এ লোকগুলো কোথা থেকে লাভ করল?' সেদিন সকল মানবীয় সম্ভাবনা ও প্রতিভা বাস্তবতার ভাষায় বলবে, 'এসব উচ্চমানের ক্ষমতা ও শক্তিনিচয় আমার নিজের নয় বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এটি এক 'ওহী' (বা ঐশী আদেশের ফল) যা সকল সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের মানুষের ওপর তাদের অবস্থানুযায়ী অবতীর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ স্পষ্টত দেখা যাবে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক যে-সব কাজ করছে তা তাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং এক অদৃশ্য প্রেরণা তাদের হাতে এ কাজ করাচ্ছে।

অতএব সেদিন মানুষের সবরকম সহজাত ক্ষমতা ও শক্তিনিচয়ে উদ্দীপনা ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হবে। জড়বাদী চেতনাসম্পন্ন লোকের শক্তিনিচয় ফেরেশতাদের আলোড়নে উদ্দীপিত হলেও যোগ্যতা ও সম্ভাবনার অভাবে তারা সত্যের পানে মুখ ফিরাবে না কিন্তু এক ধরনের উথলে ওঠা ভাব তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে এবং স্থবিরতা ও হতাশা দূরীভূত হয়ে নিজেদের জীবনপরিক্রমায় অদ্ভুত ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্ট, কলাকৌশল ও শিল্প কারখানা তারা আবিষ্কার করে ফেলবে। সৎ-সাধু প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের সহজাত ক্ষমতা ও শক্তিনিচয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ও অলৌকিক ধারায় 'কাশফ ও এলহাম' তথা দিব্যদর্শন ও ঐশীবাণীর স্বচ্ছ প্রস্রবণ দৃশ্যত প্রবহমান থাকবে। মু'মিনের স্বপ্নও বিরলই

মিথ্যা বা নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। এ পর্যায়ে মানবীয় শক্তিবৃত্তির বৃত্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে এবং মানবজাতির মাঝে যা-কিছু প্রকৃতিগতভাবে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছিল তা সার্বিকভাবে প্রদীপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন খোদা তা'লার ফেরেশতাকূল ওই সচ্চেতা-সদাচারী লোকদের সবাইকে একত্রিত করে এক মণ্ডলীভুক্ত করবেন যারা পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করছিল। আর সেই সাথে জড়বাদী সংসারপুজারীদেরও প্রকাশ্যে দৃশ্যমান একটি দল হবে, যাতে করে প্রতিটি দল ও মণ্ডলী নিজ নিজ প্রচেষ্টার ফল দেখতে পায়। এরপরই সমাপ্তি ঘটবে। এটি চূড়ান্ত 'লাইলাতুল কদর' সংক্রান্ত নিদর্শন, যার ভিত্তি এখনই স্থাপন করা হলো। এরই পরিপূর্ণতার জন্য সর্বপ্রথম খোদা তা'লা এ অধমকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন:

أنت أشد مناسبة بعيسى ابن مريم وأشبه الناس به خُلقاً و خَلقاً و زماناً.

[অর্থাৎ 'তুমি মরিয়ম পুত্র ঈসার সঙ্গে সবচেয়ে সামঞ্জস্যসম্পন্ন আর চারিত্রিক ও দৈহিক গঠনে, স্বভাব ও গুণে এবং যুগের (ব্যবধান ও অবস্থাবলির) দিক দিয়েও'– অনুবাদক)]। কিন্তু এ লাইলাতুল কদরের প্রভাব এরপর আর হ্রাস পাবে না, বরং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সক্রিয় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সবকিছু সম্পূর্ণ প্রতিফলিত না হয় যা খোদা তা'লা ঊর্ধ্বলোকে নির্ধারিত করেছেন।

আর হযরত ঈসা আলইহিস্ সালাম তাঁর 'অবতরণে'-এর যে যুগ ইঞ্জিলে বর্ণনা করেছেন, সেটি হবে হযরত নূহের যুগের মতো শান্তিপূর্ণ ও আরামের যুগ। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের পক্ষেই সূরা আয যিলযালের কৃত তফসীর 'দালালাতে ইলতেযামী' (তথা অপরিহার্য প্রমাণ) হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তৃতি ও প্রসার এবং মানবীয় মেধা-বুদ্ধির উন্নতি লাভের যুগ বস্তুতপক্ষে এমনটিই হওয়া উচিত যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। কেননা যুদ্ধবিগ্রহ, নৈরাজ্য ও প্রাণহানির আশঙ্কা এবং শান্তির পরিপন্থি যুগে কখনো সম্ভব নয় যে মানুষ জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্ম-প্রয়াসে উন্নতি লাভ করবে। এসব বিষয় তো পুরোপুরিভাবে তখনই মাথায় আসে যখন পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।

আমাদের উলামা সূরা আল যিলযালের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে তফসীর লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে আখেরী যুগে আক্ষরিক অর্থে অতি তীব্র ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। আর তা এত ভয়াবহ হবে যে, এর ফলে সমগ্র পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যাবে এবং এর ভেতরে যা-কিছু (পদার্থ) আছে তা সবই বেরিয়ে আসবে। আর মানুষ অর্থাৎ কাফির লোক পৃথিবীকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোর কী হয়েছে?' তখন অর্থাৎ সেদিন পৃথিবী কথা বলবে এবং নিজের হালচাল ও বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। এটি সর্বৈব ভ্রান্ত তফসীর যা কুরআন করীমের (এ সূরার) পূর্বাপর

প্রসঙ্গের পরিপন্থি। কুরআন শরীফের এতদস্থলে গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ দুটি সূরা অর্থাৎ সূরা আল-বাইয়্যেনাহ্ ও সূরা আয-যিলযাল প্রকৃতপক্ষে সূরা আল-কদরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং শেষযুগ পর্যন্ত এর অবস্থা তুলে ধরছে। তাছাড়া সকল সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করতে বাধ্য যে, এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময়ে যখন সমগ্র পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যাবে, তখন এমন কাফের লোক কোথায় জীবিতাবস্থায় অবস্থান করবে, যারা পৃথিবীর কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? এ কি সম্ভব যে, পৃথিবীর সমস্তটা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, এমন কি ওপরের স্তর ভেতরে তলিয়ে যাবে এবং ভেতরের স্তর ওপরে বেরিয়ে আসবে, তবুও মানুষ নিরাপদে বেঁচে থাকবে?! বরং (প্রকৃতপক্ষে) পৃথিবী দ্বারা পৃথিবীবাসীদের বোঝায়। আর এটি কুরআন শরীফের সাধারণ একটি বাগধারা যে, পৃথিবী শব্দ দ্বারা মানুষের হৃদয় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিবৃত্তিকে বোঝায়। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু একস্থলে বলেন: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا। [অর্থাৎ 'মনে রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ্ পৃথিবীকে তার মৃত্যু ঘটার পর জীবিত করবেন।' *(সূরা আল হাদীদ: ১৮)*– অনুবাদক]

তিনি আরো বলেন:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا

[অর্থাৎ আর উত্তম ভূমি এর প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে (উত্তম) ফসল উৎপন্ন করে। আর যে (ভূমি) নিকৃষ্ট তা আবর্জনা ছাড়া কিছুই উৎপন্ন করে না' *(সূরা আল আরাফ: ৫৯)*– অনুবাদক]।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে এর আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা কুরআন পাঠকারীদের দৃষ্টির আড়ালে নয়। তাছাড়া আধ্যাত্মিক সংস্কারকদের আবির্ভাব এবং তাঁদের সাথে ফেরেশতাদের অবতরণ এক আধ্যাত্মিক কিয়ামত সদৃশ অবস্থা হয়ে থাকে। এর ফলে (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃতদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং যারা কবরে পড়ে আছে তারা সঞ্জীবিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর সৎ ও অসৎ– উভয় শ্রেণির লোক তাদের পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে যায়। অতএব সূরা আয যিলযালকে (অর্থাৎ এতে বর্ণিত বিষয়াদিকে) যদি কিয়ামতের লক্ষণ গণ্য করা হয়, তাহলে এতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, অনুরূপ সময়টি আধ্যাত্মিকভাবে একপ্রকার কিয়ামতকালই হয়ে থাকে। খোদা তা'লার সাহায্যপুষ্ট বান্দাগণ কিয়ামতের রূপ নিয়েই এসে থাকেন আর তাদের সত্তা কিয়ামত নামে অভিহিত হতে পারে, যাঁদের আগমনে রূহানী মৃতরা জীবিত হতে শুরু করে। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এরূপ যুগ যখন আসবে অর্থাৎ সকল মানবীয় সহজাত শক্তিনিচয় স্বীয়

শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি প্রকাশ করে দেখাবে এবং মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা ও চিন্তাচেতনার পক্ষে যতদূর উড্ডয়ন করা সম্ভব, ততদূর তারা পৌঁছাবে এবং যে-সব গোপন সত্য আদিকাল থেকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য তা যখন সার্বিকভাবে প্রকাশিত হবে তখন এ বিশ্বের নির্দিষ্ট বৃত্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে হঠাৎ করে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

(অর্থ: "এ পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই নশ্বর। কিন্তু প্রতাপ ও মর্যাদার অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সত্তা অবিনশ্বর"– *(সূরা আর রাহমান: ২৭ ও ২৮)*

আমাদের ধর্মবিশ্বাস

ز عشاق فرقان و پیغمبریم بدیں آمدیم و بدین بگذریم

(অর্থাৎ আমি কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত। এটি নিয়ে আমি এসেছি এবং এটি নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করব॥)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করব তা হচ্ছে আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন خاتم النبيّين ও خير المرسلين যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি কুরআন শরীফ শেষ ঐশীগ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা এলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলিকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামা'ত বহির্ভূত, ধর্ম ত্যাগী ও কাফির। আমরা আরো বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চ মার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার ও

পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না। আমাদের যা কিছু লাভ হয় তা কেবল [তাঁর (সা.) আনুগত্যে আত্মিক] প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যস্থতাস্বরূপ লাভ করে থাকি।

আমরা আরো বিশ্বাস রাখি, যে-সকল সৎ, সাধু ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে সম্মান ও সৌভাগ্যে অভিষিক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সব মার্গ পুরোপুরি অতিক্রম করেছেন তাঁদের (অর্জিত) উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যাবলির মোকাবিলায়ও আমাদের উৎকর্ষ বৈশিষ্ট্য যদি আমরা অর্জন করে থাকি তবে তা-ও প্রতিবিম্বস্বরূপ আর তাঁদের মাঝে রয়েছে এমন কোন কোন আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব যা এখন আমরা কোন উপায়েই লাভ করতে পারি না। মোটকথা, আমাদের ঈমান রয়েছে ঐ যাবতীয় বিষয়ে, যা কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বয়ে এনেছেন। এর বাইরে নতুন সব অলীক প্রথা ও বেদা'তকে আমরা এক প্রকাশ্য ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামে পৌঁছানোর পথ বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদের (মুসলমান) জাতির মাঝে এমন লোক বিপুল সংখ্যায় রয়েছেন যারা কুরআন করীমের এবং পবিত্র হাদীসের কিছু গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান যা 'কাশফ ও এলহাম' তথা দিব্যদর্শন ও ঐশীবাণীর মাধ্যমে যথাযথ সময়ে অধিকতর স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হয় সেগুলোকেও কু-প্রথা ও বেদা'তের শ্রেণিভুক্ত করে ফেলেন। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অপ্রকাশিত তত্ত্ব সর্বদা দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ লোকদের সামনে সুপ্রকাশিত হয়ে এসেছে এবং সমসাময়িক যুগের আলেমবৃন্দ সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করে এসেছেন। কিন্তু এ যুগের অধিকাংশ আলেমের আজব এই স্বভাব ও রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নিরবচ্ছিন্ন 'এলহামে বেলায়াত' তথা অলি-আল্লাহ্দের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণী যদি যথোপযুক্ত সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন শরীফের কোন রূপক কথার ব্যাখ্যা করে তবে তারা সেটিকে অস্বীকার করেন এবং উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন অথচ সিহাহ্ তথা প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত এ হাদীসটি তাঁরা সবসময় পড়ে থাকেন যে, কুরআন করীমের 'যাহর' ও 'বাত্ন' তথা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দুটো স্তর বা রূপই রয়েছে এবং এর 'বিস্ময়াবলি' (গভীর সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ) কিয়ামতকাল অবধি নিঃশেষ হতে পারে না। আর তাঁরা নিজ মুখে সদা স্বীকারও করেন যে, অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দেসীন (হাদীসবিদ) আওলিয়াদের কাশফ ও এলহামকে সহীহ্ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত বলেই বিশ্বাস করতেন।

আমার প্রণীত 'ফতেহ ইসলাম' ও 'তৌযিহে মারাম' পুস্তক দুটিতে আমার কাশফ ও এলহামভিত্তিক বিষয়টি আমি প্রকাশ করেছি যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ দ্বারা এ অধমকেই বুঝায়। আমি শুনেছি এর দরুন আমাদের কতিপয় আলেম উত্তেজিত হয়ে ওঠেছেন। তারা এ বিবৃতিটিকে এমনই সব বেদা'তের আওতাভুক্ত বলে মনে করেছেন, যা কিনা 'ইজমা' (সর্বসম্মত অভিমত) ও সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থি। কিন্তু তাদের এরূপ মনে করাটা সম্পূর্ণ ভুল ও সত্যের অপলাপ।

প্রথমত জানা থাকা উচিত, 'মসীহ্র অবতরণ' সংক্রান্ত বিশ্বাস এমন কোন বিশ্বাস নয় যা আমাদের ঈমানের অংশ বা ইসলামের স্তম্ভ গণ্য হবে। বরং শত শত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এটি এক ভবিষ্যদ্বাণীমাত্র যার ইসলামের মূল-তত্ত্বের সাথে সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। যতদিন পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণীটি বর্ণনা করা হয় নাই ততদিন ইসলাম আদৌ ত্রুটিযুক্ত ছিল না; এটি বর্ণিত হওয়ার ফলে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় নি। ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের ক্ষেত্রে এমনটি আবশ্যক নয় যে, এগুলি বাহ্যিক আকারেই পূর্ণ হবে। বরং অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন সব রহস্য অন্তর্নিহিত থাকে যে তা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় স্বয়ং সেই নবীরাও বুঝতে পারেন না; অন্যদের বুঝাতো দূরের কথা। লক্ষ করুন! যেখানে আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.) নিজে স্বীকার করেন যে, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে পূর্ণ হবে বলে মনে করেছিলেন সেগুলো সেভাবে পূর্ণ না হয়ে বাস্তবে ভিন্নরূপে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে অন্যান্য লোক ধরুন সমগ্র উম্মতই হোক না কেন তারা কি করে দাবি করতে পারে যে, তাদের বুঝাতে কোন ভুল নেই? অতীতের পুণ্যবানরা মোটের ওপর ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈমান এনে এর খুঁটিনাটি বা পূর্ণতার বিষয়টি খোদার হাতে সোপর্দ করা পছন্দ করতেন।

আমি ইতঃপূর্বেও লিখে এসেছি, সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি যাতে ঈমান নিরাপদ থাকতে পারে তা হলো, কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিক শব্দাবলির প্রতি গুরুত্বারোপ না করা এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে এ দাবি না করা যে, অবশ্য অবশ্যই এটি আক্ষরিক ও বাহ্যিকভাবেই পূর্ণ হবে। খোদা না করুন পরিশেষে যদি সে আকারে পূর্ণ না হয় তাহলে তো ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধেই নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে ঈমান হাত ছাড়া হবে!

'তোমরা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে কেবল এগুলোর আক্ষরিক ও বাহ্যিক বর্ণনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখবে, কোন রূপকতা বা ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে কখনো গ্রহণ করবে না'– এই মর্মে কোন তাগিদপূর্ণ নির্দেশ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব বোঝা উচিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে বুঝার ক্ষেত্রে

যখন স্বয়ং নবীদের, ভুল করার সম্ভাবনা থাকে সেখানে উম্মতের অন্ধসুলভ মতৈক্য ও এজমার কিবা গুরুত্ব রাখে? এছাড়া আমি কয়েকবারই বর্ণনা করে এসেছি যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীকে কেন্দ্র করে 'ইজমা' বলতে কিছু নেই। কুরআন শরীফ চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট স্বীয় আয়াতসমূহে মসীহ্‌র মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে এবং চিরকালের জন্যে তাঁকে (পৃথিবী থেকে) বিদায় জানায়। ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত 'সহীহ্' হাদীসে امامكم منكم লিখে নিরব থাকেন, অর্থাৎ বুখারী শরীফে (আগমনকারী) মসীহ্‌র কেবল এটুকুই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যে, "তিনি তোমাদেরই মধ্যকার একব্যক্তি হবেন এবং তোমাদেরই ইমাম হবেন।" দামেস্কে 'ইন্দাল মিনারাহ' তথা মিনারার কাছে অবতীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে বটে, কিন্তু এতে করে উম্মতের 'ইজমা' প্রমাণিত হতে পারে না। বরং এ-ও প্রমাণিত হওয়া দুরূহ যে, 'দামেস্ক' শব্দ দ্বারা বস্তুত দামেস্ক নগরই বুঝায় বলে প্রকৃতপক্ষে ইমাম মুসলিমের অভিমত ছিল। (তার এ অভিমত) ছিল বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তবে কেবল এক ব্যক্তির অভিমত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণীসমুহের ক্ষেত্রে যখন খোদা তা'লার পবিত্র নবীগণের অভিমতও 'ইজতিহাদী (ব্যাখ্যাগত) ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তখন ইমাম মুসলিমের অভিমত কী করে ত্রুটি মুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে?

আমি পুনরায় বলছি, এ সম্পর্কে মুসলমানদের সাধারণ ভাবে প্রচলিত ধারণাটি, 'ইজমা' নামে অভিহিত হতে পারে না– এমনকি তাদের মাঝে ওলী আল্লাহ্‌গণ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও। মুসলমানরা এই সব ভবিষ্যদ্‌বাণীকে বাহ্যিকরূপে মেনে নিয়েছেন তবে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর এমন অনেক বিস্তারিত দিক প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে যা এখনো প্রকাশিত হয় নি আর খোদা তা'লা তা করতে সক্ষম নন বলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আদৌ কোন দাবি নেই এবং থাকা উচিতও নয়।

প্রকৃতপক্ষে সকল নবী-রসূলের এ রীতিই ছিল যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ বাস্তবে কীভাবে পূর্ণ হবে, সে বিষয়টি তারা খোদা তা'লার সর্বব্যাপী জ্ঞানের ওপর ছেড়ে দিতেন। এ কারণেই এ সকল পূত-পবিত্র মানবগণ ঐশী শুভসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও দোয়া থেকে বিরত হতেন না। যেমন, বদরের যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের নেতা ও মনিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ধারণা বা চিন্তা থেকে কেঁদে কেঁদে দোয়ায় রত থাকেন যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীতে এমন বিষয়াবলি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, অথবা সেগুলো এমন শর্তসাপেক্ষ যার জ্ঞান আমাদের দেওয়া হয় নি।

এ দাবি সম্পূর্ণ অহেতুক এবং প্রমাণবিহীন যে সকল সাহাবায়ে কেরাম ও 'আহ্‌লি-বাইত' বা নবী পরিবারও আমাদের মতোই মানতেন। এক এক ব্যক্তির বিশ্বাস বা অভিমত সম্পর্কে জানলে কেবল খোদা তা'লাই জানতে পারেন। কোন মানুষ কবেই বা তাদের সকলের অভিমত ও অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করেছে, কিংবা

তাঁদের সকলের কাছে শুনে কবেইবা কেউ তাঁদের বিবৃতিসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করেছেন? সাহবাবীগণ সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশি ছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বর্ণনাকারী যথাসম্ভব দুই কি তিনজন। তদুপরি তাঁদের রিওয়ায়াতও (বর্ণিত বিষয়) সাধারণভাবে প্রমাণসিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয় না কেননা ইমাম বুখারী, যিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক, তিনি ওই সমুদয় রিওয়ায়াতকে আস্থাযোগ্য মনে করেন নি। আর ইমাম বুখারীর মতো হাদীস সংগ্রহে কঠোর সাধনাকারীর হাতে নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য ঐ যাবতীয় রিওয়ায়াত পৌঁছায় নি– এমন ধারণাও নিছক অকল্পনীয়। বরং যথার্থ ও যুক্তিসংগত ঘটনা এটাই যে, ইমাম বুখারী সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন নি। অন্যসব হাদীস আক্ষরিকভাবে 'ইমামুকুম মিনকুম' সংক্রান্ত হাদীসের পরিপন্থি আর উক্ত হাদীসটি পরম নির্ভরযোগ্য। এ কারণে তিনি এর মর্মবিরোধী অন্য হাদীসগুলোকে আস্থার অনুপযোগী মনে করে তাঁর প্রণীত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থটিতে স্থান দেন নি।

এখন দর্শক বা পাঠকরা বুঝতে পারছেন যে, হযরত মসীহ্ আবশ্যকীয়ভাবে দামেস্কে অবতীর্ণ হবেন– এ মর্মে 'খাইরুল কুরূন'-এর (তথা ইসলামের প্রারম্ভিক সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর মানুষের– অনুবাদক) 'ইজমা' বা সর্বসম্মত অভিমত কখনো সাব্যস্ত হতে পারে না কেননা শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (মুসলিম বর্ণিত) ঐ হাদীসটি গ্রহণ করেন নি। ইবনে মাজাহ্ও ওই হাদীসের বিরোধী ছিলেন। তিনি (হযরত মসীহ্র অবতরণস্থল হিসেবে) 'বাইতুল মুকাদ্দাস' বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে কেউ অন্য কিছু বলছে অন্য কেউ ভিন্ন কিছু সেক্ষেত্রে 'ইজমা' কোথায় (সাব্যস্ত হলো)!

কথার কথা 'ইজমা'ও যদি থাক তো অসুবিধা কী? কেননা এসব পুণ্যবান আবার কবে এ দাবি করলেন, এর চেয়ে উত্তম অন্য কোন অর্থ হতে পারে না? বরং তাঁরা রীতি অনুসারে বিষয়ের খুঁটিনাটি খোদা তা'লার হাতে ন্যস্ত করতেন।

তাছাড়া এ-ও আমি ভালোভাবে প্রকাশ করেছি যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীকে কেবল বাহ্যিক শব্দাবলির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখায় বড়ো বড়ো জটিলতা ও বিপত্তি রয়েছে। আকাশ থেকে হযরত মসীহ্র নেমে আসার আগেই শত শত আপত্তি দেখা দিচ্ছে এসব জটিলতার মধ্যে জড়ানোর দরকারই বা কী? মরিয়ম পুত্র মসীহ্কে আকাশ থেকে নামানো এবং তার নবুওয়্যত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা প্রস্তাব করা আর তাঁকে এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়োজনই বা কী যে অন্য ব্যক্তি ইমামতি করবে আর তিনি তার পেছনে 'মুক্তাদী' (মুসল্লি) হবেন এবং অন্য ব্যক্তি তার সম্মুখে

ইমামতী ও খিলাফত বিষয়ে মানুষের কাছ থেকে বয়আত গ্রহণ করবে আর তিনি আক্ষেপের সাথে তাকিয়ে থাকবেন এবং সাধারণ একজন মুসলমানের ন্যায় হবেন কিন্তু নবী হওয়ার কথা মুখেও আনতে পারবেন না আর শিরকের কাছাকাছি বরং সর্বৈব শিরকপূর্ণ এ বাক্য কেনই বা আমরা উচ্চারণ করব যে, 'এক চোখ বিশিষ্ট (কানা) দাজ্জাল খোদা তা'লার মতো নিজ ক্ষমতায় মৃতদের জীবিত করবে? প্রকাশ্যভাবে খোদা হওয়ার লক্ষণাবলি নিজ সত্তায় প্রদর্শন করবে আর কেউ তাকে বলবে না, 'ওহে এক চোখ বিশিষ্ট খোদা! প্রথমে তুমি তোমার চোখ ঠিক কর'?

ইসলাম আমাদের যে তৌহিদ শিখিয়েছে সেটি কি কোন সৃষ্টিতে এমন ক্ষমতা থাকা বৈধ মনে করে ইসলাম কি ওইরূপ সব বাজে বিষয়কে পদপিষ্ট করে নি? আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, মুসলমানদের দৃষ্টিতে দাজ্জালের বাহন গাধাটিও যেন ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের অংশীদার! তাঁরা আরো বলেন যে, এ গাধাটির স্রষ্টা কি-না দাজ্জালই বটে। কাজেই দাজ্জাল যখন জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং স্রষ্টাও বটে, তখন তার খোদা হওয়ার বিষয়ে কিবা ঘাটতি রইল? তারা আবার উক্ত গাধার এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেন যে, সে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

তবে আমাদের দৃষ্টিতে দাজ্জাল বলতে উন্নত জাতিগুলোকে বোঝায় এবং গাধা হলো সেই রেলগাড়ি যা পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোর মাঝে হাজার হাজার মাইলব্যাপী চলাচল করছে এবং আপনারা সবাই তা দেখতেও পাচ্ছেন।

এরপর মসীহ্‌র সম্পর্কে এটাও চিন্তা করা আবশ্যক যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার ফুট উপরদিকে যাওয়াও যখন মৃত্যুর কারণ হয় তখন হযরত মসীহ্ এই মাটির দেহ নিয়ে আকাশে কী করে পৌঁছে গেলেন? এ ধারণা বা বিশ্বাসটির কারণে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা কি উপহাস করবে না? আর (হাদীসে বর্ণিত) হযরত মসীহ্‌র প্রথম ও দ্বিতীয় অবয়ব তথা গঠনের ভিন্নতার কারণ এটি বর্ণনা করা যে বয়সের পরিবর্তনের কারণে অবয়বে পরিবর্তন ঘটে থাকবে– এটাও কি বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে হাস্যকর কথা হবে না?

আরেকটি বিষয় আমাদের উলামাদের প্রণিধানের দাবি রাখে, পবিত্র হাদীসসমূহে কেবল একজন দাজ্জালের উল্লেখ করা হয় নি, বরং বহু দাজ্জাল (হবে বলে) লেখা হয়েছে এবং لِكُلِّ دَجَّالٍ عِيسىٰ (অর্থাৎ প্রত্যেক দাজ্জালের জন্য এক ঈসা রয়েছে') দৃষ্টান্তে দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সহজেই বোধগম্য হতে পারে যে, 'ঈসা' শব্দটিতে 'ঈসার সদৃশ' অর্থই করা উচিত। আমার এ কথাটিকে অধিক সমর্থন যোগায় সেই

হাদীস যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একজন 'মসীল' বা সদৃশ বা প্রতিচ্ছবি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্‌বাণী বটে। মহানবী (সা.) তাকে অন্য ভাষায় মাহ্‌দী নামে অভিহিত করেন। কেননা এ হাদীসটিতে এমন শব্দাবলি রয়েছে যাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণীটিতে তাঁর একজন 'মসীল' বা সদৃশের সুসংবাদ দিচ্ছেন। কেননা তিনি (সা.) বলেন, সে মাহ্‌দী চারিত্রিক গুণে ও প্রাকৃতিক গঠনে আমারই মতো হবে– يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيَ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي অর্থাৎ 'আমার নাম অনুযায়ী তার নাম হবে এবং আমার পিতার নামের মতো তার পিতার নাম হবে।' এখন লক্ষ করুন, এ হাদীসটির সারকথা হলো (প্রতিশ্রুত) মাহ্‌দী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হবেন। এমতাবস্থায় বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অতি সহজে বুঝতে পারেন যে, পবিত্র হাদীসে যেমন মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর একজন সদৃশ বা প্রতিচ্ছবির উল্লেখ রয়েছে, তেমনি মসীহ্ (আ.)-এরও সদৃশের উল্লেখ রয়েছে। এটি নয় যে, একস্থানে মসীলে মোস্তফা তথা মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবির কথা উল্লেখ থাকবে আর অপর দিকে স্বয়ং ঈসা (আ.)-ই এসে যাবেন। অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

এখন এটি স্পষ্ট যে, আমি নিজের এলহামী বিশ্বাসের সমর্থনে যে পরিমাণ যৌক্তিক এবং ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় আর শরীয়তভিত্তিক দলিলপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলো আমার দাবির সত্যতার জন্য যথেষ্ট। এখানে যদি আমরা ধরেও নেই যে, আমি উদ্ভূত সব সন্দেহ-সংশয় সার্বিকভাবে নিরসন ও নিষ্পত্তি করতে পারি নি তবে এতেও আমার কোন ক্ষতি নেই কেননা ঐশীবাণী ও দিব্যদর্শন আমার সপক্ষে ও সমর্থনে রয়েছে। কাজেই এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। এলহামও দিব্যদর্শনের নাম শুনে নীরব হয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘ বিতর্ক ও বিতণ্ডা থেকে নিবৃত্ত হওয়া একজন প্রকৃত ধার্মিক আলেমের অবশ্যকর্তব্য হওয়া উচিত। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদের হাতে যদি কতক হাদীস সূত্রে কিছু দলিলপ্রমাণ থেকে থাকে তাহলে আমাদের কাছেও এমন শাস্ত্রীয় ও শরীয়ত (তথা কুরআন ও সুন্নত) ভিত্তিক দলিলপ্রমাণ রয়েছে যা তাঁদের থেকে কোন অংশে কম নয়। বরং কুরআন শরীফ রয়েছে আমাদের পক্ষে তাদের পক্ষে নয়। বুখারীর হাদীসগুলো আমাদের সমর্থনকারী তাদের নয়। তা ছাড়াও যৌক্তিক দলিলপ্রমাণ যা দর্শন ও বিজ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ, তা সবই আমাদের সপক্ষে ও সমর্থনে রয়েছে। তাদের হাতে এগুলোর একটিও নেই। এ যাবতীয় বিষয় ছাড়াও ঐশীবাণী ও স্বর্গীয় 'কাশফ' বা দিব্যদর্শন আমাদের বর্ণিত বিষয় ও বিবরণের সত্যতার সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কাছে জেদ ও হটকারিতার সপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

এখানে আমরা এ বিষয়টি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না যে, এলহাম ও দিব্যদর্শন প্রমাণ ও যুক্তি হতে পারে বলে কোন কোন শুষ্ক তার্কিক, দার্শনিক ও প্রকৃতিবাদী স্বীকার না করলেও এমন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মুহাদ্দিস ও সুফিরা রয়েছেন যারা পুরো স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তা স্বীকার করেন। এ সম্পর্কে আমাদের বন্ধু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী সাহেব তাঁর পত্রিকা 'ইশাআতুস্ সুন্নাহ' সপ্তম খণ্ডের ১২নং সংখ্যায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার অভিমতের সমর্থনে উল্লিখিত মুহাদ্দিস ও সূফিগণের মাঝে ইমাম আব্দুল ওহ্হাব শা'রানী প্রণীত গ্রন্থ 'মীযানুল কুবরা' এবং শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রচিত 'ফুতূহাতে মক্কীয়া' গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এগুলো থেকে কিছুটা আমরা দর্শক ও পাঠকদের উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করছি।

ইমাম সাহেব তাঁর নিজের প্রণীত কিতাব 'মীযান'-এর ১৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, দিব্যদর্শন বা কাশফে অভিজ্ঞরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'মুজ্তাহিদীনের' (তথা চেষ্টা ও কষ্ট করে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর) সমমর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে থাকেন বরং কখনো কখনো কতক মুজ্তাহিদীনকেও ছাড়িয়ে যান; কেননা তাঁরা সেই একই উৎস থেকে অঞ্জলি ভরে (গ্রহণ করে) থাকেন যেখান থেকে শরীয়ত উৎসারিত হয়।'

এরপর এস্থলে ইমাম সাহেব এ-ও বলেন, দিব্যদর্শকরা সেই সব জ্ঞান-বিদ্যার মুখাপেক্ষী নন, যা মুজ্তাহিদগণের ক্ষেত্রে তাঁদের ইজতেহাদ বা ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার জন্য শর্তস্বরূপ নির্ধারিত। দিব্যদর্শকগণের অভিমত ও বক্তব্য কতক উলামার দৃষ্টিতে আয়াত ও হাদীসের মতো (বা সমতুল্য)।'

অতঃপর ৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, 'কোন কোন হাদীস যদিও মুহাদ্দেসীনের দৃষ্টিতে বিতর্কিত, কিন্তু 'আহলে কাশফ' তথা দিব্যদর্শকদের সেসব হাদীসের প্রমাণিকতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। যেমন, 'আসহাবী কান্নুজূম'– হাদীসটি মুহাদ্দেসীনের দৃষ্টিতে বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। দিব্যদর্শকদের দৃষ্টিতে এটি 'সহীহ্' (তথা প্রমাণ সিদ্ধ) বটে।'

অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠায় বলেন, 'আমাদের নিকট এমন কোন দলিলপ্রমাণ নেই, যা দিব্যদর্শকদের কথাকে যৌক্তিক ক্ষেত্রে বা শাস্ত্রীয় অথবা শরীয়তগত কোন ক্ষেত্রে নাকচ করে। কেননা শরীয়ত স্বয়ং কাশফের সমর্থক।'

অতঃপর ৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন, 'বহুসংখ্যক ওলি-আল্লাহ্ (বা আওলিয়া)-এর বরাতে একথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে আত্মিক জগতে বা দিব্যদর্শনে একই বৈঠকে বসেছেন। আর তাঁদের সমসাময়িক লোকেরা তাদের দাবি স্বীকার ও সমর্থন করেছেন।'

অতঃপর ইমাম শা'রানী সাহেব সে-সকল লোকের নাম উল্লেখ করেন, যাদের একজন হলেন 'ইমাম' মুহাদ্দিস জালালউদ্দীন সুইউতী।' তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি ইমাম সুইউতির সাক্ষরসম্বলিত একটি চিঠি তাঁর অন্যতম সহচর শায়খ আব্দুল কাদের সাজলীর কাছে দেখতে পাই। সেটি কোনো ব্যক্তির নামে লেখা ছিল। সে ব্যক্তি তার কোনো বিষয়ে (ইমাম সাহেবকে) সমসাময়িক বাদশার কাছে সুপারিশের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তাই ইমাম সাহেব তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'আমি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক 'যয়ীফ' (ত্রুটিযুক্ত) বলে আখ্যায়িত হাদীসসমূহের সংশোধন ও শুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে থাকি। এ যাবৎ পঁচাত্তরবার (দিব্যদর্শনে) জাগ্রত অবস্থায় তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হয়েছি। বাদশার সমীপে যাওয়ার দরুন উক্ত 'উপস্থিতি' থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ার ভয় বা শঙ্কা যদি আমার না থাকত তাহলে আমি দুর্গে গিয়ে বাদশার কাছে তোমার জন্য সুপারিশ করতাম।'

শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) তাঁর প্রণীত 'ফতুহাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সার বিষয় হলো, ওলীরা দিব্যদর্শনে মহানবী (সা.)-এর কাছে শরীয়তসংক্রান্ত বিষয়াদি জিজ্ঞেস করে থাকেন। তাঁদের মাঝে কারও যখন কোন বিষয়ে হাদীসের প্রয়োজন হয় তখন তাঁর মহানবী (সা.)-কে দর্শনের সম্মান লাভ হয়। জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হন এবং হযরত নবী করীম (সা.) জিবরাঈলের কাছে ওলির জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত হয়ে ওলীকে জানিয়ে দেন। অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া হিসেবে জিজ্ঞাসিত বিষয়টি জিবরাঈলের অবতরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে।" অতঃপর শায়খ ইবনে আরবী বলেন, 'এভাবে আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে থেকে হাদীস সংশোধন করিয়ে নেই। **বহু সংখ্যক এমন হাদীস রয়েছে যা মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সহীহ্ নয় আর আমাদের দৃষ্টিতে সেগুলো সহীহ্, তেমনি বহুসংখ্যক হাদীস (তাঁদের দৃষ্টিতে) মওযু' বা জাল, দিব্যদর্শনের মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশনায় সেগুলো সহীহ্ সাব্যস্ত হয়ে যায়।' তাঁর কথা এখানে শেষ হলো।**

আর ফতুহাতে মক্কীয়ায় ইবনে আরাবী সাহেব এটিও বলেছেন যে, খোদার স্মরণে মগ্ন ও নির্জনে ইবাদতকারীদের ওপর সেই সর্গীয় জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয় যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী ও যুক্তিপ্রমাণ সন্ধানীদের সামনে উন্মোচিত হয় না। আর এই স্বর্গীয় জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য বিশেষভাবে নবী ও ওলীদের সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি জুনাইদ বাগদাদীর বরাতে বলেন, তিনি ৩০ বছর এ পর্যায়ে থেকে উক্ত মর্যাদা অর্জন করেছেন। আর আবু এযীদ বোস্তামির বরাতে লিখেছেন বাহ্যিকতার পূজারি

আলেমরা মৃতদের নিকট থেকে জ্ঞান শিখেছে আর আমরা জীবিতের কাছে শিখেছি যিনি হলেন খোদা তা'লা। تم كلامه অর্থাৎ তাঁর কথা এখানেই সমাপ্ত হলো।

অনুরূপভাবে মৌলবি আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়ন সাহেব রঈসুল মুহাদ্দেসীন হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর বহু সংখ্যক বাণী ও বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য উলামা ও ফুকারা তথা দরবেশ-ওলীদের সাক্ষ্যসমূহও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমরা ওই সবগুলো এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে পারি না এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই।

এলহাম ও কাশফের সম্মান ও উচ্চমর্যাদা কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়। যে-ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করলেন এবং একজন নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, যার বর্ণনা কুরআন করীমে রয়েছে– সেই ব্যক্তি কেবল একজন এলহামপ্রাপ্ত ছিলেন, নবী ছিলেন না। এলহাম ও কাশফ সম্পর্কিত বিষয়টি ইসলামধর্মে এমন দুর্বল বিষয় বলে মনে করা হয় না যার জ্যোতির্ময় শিখা ও উজ্জ্বল কিরণ শুধু মাত্র জনসাধারণের মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত হতে পারে। এটিই তো এক উজ্জ্বল সত্য এবং ইসলামের সপক্ষে সেই উন্নতমানের নিদর্শন যা কিয়ামতকালব্যাপী ইসলামের অতুলনীয় মহিমা ও মর্যাদা প্রকাশ করে আসছে। এগুলোই সেই বিশেষ আশিস যা অন্যসব ধর্মাবলম্বীদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের আলেমরা এই এলহামের বিরোধিতা করে নবী করীম (সা.)-এর হাদীসের প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত হন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যকীয়। এখন আমাদের উলামা যাঁরা হাদীসের অনুসরণ ও অনুগমনের দাবিদার তাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবে বলুন, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এলহামের ভিত্তিতে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি কে করেছেন? এমনিতে সর্বদা ধর্মের সংস্কারের কাজ চলছে কিন্তু হাদীসটির প্রতিপাদ্য হলো, ওই মুজাদ্দিদ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবেন। অর্থাৎ ঐশী জ্ঞান ও স্বর্গীয় নিদর্শনাবলি-সহকারে আসবেন।

এখন বলুন এ অধম যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে তাহলে অন্য কে আগমন করেছেন যিনি এই হিজরী চৌদ্দশতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ হওয়ার সেভাবে দাবি করেছেন যেভাবে এ অধম করেছে? কে ঐশীবাণীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় সেভাবে দণ্ডায়মান হয়েছে যেভাবে এ অধম? تفكروا وتندموا واتقوا الله ولا تغلوا (অর্থ: গভীরভাবে প্রণিধান করুন ও অনুতপ্ত হোন এবং আল্লাহ্কে ভয় করুন আর তাকওয়া অবলম্বন করুন। সীমালঙ্ঘন করবেন না– অনুবাদক)।

এ অধম যদি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার স্বীয় দাবিতে ভুল করে থাকে তাহলে আপনারা সবাই কিছু চেষ্টা-সাধনা করুন যাতে আপনাদের ধারণা অনুযায়ী যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ তিনি যেন এ সময়ে আকাশ থেকে নেমে আসেন। কেননা আমি এখন উপস্থিত আছি কিন্তু যার অপেক্ষায় আপনারা রয়েছেন তিনি উপস্থিত নেই। যদি তিনি এখন আকাশ থেকে নেমে আসেন কেবল তবেই আমার দাবি খণ্ডন করা সম্ভব, যাতে আমি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হতে পারি। আপনারা যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাহলে সবাই মিলে দোয়া করুন যাতে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-কে শীঘ্র আকাশ থেকে নামতে দেখা যায়। আপনারা সত্যবাদী হলে এই দোয়া কবুল হয়ে যাবে কেননা সত্যবাদীদের দোয়া মিথ্যুকদের মোকাবেলায় সতত কবুল হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারা নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখবেন, এই দোয়া কখনো গৃহীত হবে না কেননা আপনারা ভ্রান্তিতে রয়েছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ তো এসে গেছেন। কিন্তু আপনারা তাঁকে শনাক্ত করেন নি। এখন আপনাদের এই কল্পিত প্রত্যাশা কখনো পূর্ণ হবে না। এ যুগ পেরিয়ে যাবে এবং এদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে নামতে দেখবে না।

অথচ হিজরী তেরো শতাব্দীর অধিকাংশ উলামা হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাবের কথা নিশ্চিত বলে গেছেন। কেউ কেউ চৌদ্দ শতাব্দীর লোকদের ওসীয়্যত হিসেবে এ-ও বলে গেছেন, 'আপনারা যদি তাঁর যুগ লাভ করেন তাহলে তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলবেন। মুহাদ্দেসকুল শিরোমণি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহ.)-ও তাঁদেরই একজন।

পরিশেষে আমি এ-ও ব্যক্ত করতে চাই যে, আমার পরে অন্যকেউ যে মসীহ্র সদৃশ হয়ে আসতে পারেন– এ আমি অস্বীকার করি না। কেননা নবীগণের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি জগতে সবসময় আসতেই থাকেন। বরং খোদা তা'লা সুনিশ্চিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে আমার নিকট প্রকাশ করেছেন, 'আমারই সন্তানদের মাঝে এক ব্যক্তির জন্ম হবে যিনি বহু বিষয়ে মসীহ্র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন। তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারীদের সঠিক পথের দিশা দিবেন। তিনি বন্দিদের মুক্তি দিবেন এবং যারা সন্দেহ-সংশয়ে শৃঙ্খলিত হবে তাদের মুক্তি দান করবেন। فرزند دلبند گرامی و ارجمند مظهر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء – সম্মানিত, মহৎ প্রিয় পুত্র। সত্য ও মহান খোদার বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্ ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

কিন্তু এ অধম খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান এক বিশেষ ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মওউদের নামে এসেছে। 'واللّٰہ اعلم وعلمہ احکم' (অর্থ: আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে জ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট– অনুবাদক)।

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

(ফার্সি কবিতার অনুবাদ)

১। মসীহ্ ও তাঁর অবতরণের উল্লেখ যেখানে হয়, সেখানে মানুষ আমাকে বিশ্বাস করুক বা না করুক আমি এটাই বলব যে,

২। খোদা তা'লা আমার হৃদয়ে এলহাম করেছেন যে, আমিই সেই মনোনীত বান্দা (মসীহ্)-এর সত্যিকার অর্থে বিকাশস্থল।

৩। আমি প্রতিশ্রুত পুরুষ এবং হাদীসে বর্ণিত চেহারা বা অবয়বসহ আমি এসেছি। চোখ মেলে তারা যদি আমায় না দেখে তা হলে তাদের জন্য আক্ষেপ।

৪। আমার রয়েছে গোধূম বর্ণ এবং চুল সম্পর্কিত পার্থক্যও স্পষ্ট– যেভাবে আমার মনিব (সা.)-এর পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

৫। আমার আগমন সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই, আমার মনিব (সা.) আমাকে রক্তিম বর্ণের মসীহ্ থেকে পৃথক রঙে চিহ্নিত করেছেন।

৬। পূর্বীয় মিনারা সম্পর্কিত কথায় বিস্মিত হয়ো না, যখন কি-না আমার সূর্যের উদয় হয়েছে পূর্বদিকেই।

৭। সংবাদ অনুযায়ী আমিই এসেছি। কোথায় সে ঈসা (আ.) যিনি আমার মিম্বরে দাঁড়াবেন?

৮। খোদা তা'লা যাকে চির-আবাসস্থল জান্নাতে স্থান দিয়েছেন তাকে তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 'ফিরদৌস' থেকে কেনইবা বের করবেন?

৯। যেহেতু 'কাফির' (খ্রিষ্টানগণ) অন্যায়ভাবে মসীহ্‌র উপাসনা করে থাকে, কাজেই খোদা তা'লার আত্মাভিমান আমাকে মসীহ্‌র সদৃশ বানিয়েছেন।

১০। যাও এবং কুরআন করীমে একটিবার গভীর মনোনিবেশে দৃষ্টি দাও, যাতে তোমার সামনে আমার সম্পর্কিত গোপন রহস্য ["আ-আন্তাকুল্‌তা লিন্নাস" (সূরা মায়েদা: শেষ রুকু)] উন্মোচিত হয়।

১১। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কাশফ বিষয়ক গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক কোথায়? যাতে তার অভ্যন্তরীণ জ্যোতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে সংবাদ আনতে পারে?

১২। এই 'কিবলা' [মহানবী(সা.)] হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে তাঁর চেহারা প্রদর্শন করলেন 'হেরেম' (তথা কা'বা শরীফের চার দেয়াল ঘেরা চত্বর) থেকে প্রতিমা বহিষ্কারের তেরো শ' বছর পর।

১৩। কল্যাণরাজির সেই উৎসমূলের করুণাধারা এত উদ্বেল হয়ে উঠল যে আমার সব ওলি-গলি থেকে সেই প্রিয় বন্ধুর ডাক আসতে লাগলো।

১৪। হে আপত্তিকারী! খোদাভীতিকে সামনে রেখে একটু ধৈর্য ধরো, যাতে করে খোদা স্বয়ং আমার নক্ষত্রের জ্যোতি প্রকাশ করেন।

১৫। তুমি কি পাঠ করনি: 'যেন নেকনিয়্যত বা বিমল হৃদয়কে কাজে লাগাও'? অতএব হে ভাই! তুমি কেন তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করছ?

১৬। আমার ওপর কেন তুমি তীক্ষ্ণধার মুখের ছুরি চালাও? আমি তো নিজ থেকে আসি নি। বরং খোদা তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন।

১৭। আমি তো আদিষ্ট। এ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমার কিবা এখতিয়ার রয়েছে? যাও, এ বিষয়টি আমার প্রেরণকারী খোদার কাছে জিজ্ঞেস কর।

১৮। হে সেই ব্যক্তি, যে আমার দিকে শত শত দা-কুড়াল নিয়ে ধাবিত! এ বাগানের তত্ত্বাবধায়ককে ভয় কর, আমি যে এক ফলন্ত শাখা।

১৯। স্বর্গীয় আদেশ ধরায় পৌঁছাই। আমি যদি সে আদেশ শুনে মানুষদের না শুনাই তাহলে এটি কোথায় নিয়ে যাব?!

২০। হে আমার জাতি! আমার বক্তব্যে রুষ্ট হয়ো না। শুরুতেই এরকম উত্তেজনা দেখিও না। বরং শেষ অবধি আমার অবস্থা লক্ষ কর।

২১। আমি নিজে এ কথা (বিষয়) তুলে ধরি নি। বরং 'লওহে-মাহ্ফুজ' তথা সংরক্ষিত ঐশীফলকেই এমনটি লেখা রয়েছে। তোমার সাধ্য থাকলে ঐশী লিখন মুছে দাও।

২২। আমি আমার জাতির কারণে বিস্ময় ও ভাবনার বিপাকে আটকা পড়েছি। হে আমার করুণাময় প্রভু-প্রতিপালক! দয়াপরবশ হও, আমি যে এই চিন্তায় অস্থির।

২৩। তাদের যে চোখও নেই, কানও নেই এবং হৃদয়ের জ্যোতিও নেই। একটা জিহ্বা ছাড়া আর কিছুই নেই– যার মূল্য ঢেলাসমও নয়।

২৪। আমাকে গালমন্দ দেওয়াকে তারা ইবাদত বলে ভেবে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিতে আমি সব মিথ্যাবাদীদের চেয়ে নিকৃষ্ট!

২৫। তবু হে অন্তর! তুমি এ লোকগুলোর প্রতি যত্নবান হয়ো! কেননা অন্ততপক্ষে এরা যে আমার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা রাখার দাবি করে।

২৬। হে সেই ব্যক্তি, যে ফেরেশতার মাধ্যমে প্রদত্ত বার্তা তথা আল্লাহ্‌র আহ্বানের অস্বীকারকারী! ভুল আমার মাঝে নয়, বরং তোমার মাঝেই তা বিদ্যমান।

২৭। হে স্নেহবর! আমার প্রাণ তোমার ঈমানের জন্য দুশ্চিন্তায় ওষ্ঠাগত। অথচ কী আশ্চর্য! তোমার ধারণায় আমি একজন 'কাফির'।

২৮। যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, আমার সত্যতার প্রকৃতস্বরূপ তোমার ওপর প্রতিভাত হওয়ার বাসনা যদি থাকে তাহলে তুমি সে একই দয়াল (প্রভু) পরম সত্তার কাছে হৃদয়ের জ্যোতি প্রার্থনা কর।

২৯। কাউকে কাফির বানানোর দিকে আমার ধ্যান কখন ও কেন-ই বা হবে? আমি তো আমার প্রিয় আল্লাহ্‌র অপার ও অঢেল অনুগ্রহ ভরা সুরা পানে মাতোয়ারা হয়ে আছি।

৩০। শত্রুর আঘাত আমার ওপর কী প্রভাব ফেলার সুযোগ কোথায়? আমি তো প্রেমস্পদের সুখ-কল্পনায় উন্মত্ত হয়ে আছি।

৩১। আমি তো নিত্য সাথী খোদা তা'লার ওহীর সাহায্য-সহায়তায় সঞ্জীবিত। তাঁর এলহাম (ঐশীবাণী) আমার জন্য প্রাণবায়ুর ন্যায়।

৩২। আমি তো আমার বন্ধুর গৃহ-আঙ্গিনায় আস্তানা গেড়ে বসেছি। কাজেই তুমি আমাকে এ অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে আর কিছুই জিজ্ঞেস কোরো না।

৩৩। তাঁর প্রেম আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আর তাঁর প্রীতি ধর্মপথে আমার জন্য উজ্জ্বল সূর্যের রূপধারণ করেছে।

৩৪। আমার এবং তাঁর মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক ভালোবাসার রহস্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত তাহলে এক বৃহদসংখ্যক জনগোষ্ঠী আমার দরোজার সামনে এসে কোরবান হয়ে যেত।

৩৫। দুনিয়াদার সংসারাশক্ত আমার গোপন রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। আমি আমার জ্যোতি বাদুড়দের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছি।

৩৬। আমার পথ ছেড়ে তারা যে-পথই বেছে নিক (বা অনুসরণ করুক) সেটি অন্তঃসারশূন্য। সে-ব্যক্তি হতভাগ্য, যে তুচ্ছকে সম্মান দেয়।

৩৭। আমি তো প্রতি মুহূর্ত বন্ধুর মিলন ও সাক্ষাতের সুরাপানে সদা মাতোয়ারা এবং সর্বক্ষণ আমার অস্বীকারকারীর বিপক্ষে আমার বন্ধুর সকাশে সাহচর্য লাভে ধন্য।

৩৮। জান্নাতের বায়ুমণ্ডলী আমার উষ্ণ হৃদয় জুড়ে বয়ে চলে এবং আমার উননের ধোঁয়া শত ধরনের উত্তম সুবাস ছড়ায়।

৩৯। বন্ধুর নৈকট্যের দরুন আমার ব্যাপার এমন উঁচু মার্গে উন্নীত হয়েছে যে আমি অপরাপর সবার জ্ঞানবুদ্ধির ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে ওঠে গেছি।

৪০। বন্ধুর অনুগ্রহক্রমে জান্নাতে আমার পদার্পণ হয়েছে এবং এ বন্ধুর স্নেহ-পরশেই আমার হাতে রয়েছে (তার সাক্ষাৎ লাভের) মিলন-পেয়ালা।

৪১। তাঁর সান্নিধ্যে আমার কবুলিয়্যতের উত্তাপ-উত্তেজনা আমার প্রার্থনার সময়ে যে-পরিমাণ প্রকাশ পায় সে পরিমাণ (আমার) কান্নাকাটি আমার মা-ও শোনেন নি।

৪২। আমি চতুর্দিকে কেবল এই বন্ধুর চেহারা অবলোকন করি। এরপর আর কে আছে যে আমার চিন্তাচেতনা ও কল্পনায় আসতে পারে?

৪৩। হায় আক্ষেপ! প্রিয়জনেরা আমাকে চিনল না। এরা আমাকে তখন জানতে পারবে যখন আমি এ ধরা থেকে বিদায় হয়ে যাব।

৪৪। তাদের দুঃখ-বেদনায় আমার হৃদয় যদি রক্তাক্ত হয়ে থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার তো আকাঙ্ক্ষা এই যে, এ ধ্যান ও অধ্যবসায়ে যেন আমার মস্তকও কুরবান হয়ে যায়।

৪৫। প্রত্যেক রাত জাতির দরদ আমাকে সহস্র দুঃখ-বেদনায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে তুমি এই শোরগোল ও দৃষ্কৃতিপ্রবণ যুগের কবল থেকে মুক্তি দাও।

৪৬। হে প্রভু-প্রতিপালক! আমার চোখের পানি দিয়ে তাদের এই আলস্য-অবজ্ঞা ধুয়ে দাও। দুঃখ-বেদনা ও যাতনায় আজ আমার বিছানা পর্যন্ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছে।

৪৭। আমার দুঃখ মোচনের জন্য (হে প্রভু) শীঘ্র এস। কেননা আমি তোমার সমীপে অশ্রুপাত করেছি। তুমি আমার ফরিয়াদ শোন। কেননা তুমি ছাড়া আমার আর কেউ-ই তো অবশিষ্ট রইল না।

৪৮। দুঃখ-দুশ্চিন্তার আঁধার যে শেষই হতে চায় না! এ অন্ধকার রাত হয়ত হাশর পর্যন্ত বিলম্বিত হবে।

৪৯। অগুণগ্রাহী এই অনাদরকারী জাতির দুঃখে আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়েছে, সেই সাথে বিপথগামী আলেমদের কারণেও– যারা আমার পেছনে লেগেছে।

৫০। যদি শুষ্কজ্ঞান ও হৃদয়ের দৃষ্টিহীনতা বাধা না হত, তাহলে সকল আলেম ও ফকীহ-ই আমার সম্মুখে সেবকদের ন্যায় হয়ে যেত।

৫১। আমার এসব কথায় পাথর পর্যন্তও প্রভাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ লোকগুলো আমার সারগর্ভ প্রভাবশীল বাণীসমূহের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৫২। ইল্‌ম বা জ্ঞান বস্তুতপক্ষে সেটিই– সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতি যার নিত্য সহচর হয়ে থাকে। (তাদের) তমাশাচ্ছন্ন ইল্‌মকে তো আমি এক কড়িসম মূল্য দিই না।

৫৩। আজ আমার জাতি আমার পদমর্যাদা অনুধাবন করে না। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তারা কেঁদে কেঁদে আমার কল্যাণময় সময়কে স্মরণ করবে।

৫৪। হে আমার জাতি! ধৈর্যসহকারে অদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো যাতে আমি আমার হস্তদ্বয় খোদার দরগায় তোমার খাতিরে সবিনয়ে প্রসারিত করি।

৫৫। তোমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা যদি ধূলিতুল্যও হয়ে থাকে, তবে ভালো কথা। ধূলি কেন, আমি তো খড়-কুটার চেয়ে তুচ্ছ।

৫৬। এটি তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁরই বদান্যতা যে, তিনি আমার গুণগ্রাহী, তিনি আমায় মর্যাদা দান করেন। নচেৎ আমি তো মাত্র একটি কীট, মানব নই অথবা একটি মতিবিহীন ঝিনুকমাত্র।

৫৭। তার হাত আমার অন্তরকে অপরাপর সবার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই আমার কল্পনা ও চিন্তাভাবনায় অবশিষ্ট ছিল না।

৫৮। খোদার পরে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর। এটিই যদি কুফর হয়ে থাকে তাহলে খোদার কসম, আমি নিশ্চিত কাফির!

৫৯। আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার প্রেম অনুপ্রবেশ করেছে। আমি আমার সার্বিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত এবং এ প্রেমাস্পদের প্রেমে আমি পুরোপুরি অভিষিক্ত হয়েছি।

৬০। আমি ঐশী পবিত্রতার দরগায় সত্যতার জ্বলন্ত প্রদীপ বিশেষ। তাঁরই হাত আমাকে প্রত্যেক তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাত থেকে রক্ষা করবে।

৬১। আকাশ সর্বক্ষণ আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। কাজেই মর্তবাসীর না মানার দরুন আমার আবার কীসের দুঃখ?!

৬২। খোদার কসম! আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নূহের নৌকা-তুল্য। যে ব্যক্তি আমার নোঙর থেকে দূরে থাকে সে নিঃসন্দেহে হতভাগ্য।

৬৩। যে-আগুন আখেরী যুগের আঁচল পুড়িয়ে দিয়েছে, খোদার কসম! আমি সেটির প্রতিকার ও চিকিৎসার জন্য 'কওসার-নহর (নদ)' স্বরূপ।

৬৪। আমি রসূল নই, (নতুন বিধান বাহী) কোন কিতাবও আনয়ন করি নি। তবে অবশ্য আমি 'মুল্হাম' (ঐশীবাণী প্রাপ্ত) এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত সতর্ককারী।

৬৫। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের দিকে প্রীতি ও স্নেহভরে দৃষ্টিপাত কর, তোমার রহমত ও করুণার হাত ছাড়া আর কেবা আমার সাহায্যকারী?!

৬৬। আমার প্রাণ মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর ধর্মের পথে উৎসর্গীকৃত। এটাই আমার অন্তরের লক্ষ ও বাসনা। হায়! এ দ্বারা আমি যেন অভিষিক্ত হই।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে এ অধমকে যারা গ্রহণ করলেন আর যারা তাকে অস্বীকার করলেন এতদুভয়ের মাঝে নিরাপত্তা ও সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী কে বা কারা?

স্মরণ রাখা উচিত এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ও দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল, এ অধমের প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়া যারা মেনে নিয়েছেন তারা সর্বপ্রকার শঙ্কামুক্ত ও নিষ্পাপ। তারা বহুবিধ পুণ্য ও পুরস্কার এবং ঈমানী শক্তি অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রথমত তাঁরা নিজ ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করলেন। তাকে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারী বা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলেন না এবং তার সম্পর্কে অযথা সন্দেহ অন্তরে স্থান দিলেন না। এই কারণে তাঁরা সেই পুণ্য ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হলেন যা আপন ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করলে লাভ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত সমাগত সত্য গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হলেন না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এবং একজন ঐশী আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনে ঐশীবার্তা গ্রহণ ও বরণ করে নিলেন আর কোনো বাধা আসার দরুন থেমে রইলেন না বা পিছপা হলেন না। এই কারণে তারা পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়ে গেলো।

তৃতীয়ত ভবিষ্যদ্‌বাণী যার সত্তায় পূর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা ঐসব সন্দেহ-সংশয় থেকে পরিত্রাণ পেলেন যেগুলো অপেক্ষা করতে করতে সৃষ্টি হয়, আর অবশেষে নৈরাশ্যের অবস্থা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

এই সৌভাগ্যশালী লোকেরা কেবল উল্লিখিত শঙ্কাসমূহ থেকেই নিষ্কৃতি পান নি, বরং খোদা তা'লার একটি নিদর্শন এবং তাঁর নবীর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী তাদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখে ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক উন্নতি লাভ করলেন। আর তাদের শ্রুতিসর্বস্ব ঈমান এক তত্ত্বজ্ঞানের রং ধারণ করল। এখন এমন সব ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হতে থাকা সেসব সংশয়ের কবল থেকে তাঁরা মুক্ত হলেন যা সেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে আর যা পূর্ণ হতে দেখা যায় না।

চতুর্থত খোদা তা'লার প্রেরিত বান্দার ওপর ঈমান এনে তারা তাঁর সেই অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছেন যা সেসব অবাধ্য ও ঐশী-আদেশ অমান্যকারীদের

ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে, যাদের ভাগ্যে অস্বীকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া অন্য কিছুই জোটে না।

পঞ্চমত তাঁরা ঐসব কল্যাণ ও আকীসের উত্তরাধিকারী বলে সাব্যস্ত হলেন যা সেসব নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত বান্দাকে সরল অন্তরে সুধারণায় গ্রহণ করেন।

এ হলো সেই সব কল্যাণ যদ্দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ তাঁরই অনুগ্রহে এসব সৌভাগ্যবান লোকদের ভূষিত করা হবে যারা এ অধমকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু যারা গ্রহণ করে না তারা এই যাবতীয় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

(আমাকে) গ্রহণ করার অবস্থায় তাদের কোন ধর্মীয় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে– তাদের এমন সন্দেহ করাটাও ভিত্তিহীন। আমি বুঝতে পারি না যে, ধর্মীয় ক্ষতি কী কারণে ঘটতে পারে। ধর্মীয় ক্ষতি তখন হতে পারে যদি এ অধম ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি কোনো শিক্ষা অনুসারে চলার তাঁদের নির্দেশ দিত। যেমন কোনো হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলে আমি শিক্ষা দিতাম (সেক্ষেত্রে)। অথবা 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভের জন্য আবশ্যকীয় ঈমান সম্পর্কিত তাদের আকিদা বা বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য ঘটাতাম, অথবা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি শরীয়ত নির্ধারিত কাজে ও বিধিবিধানে আমি বিন্দুমাত্র সংযোজন বা বিয়োজন করতাম। যেমন পাঁচ বেলার নামাযের জায়গায় দশ বেলার নামায প্রবর্তন করতাম, অথবা দুই বেলা নামায নির্ধারণ করতাম। অথবা এক মাসের পরিবর্তে দুই মাসের রোযা বাধ্যতামূলক করতাম কিংবা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রস্তাব করতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে ধর্মে সর্বৈব ক্ষতি বরং কুফুরি ও প্রকাশ্য ত্রুটি ঘটত। কিন্তু এ অধম যেখানে বার বার এটাই বলে যে, 'হে ভ্রাতাগণ! আমি নতুন কোনো ধর্ম বা নতুন কোনো শিক্ষা নিয়ে আসি নি। বরং আমি তোমাদেরই একজন এবং তোমাদেরই মতো একজন মুসলমান। আমার মুসলমানদের আমল ও অনুসরণ করার এবং অন্যদেরও নিজেদের আমল করার জন্য এবং অন্যদের পথ দেখানোর জন্য মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। আর হযরত খাতামুল মুরসালীন আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ প্রদর্শক ও অনুসরণীয় নেতা নেই যার আমরা অনুসরণ করব বা অন্যদের অনুসরণ করাব। তাই একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্য ওহী-এলহাম তথা ঐশীবাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত আমার এই দাবির প্রতি ঈমান আনয়নে আশঙ্কার কী কারণ থাকতে পারে?

কথার কথা যদি ধরাও হয় যে আমার কাশফ ও এলহাম ভ্রান্ত আর আমি যে নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছি তা বুঝতে আমি ভুল করেছি তাহলেও গ্রহণকারীর এতে কিবা ক্ষতি? সে কি এমন কিছু গ্রহণ করছে যার দরুন তার ধর্মে কোন ব্যাঘাত বা বিচ্যুতি সৃষ্টি হতে পারে?

আমাদের জীবদ্দশায় যদি সত্যি সত্যিই হযরত মসীহ্ ইবন মরিয়ম আকাশ থেকে নেমে আসেন তাহলে তা আমাদের জন্য পরম আনন্দের কারণ হবে আর তার আগমন আমাদের চোখকে আলোকিত করবে, আমি এবং আমাদের জামা'ত সানন্দে সবার আগে তাঁকে গ্রহণ ও বরণ করে নেব। এ কারণে আমাদের জামা'ত প্রথম বিষয়ের জন্যও সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে যেদিকে তারা একান্ত খাঁটি নিয়্যতে সর্বান্তঃকরণে খোদাভীতিসহ অগ্রসর হয়েছে। আর (কথার কথা) এতে ভুল হয়ে থাকলেও আমাদের পুণ্যের মাত্রা বর্ধিত থাকবে, আমরা দু'টি পুণ্য পাব, আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কেবল একটির ভাগী হবেন। কিন্তু আমরা যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণকারী হয়ে থাকি এবং আমাদের বিরোধীরা ভবিষ্যতের আশায় বুক বাধার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে থাকেন তাহলে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ঈমান চরম হুমকি কবলিত, কেননা তারা যদি তাদের জীবদ্দশায় সত্যি-সত্যি হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে 'মহা প্রতাপ ও জাঁকজমক সহকারে' আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখতে পান এবং প্রকাশ্যে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন যে, তিনি ফেরেশতাদের কাঁধে ভর করে নেমে আসছেন তাহলে তো তাদের ঈমান অক্ষত বা নিরাপদ থাকল। অন্যথায় ঈমান নিরাপদ ও অক্ষুণ্ন থাকার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না কেননা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা যদি আকাশ থেকে হযরত মসীহ্কে নামতে দেখতে না পান, বরং আকাশের দিকে যাওয়ার জন্য তাদের নিজেদেরই প্রস্তুতি সাব্যস্ত হয়ে দাঁড়ায় (অর্থাৎ তারা নিজেরাই মৃত্যুমুখে পতিত হন– অনুবাদক), তাহলে তারা যে তখন কত সন্দেহ-সংশয় সঙ্গে বয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কত দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হবে তা স্পষ্ট; আর এর কারণে ঈমান নষ্ট হতে পারে কেননা বর্তমান কালটি ইঞ্জিল ও পবিত্র হাদীসের ইঙ্গিত অনুযায়ী সেই সময়কাল, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্র আবির্ভাব হওয়া উচিত। এ কারণেই অতীত পুণ্যবানদের মাঝে বহুসংখ্যক দিব্যদর্শক মসীহ্র আবির্ভাব হিজরি চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বছরগুলোতেই হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (কুদ্দিসা সির্রুহু)-এর অভিমত এটাই এবং মরহুম মৌলবী

সিদ্দীক হাসান খানও তাঁর রচিত এক (সুখ্যাত) পুস্তকে এমনটিই লিখেছেন। আর الآيات بعد المائتين। (অর্থাৎ 'হিজরি বারোশ' বছর পরেই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবসংক্রান্ত কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হবে'– অনুবাদক) হাদীসটির অর্থের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুহাদ্দিস এমন মত প্রকাশ করেছেন।

যদি বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ দামেস্কের মিনারের পাশে অবতরণ মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস, তাহলে এর উত্তর আমি বিশদভাবে এ পুস্তকেই লিখে এসেছি যে, এ বিষয়ে আদৌ ইজমা নেই। এর উল্লেখ পবিত্র কুরআনের কোথায় আছে? সেখানে কেবল তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইয়াহ্ইয়ার আত্মার সাথে হযরত ঈসার আত্মা দ্বিতীয় আকাশে একত্রে রয়েছে বলে সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। আর দামেস্কে তাঁর অবতরণের কথাটি উপেক্ষা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহ্ (দামেস্কের পরিবর্তে) বাইতুল মুকাদ্দাসে (তথা জেরোশালিমে) হযরত মসীহ্ অবতীর্ণ হবেন বলে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদের মাঝে কেউ এ দাবি করেন নি যে, (হাদীসসমূহে বর্ণিত) সকল নাম ও শব্দ বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বরং তাঁরা সবাই কেবল ভবিষ্যদ্‌বাণীটিতে সামগ্রিকভাবে বিশ্বাসস্থাপন করেছেন। অতএব এরপর 'ইজমা' আবার কোন বিষয়ে?! তবে হিজরী তেরো শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন একটি সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস হিসেবে প্রতীয়মান বটে।

অতএব এই অধম যদি প্রতিশ্রুত মসীহ্ না হয়ে থাকে তাহলে আপনারা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে আকাশ থেকে নামিয়ে দেখান। আপনারা পুণ্যবানদের বংশধর, কাজেই মসজিদে বসে ক্রন্দন ও আহাজারি করুন যেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে ফিরিশতাদের কাঁধে ভর করে নেমে আসেন; যাতে আপনারা সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারেন। নচেৎ কেন অযথা কুধারণা পোষণ করেন এবং " لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " [অর্থাৎ 'যা তোমার জানা নাই সে বিষয়ের পেছনে ছুটবে না' *(সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৭)* অনুবাদক]– আয়াতটিতে উল্লিখিত অভিযোগের অধীনে কেন আসছেন? খোদা তা'লাকে ভয় করুন।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব কয়েক দিন হলো, এ অধম " الآيات بعد المائتين "-এমর্মে মনোনিবেশ করল যে, হাদীসটিতে কি এ ঐশী অভিপ্রায়টিও নিহিত রয়েছে যে হিজরী তেরো শতাব্দীর শেষ প্রান্তে প্রতিশ্রুত মসীহ্ আবির্ভূত হবেন? আর এ অধমও কি হাদীসটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের অন্তর্গত? তখন দিব্যদর্শনে নিম্নবর্ণিত নামটিতে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহের সাংখ্যমান নির্ণয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো,

দেখ, ইনিই সেই মসীহ্– তেরো শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার পরে যার আবির্ভাব হওয়া নির্ধারিত ছিল। পূর্ব থেকে এ তারিখটিই আমরা নামে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। সে-নামটি হচ্ছে 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানী'। এ নামের সাংখ্যমান পুরোপুরি ১৩০০ (তেরোশ)। কাদিয়ান শহরটিতে এ অধম ছাড়া 'গোলাম আহমদ' নামের অন্য কোনো ব্যক্তি নেই। বরং আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক করা হলো যে, এই সময় এ অধম ছাড়া পৃথিবী জুড়ে 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' নামটি অন্য কারও নেই। ['গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' নামটি আরবী বর্ণমালার সাংখ্যমান দিক থেকে নিম্নরূপ: গাইন-১০০০, লাম-৩০, আলিফ-৯, মিম-৪০, আলিফ-১, হা-৮, মিম-৪০, দাল-৪, কাফ-১০০, আলিফ-১, দাল-৪, ইয়া-১০, আলিফ-১, নুন-৫০, ইয়া-১০ = সর্বমোট ১৩০০।– অনুবাদক]।

এ অধমের সাথে আল্লাহ্ তা'লার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রীতি হলো, তিনি কোন কোন গোপন রহস্য আরবী বর্ণমালার সাংখ্যমানের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। একবার আমি আদম (আ.)-এর জন্মতারিখ জানার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আমাকে ইঙ্গিতে জানানো হয় যে, সূরা আল-আস্‌র-এর অক্ষরসমূহের গাণিতিক মানে দৃষ্টি দাও, এগুলো থেকে উক্ত তারিখ নির্ণীত হয়।

একবার আমি আমার বাসভবন-সংলগ্ন মসজিদটির নির্মাণ তারিখ এলহামের মাধ্যমে জানতে চাইলে আমার প্রতি এ এলহাম অবতীর্ণ হয়:
مبارك ومبارك وكل امر مبارك يجعل فيه [অর্থাৎ 'এটি এক কল্যাণময় ও কল্যাণকারী মসজিদ এবং কল্যাণজনক সববিষয় এতে নিহিত রাখা হবে'– অনুবাদক]। এটি সেই মসজিদ যার সম্পর্কে আমি এ পুস্তকটিতে লিখে এসেছি যে, আমার বাসভবন এ শহরের পূর্বদিকে জনবসতির শেষ প্রান্তে এ মসজিদেরই সন্নিকট এবং এর পূর্বদিকে মিনারার নীচে (বা পাদদেশে) অবস্থিত– যেমনটি আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী থেকে স্পষ্টই প্রতিভাত, 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'।

কয়েকদিন আগের কথা মাত্র! এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে খোদা তা'লা আরবী বর্ণমালার সাংখ্যমানের মাধ্যমে আমাকে এক সংবাদ জানালেন। এসংক্রান্ত মূল বাক্য হলো, كلب يموت على كلب অর্থাৎ সে এক কুকুরতুল্য ব্যক্তি। কুকুর (তথা 'কাল্‌ব' শব্দে)-র বর্ণগুলোর গাণিতিক মান যা দাঁড়ায় সে মেয়াদে সে মারা যাবে বায়ান্ন (৫২) বছর বুঝায়। অর্থাৎ তার বয়স বায়ান্ন বছর অতিক্রম করবে না। যখন সে বায়ান্ন বছরে পদার্পণ করবে তখন সে ওই বছরটিতেই পরলোকের পথে পাড়ি জমাবে।

এখন পুনরায় আমি পূর্ববর্ণিত বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের জামা'ত একটি সৌভাগ্যশালীদের জামা'ত, যারা যথাসময়ে আবির্ভূত সেই প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে গ্রহণ করেছে, বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্ যাকে পাঠিয়েছেন। তাদের অন্তর তাকে বরণ করে নিতে একটুও সংকোচ করে নি। কেননা তারা ছিলেন ওই সকল সৌভাগ্যশালী, যাদের খোদা তা'লা নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। ঐশী অনুগ্রহ তাদের শক্তি যুগিয়েছে। অন্যদের এই ভাগ্য দান করেন নি। তাদের মন খুলে দেন অন্যদের খুলেন নি। যারা তাকে গ্রহণ করেছে তাদের আরো দান করা হবে। তাদের সমৃদ্ধি দেওয়া হবে। কিন্তু যারা গ্রহণ করে নি তাদের কাছে যা পূর্বে ছিল তাও কেড়ে নেয়া হবে। বহু পুণ্য পথের পথিক সে যুগ দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পরিতাপ এরা দেখছে কিন্তু গ্রহণ করে নি। এদের অবস্থার আমি কোন জাতির অবস্থার সাথে তুলনা করব? এদের ক্ষেত্রে এই উপমাটি সঠিক মনে হয় যে, এক বাদশাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে কে অনুগত আর কে অবাধ্য তা পরখ করা এবং তাদের মাঝে বিরাজমান ঝগড়া বিবাদেরও বিচার নিষ্পত্তির জন্য এক শহরে নিজ পক্ষ থেকে একজন হাকিম বা কর্মকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। অতএব সেই হাকিম ঠিক সে সময় আসলেন যখন তাঁর আসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর সম্মানিত প্রভুর বাণী পৌঁছে দিলেন। সবাইকে সত্য সঠিক পথের দিকে আহ্বান করলেন এবং প্রতিশ্রুত 'হাকাম' (তথা ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী) হওয়ার কথা তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর সরকার নিযুক্ত কর্মচারী হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান হল। তখন তিনি এমন চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহ দেখালেন যা কেবল নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্যই নির্ধারিত থাকে। কিন্তু তারা মানল না। তাকে গ্রহণ করল না বরং তাকে ঘৃণার চোখে দেখল এবং নিজেদের বড়ো কিছু মনে করল। তাঁর 'হাকাম' হিসেবে নিযুক্তি মেনে নিল না। বরং তাঁকে ধরে অপমানিত ও অপদস্থ করল। তার মুখে থু থু দিল। তাকে মারার জন্য ছুটে আসলো। তাকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছিত করল এবং বহুল কটু কথা বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। তখন তিনি তাদের হাতে তার নিয়তিতে নির্ধারিত নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট সবই ভোগ করে আপন বাদশাহর কাছে ফিরে গেলেন। যারা তার এরূপ দুর্গতি ঘটাতে তৎপর হলো তারা অন্য কোন এক হাকিমের আসার অপেক্ষায় বসে থাকল এবং অজ্ঞতাবশত এরূপ মিথ্যে ধারণায় বদ্ধমূল রইল যে, এ-তো প্রকৃত কর্মকর্তা নয় বরং তিনি অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি আসবেন, যার অপেক্ষা আমাদের করা উচিত। এই বলে তারা সারাদিন ওই ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকল, আর বার বার উঠে তাকিয়ে দেখল, কখন সে আসবে। তারা বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েও আলোচনা করতে থাকল। এমনকি অবশেষে অপেক্ষায়

অপেক্ষায় সূর্যও অস্তাচল হলো। তবু কেউ আসল না। পরিশেষে সন্ধ্যালগ্নে পুলিশের বহুসংখ্যক সিপাহি আসল যাদের হাতে বহু সংখ্যক হাত-কড়া ছিল। তারা আসা মাত্র ওই দুষ্টদের শহর পুড়িয়ে দিল। তারপর এক একজন করে ধরে সবাইকে হাত-কড়া পরিয়ে দিল এবং আদেশ লঙ্ঘন ও সরকারি কর্মকর্তার বিরোধিতা করার অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় শাহী আদালতের দিকে তাদের চালান করল। সেখানে থেকে তাদের সে-সব দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো, যা তাদের প্রাপ্য ছিল।

অতএব, আমি সত্যি সত্যি বলছি, অনুরূপ অবস্থা হবে এই যুগের অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত অস্বীকারকারীদের। প্রত্যেক ব্যক্তি তার মুখ, কলম ও হাতের অন্যায় ও অপরাধের জন্য ধরা পড়বে। শোনার মত যাদের কান আছে তারা শুনে নিক।

ভারতবর্ষের আলেমদের সমীপে সবিনয় নিবেদন

হে স্বধর্মীয় ভ্রাতারা ও সুদৃঢ় শরীয়তের আলেম-উলামা! আপনারা আমার এই বক্তব্যসমূহ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। এ অধম প্রতিশ্রুত 'মসীল' তথা (মসীহ্‌র) সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবি করেছে কিন্তু স্বল্প জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা একে সত্যি সত্যি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম হওয়ার দাবি বলে মনে করে বসেছেন! এটি নতুন কোন দাবি নয় যা তারা আজ প্রথমবার আমার কাছে শুনতে পাচ্ছেন। বরং এটি সেই সব পুরোনো এলহাম, যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ করার পর আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় বিশদ ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করেছিলাম, যা সাত বছরেরও অধিক কাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 'আমি স্বয়ং মসীহ্ ইবনে মরিয়ম'-এ মর্মে কোনো দাবি আমি কখনো করি নি। এই অপবাদ কেউ যদি আমার প্রতি আরোপ করে তবে সে নির্ঘাত মিথ্যারোপকারী ও ডাহা মিথ্যাবাদী। বরং আমার পক্ষ থেকে সাত–আট বছরব্যাপী বরাবর এ কথাই প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে যে, আমি মসীহ্ ইবন মরিয়মের 'মসীল' বা তাঁর সদৃশ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর কতিপয় স্বভাব-চরিত্র, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য খোদা তা'লা আমার প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। তাছাড়া অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের ঘনিষ্ঠতম মিল রয়েছে যা আমি সেসব পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আমি যে এ পুস্তকগুলোতে নিজেকে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি আখ্যায়িত করেছি যার আগমন সম্পর্কে কুরআন শরীফে সংক্ষেপে এবং পবিত্র হাদীসসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আমার পক্ষ থেকে নতুন কোন সংযোজন নয়। কেননা আমিই তো পূর্বেও বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে বিশদভাবে লিখে এসেছি যে, আমি সেই প্রতিশ্রুত 'মসীল' রূপকভাবে যার আগমনের সংবাদ কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীসে পূর্ব থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মৌলবী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী সাহেব তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা 'ইশায়াতুস্ সুন্নাহ'-এর ৭ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় যেখানে 'বারাহীনে-আহমদীয়া' পুস্তকের সমর্থনে 'রিভিউ' লিখেছেন, সেখানে তিনি অকপটে উক্ত সমুদয় এলহামের ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে না হলেও সম্ভাব্যতার পর্যায়ে অকপটে সত্যায়ন করেছেন এবং মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুনা যায় যে, অন্যান্য লোকের শোরগোল দেখে স্বনামধন্য মৌলবী সাহেবের মনেও কিছু

অস্বীকার সূচক অত্যুৎসাহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা বস্তুত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়। উল্লিখিত বিষয় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এলহামগুলো 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ৪৪৭, ৪৯৮, ৫০৫, ৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫১৪, ৫৫৬, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, উদ্ধৃতিগুলো নিম্নরূপ:

يأأحمد بركة الله فيك مارميت إذ رميت ولكن الله رمٰى الرحمٰن علم القرآن لتنذر قوما ماأنذر آباؤهم و لتستبين سبيل المجرمين قل أنى أمرت وأنا أول المؤمنين ياعيسى إنى متوفيك و رافعك إلى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيٰمة هو الذى أرسل رسوله بالهدىٰ و دين الحق ليظهره على الدين كلّه لا مبدل لكلمات الله أنا أنزلناه قريبا من القاديان و بالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله ورسوله وكان أمر الله مفعولا وقالوا إن هو إلا إفكٌ افترىٰ وما سمعنا بهذا فى أبائنا الاولين قل هو الله عجيب يجتبىٰ من يشاء من عباده. - لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون سنلقى فى قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله. فلا تكفروا إن كنتم مؤمنين والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون ويخوفونك من دونه أئمة الكفر تبت يدا أبى لهب وتب ما كان له أن يدخل فيها الا خائفا وما أصابك فمن الله الفتنة هٰهنا فاصبر كما صبر أولو العزم ألا إنها فتنة من الله. ليحب حبا جما حبا من الله العزيز الاكرم فى الله أجرك ويرضىٰ عنك ربك ويتم اسمك وأن لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده وما كان الله ليترك حتى يميز الخبيث من الطيب وعسىٰ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربّ اغفر وارحم من السماء رب إنى مغلوب فانتصر إيلى إيلى لما سبقتنى. - ربّ أرنى كيف تحى الموتى ربّ لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بشرىٰ لك يا أحمدى أنت مرادى و معى غرستُ كرامتك بيدى أنت وجيه فى حضرتى اخترتك لنفسى شأنك عجيب وأجرك قريب الارض والسماء معك كما هو معى جرى الله فى حلل الانبياء لا تخف أنك أنت الاعلىٰ ينصرك الله فى مواطن أن يومى لفصل عظيم كتب الله لا غلبن أنا ورسلى ألا إن حزب الله هم الغالبون

অর্থাৎ "হে আহমদ! খোদা তা'লা তোমাতে বরকত ও আশিস ভরে দিয়েছেন। যা কিছু তুমি নিক্ষেপ করেছ তা তুমি করো নি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। তিনিই সেই রহমান খোদা (অশেষ করুণাময় ও অযাচিত দানকারী) যিনি তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন, যাতে তুমি ঐ লোকদের সতর্ক কর যাদের বাপ-দাদাদের সতর্ক করা হয় নি আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ যাতে দৃশ্যমান হয়, কে বা কারা তোমার সঙ্গ পক্ষ অবলম্বন করে আর কে বা কারা পুরোপুরি না বুঝে বিরোধিতায় দাঁড়ায়। সবাইকে বলে দাও, 'আমি খোদার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সেই প্রথম ব্যক্তি, যে এই আদেশের প্রতি ঈমান এনেছে।' হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো এবং আমার দিকে উন্নীত করব। আর যারা তোমার অনুসারী তাদের আমি অন্যদের ওপর কিয়ামতকাল অবধি প্রাধান্য দান করবো। খোদা সেই সর্বশক্তিমান যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত (পথ নির্দেশনা) এবং দ্বিনের সার-বত্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি তাকে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের আলোকে সার্বিকভাবে সকল দ্বিনের ওপর প্রাধান্য দান করেন।" (এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ব থেকে কুরআন করীমে বর্তমান যুগের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে)। এরপর এলহামসমূহের অনুবাদ হলো: "তাঁর পবিত্র কালামে পূর্ব থেকে প্রদত্ত খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহকে কেউ বদলাতে পারে না অর্থাৎ এসব ভবিষ্যদ্বাণী অটল, অবশ্যম্ভাবী। (এরপর আল্লাহ্ বলেন,) আমরা এ প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে আপন নিদর্শন ও বিস্ময়কর বিষয়াবলি সহকারে কাদিয়ানের সন্নিকটে অবতীর্ণ করেছি। সত্যসহকারে সে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সত্যসহকারে তাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ও তার রসূলের যে-সব প্রতিশ্রুতি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ছিল তা সবই আজ সত্য হয়েছে। খোদা তা'লার ওয়াদা ও আদেশ একদিন পূর্ণ হওয়ারই ছিল। তারা বলবে, 'এটা সম্পূর্ণ তার নিজের মনগড়া মিথ্যা। আমরা আমাদের বুযুর্গ পূর্ব-পুরুষদের কাছে তা শুনি নি।' তাদের বল, খোদা তা'লার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আশ্চর্যজনক। তোমরা তাঁর গোপন রহস্যাবলির নাগাল পেতে (বা আয়ত্ত করতে) অক্ষম। তাঁর বান্দাদের মাঝে তিনি যাকে চান, তাকে বেছে নেন। তাঁর সন্নিধানে, তাঁর দরগায় তাঁর (উপযুক্ত) বান্দাদের কোনো কমতি নেই। আর তাঁর কার্যাবলি সম্পর্কে কেউ তাঁকে জবাবদিহি করতে পারে না যে, এমনটি তিনি কেন করলেন এবং এমনটি কেন করলেন না। তিনি তাঁর বান্দাদের কথা ও কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করাতে সক্ষম। অচিরেই আমরা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। তাদের বলে দাও, এই 'নূর' (জ্যোতি) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে। তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে একে অস্বীকার কোরো না। যারা ঈমান এনেছে এবং

নিজেদের ঈমানে কোনো যুলুম ও অন্যায়কে স্থান বা প্রশ্রয় দেয় নি তারা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর অস্বীকারকারীদের নেতা ও হোতারা তোমাকে ভয় দেখাবে। আবু লাহবের উভয় হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। এ ব্যাপারটিতে ধৃষ্টতা দেখিয়ে তার এতে প্রবেশ করা উচিত হয় নি, বরং ভয় করা উচিত ছিল। মানুষের কথা-বার্তার দরুন তুমি যে পরিমাণই মর্মাহত ও যাতনাগ্রস্ত হবে তা বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্-নির্ধারিত। [এ স্থলে 'আবু লাহাব' দ্বারা ওই সব লোকদের বুঝায় যারা পুরোপুরি না বুঝেই বিরোধিতামূলক লেখায় (বা অন্যান্য উপায়ে) তৎপর হয় এবং لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ অর্থ: 'যে বিষয় তোমার প্রকৃতভাবে জানা নেই সে বিষয়ে তুমি কোনো অবস্থান গ্রহণ করবে না' (সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৭)– অনুবাদক। আয়াত সম্বলিত ঐশী নিষেধকে যারা ভয় করে না এবং বিতর্কিত রূপক বিষয়াদির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয় না]। এরপর আল্লাহ্ বলেন, মানুষ যখন বিরোধিতায় উদ্যত ও লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন সেটি এক পরীক্ষাস্থল স্বরূপ হবে। কাজেই তখন তুমি ধৈর্য ধর, যেমন দৃঢ়সংকল্পশালী রসূলগণ ধৈর্যধারণ করে এসেছেন। স্মরণ রাখবে, এটি হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত পরীক্ষা যাতে করে তিনি তোমাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় ভালোবাসেন। এটি সেই ভালোবাসা যা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বাধিক সম্মানিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তোমার প্রতিদান ও পুরস্কার খোদা তা'লা দেবেন। তোমার প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার নামকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন যদিও মানুষ এতে কুণ্ঠাবোধ করুক না কেন। পবিত্র ও অপবিত্র, ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না দেখিয়ে খোদা তোমায় কখনো (একা) ছেড়ে দেবেন না। এমনও হতে পারে যে, তোমাদের ওপর আপতিত কোনো বিষয়কে তোমরা অপছন্দ করবে এবং সেটি তোমাদের দৃষ্টিতে ভালো লাগবে না, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণজনক। গোপন রহস্যাবলির প্রকৃতস্বরূপ খোদা তা'লা জানেন। তোমরা জানো না। হে আমার প্রভু! আমার গোনাহ্ (দোষত্রুটি) ক্ষমা কর এবং আমার ওপর আকাশ থেকে করুণা বর্ষণ কর। আর আমার জন্য দণ্ডায়মান হও, আমি যে পরাভূত। হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমায় কেন ছেড়ে দিলে? [এটি সেই সাদৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত, যা হযরত মসীহ্র সাথে এ অধমের রয়েছে। কেননা 'এলি এলি!'– (হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! –অনুবাদক) সংশ্লিষ্ট দোয়াটি প্রকৃতপক্ষেই হযরত মসীহ্র অতি সংকটাপন্ন সময়ের দোয়া ছিল]। এর অব্যাহতি পরে খোদা তা'লা আমার প্রতি এলহামযোগে এ দোয়াটি অভিব্যক্ত করলেন: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে দেখাও,

তুমি কীভাবে মৃতদের জীবিত করে থাক। (এটিও মসীহ্‌র সাথে সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বটে)। এরপর আবারও এ অধমের পক্ষ থেকে করণীয় দোয়া এলহামযোগে প্রকাশিত করলেন: (হে আমার প্রভু!) তুমি আমায় একা ছেড়ে দিও না। তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার এবং আমার জাতির মাঝে সত্যিকার ফয়সালা কর। তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। হে আমার আহমদ! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি যে আমার অভিষ্ট এবং তুমি আমার সঙ্গেই আছো। আমি তোমার কিরামতরূপী বৃক্ষকে স্বহস্তে রোপণ ও সুদৃঢ় করেছি। তুমি আমার দরবারে সম্মানিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছি। তোমার মর্যাদা বিস্ময়কর এবং তোমার পুরস্কার সন্নিকট। পৃথিবী ও আকাশ তোমার সঙ্গে সেভাবেই আছে যেভাবে এগুলো আমার সঙ্গে রয়েছে। নবীদের ভূষণে তুমি খোদার পাহলোয়ান। ভয় কোরো না, বিজয় তোমারই। খোদা বহু (প্রতিদ্বন্দ্বিতার) ময়দানে তোমাকে সাহায্য করবেন। আমার দিন মহা ফয়সালার দিন। আমি লিখে রেখেছি, সর্বদা আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হবো। স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হয়ে থাকে।

এ হলো সেই সব এলহাম যা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের উপরোল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি যা স্পষ্টভাবেও ইঙ্গিতে এ অধমের (মসীহ্‌র) প্রতিশ্রুত 'মসীল' বা সদৃশ্য হিসেবে প্রেরিত হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। তবে যাঁরা আক্ষরিকভাবে হযরত মসীহ্ ইবন মরিয়মের বেহেশত থেকে বেরিয়ে ফেরেশতাদের কাঁধে হাত রেখে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবে বলে অপেক্ষমান; এ কথার মূলতত্ত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ কী এ বিষয়ে এলহাম যোগে কোনো সিদ্ধান্ত 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং আমি উক্ত গ্রন্থে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের দুনিয়ায় পুনরায় আগমন প্রসঙ্গে যা কিছু লিখেছি তা কেবল একটি প্রসিদ্ধ লোকবিশ্বাস অনুযায়ীই লিখা হয়েছে, যে-দিকে আজকাল আমাদের মুসলমান ভাইদের দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ। অতএব গতানুগতিক এ বিশ্বাস অনুসারেই আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে, আমি কেবল প্রতিশ্রুত ব্যক্তির 'মসীল' বা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি এবং আমার খিলাফত কেবল আধ্যাত্মিক কিন্তু স্বয়ং মসীহ্ (আ.) যখন আসবেন তখন তাঁর (আধ্যাত্মিক এবং) বাহ্যিক-জাগতিক উভয় প্রকার খিলাফতই হবে। 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে উক্ত মর্মে লিখিত কথাটি কেবল সেই গতানুগতিক (বিশ্বাসের) অনুসরণেরই ফল যা কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক 'এলহামপ্রাপ্ত' ব্যক্তির পক্ষে তার নবী বর্ণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে থাকে।

কেননা যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এলহাম লাভ করে থাকেন তাঁরা খোদা তা'লা কথা বলতে না বললে কোনোকিছু বলেন না তিনি না বোঝালে তারা বোঝেন না। আদেশপ্রাপ্ত না হয়ে কোনো দাবি করেন না এবং নিজ থেকে (আগ বাড়িয়ে) কোনো রকম স্পর্ধা দেখাতে পারেন না। এ কারণেই আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'আহলে-কিতাব' তথা পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি অবলম্বনকে শ্রেয় মনে করতেন। আর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো আর আসল বিষয় উন্মোচিত হয়ে যেতো পুরোনো রীতি ছেড়ে দিতেন। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে নিজ পক্ষ থেকে কোনো আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় নি। এখন যেহেতু খোদা তা'লা এ অধমের ওপর আসল বিষয় এলহামযোগে উন্মোচিত করেছেন তাই এর সাধারণ ঘোষণা একান্ত আবশ্যক হয়ে গেল।

কিন্তু আমার আক্ষেপ কেবল এ যুগের ঐ মৌলবী সাহেবদের জন্য যাঁরা আমার লেখা সম্পর্কে পুরোপুরি মনোনিবেশে বরং অভিনিবেশ না করেই খণ্ডন লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। লেখক ও গবেষকগণ খুব ভালো বোঝেন যে, কোন কোন নব্য মৌলবী সাহেব আমাকে আমার পুরাতন অভিমতের যেমন বিরোধী সাব্যস্ত করেছেন, একটু খেয়াল করলেই জানা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে তা ততবড় বিরোধিতা করার বিষয় নয়, যে-কারণে এতো শোরগোল করা যেতে পারে! আমি কেবল 'মসীহ্-সদৃশ' হওয়ার দাবি করেছি এবং আমার এ দাবিও নয় যে সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়া কেবল আমাতেই শেষ বরং আমার মতে অনাগত ভবিষ্যতে আমার মতো আরও দশ হাজার মসীহ্ সদৃশ মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হতে পারে। তবে এ যুগের জন্য আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ সদৃশ এবং অন্য কারো জন্য অপেক্ষায় থাকা বৃথা। আর এ-ও জানা আবশ্যক যে, মসীহ্ সদৃশ মহাপুরুষ অনেক হতে পারেন– এটা কেবল আমারই অভিমত নয়, বরং নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র হাদীসেও এ অভিপ্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইকে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দুনিয়ার শেষ অবধি প্রায় ত্রিশ সংখ্যক দাজ্জাল পয়দা হবে। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, ত্রিশ জন দাজ্জালের আসা যখন আবশ্যকীয় তখন لِكُلِّ دَجَّالٍ عِيسىٰ ('প্রত্যেক দাজ্জালের জন্য রয়েছে একজন ঈসা') বিধান অনুযায়ী ত্রিশজন ঈসা মসীহ্র আসাও আবশ্যিক। অতএব এ বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো যুগে এমন কোনো মসীহ্ও আসতে পারেন, যার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থে হাদীসের কতক শব্দও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা এ অধম জাগতিক শাসন-ক্ষমতা ও রাজত্ব সহকারে আসে নি বরং দরবেশ হিসেবে ও দরিদ্রের বেশে এসেছে। অতএব অবস্থা যখন এমন, তখন আলেমবৃন্দের সমস্যা কোথায়?

হয়তো কোন সময় তাঁদের এই বাসনাটিও পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে তারা কোনো দিন হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবেন, কাশফ ও এলহাম আর যুক্তি-বুদ্ধি ও কুরআন করীমের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের ঐ বিশেষ মনোবাঞ্ছাটি পুরো হওয়ার কোনো আশা বা সম্ভাবনা কোনো দিক দিয়েই আমি দেখি না। সুতরাং তাদের এ কথায় জেদ করা যে, তারা কেবল তখনই তখনই ঈমান আনবেন যখন তারা হযরত মসীহ্ (আ.)-কে আকাশ থেকে নামতে দেখবেন, এটা প্রকৃতপক্ষেই এক মারাত্মক হঠকারিতা। তাদের এ কথাটি ঐসব লোকের কথার সাথে সামঞ্জস্য রাখে যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন: حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً [অর্থাৎ 'বাহ্যত আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত আমরা তোমার কথা মানবো না, ঈমান আনবো না' *(সূরা আল বাকারা: ৫৬)* – এ বাক্যটি তারা বলতে থাকে তাই তারা ঈমান আনা হতে বঞ্চিত থেকে যায়।]

এখন আমি আল্লাহ্র খাতিরে আমার প্রিয় আলেমবৃন্দের পরম হিতাকাঙ্ক্ষায় তাদের সমীপে 'সহীহাইন' (তথা বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত সেসব হাদীস উপস্থাপন করতে চাই যেগুলোর সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো, এগুলো থেকে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বিশদভাবে প্রমাণিত হয়। আর এ হাদীসগুলোর ওপর জোর দিয়ে তারা বার বার বলছেন যে, এ সকল হাদীস অনুযায়ী তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে ডিক্রি পেয়েছেন। অতএব এ হাদীস সমূহ অনুবাদসহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

والذى نفسى بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب - كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم

(সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা নং-৪৯০)

অর্থাৎ "কসম সেই সত্তার যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমাদের মাঝে ইবন মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। তিনি তোমাদের সকল বিবদমান বিষয়ে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মীমাংসা দেবেন এবং মিথ্যার ও সত্যের পূজারিদের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেবেন। অতএব তিনি এই ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারী হওয়ার দরুনই ক্রুশভঙ্গ করবেন ও শূকর বধ করবেন এবং নিত্যদিনের লড়াই-ঝগড়ার অবসান ঘটাবেন। তোমাদের সেদিন কী অবস্থা হবে যেদিন তোমাদের মাঝে ইবনে-মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন? তোমরা কি জান, কে এই ইবন মরিয়ম? তিনি তোমাদেরই একজন ইমাম হবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকেই (হে আমার উম্মতগণ!) তিনি আবির্ভূত হবেন।"

বুখারী বর্ণিত হাদীসটির অনুবাদ এখন শেষ হলো। এ থেকে আপনারা অবশ্যই বুঝে গেছেন যে ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসটিতে 'ইমামুকুম মিনকুম' বাক্যটি কোন দিকে ইঙ্গিত করছে। 'আল আকিলু তাকফীহিল্ ইশারাতো' (বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট)। এরপর সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত হাদীসের অনুবাদ মনোযোগসহকারে শুনুন।

وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلعم الدجال. - فقال أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وأن يخرج ولست فيكم فكل أمرء حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم إنّه شاب قطط عينه طافية كانّى أشبهه بعبد العزّى ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرء عليه فواتح سورة الكهف فانها جوارکم من فتنة أنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالًا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله ما لبثه فى الارض قال أربعون يوما، يوم كسنة و يوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذٰلك اليوم الذى كسنة اتكفينا فيه صلوٰة يومٍ. قال لا اقدروا له قدره - قلنا يا رسول الله وما اسراعه فى الارض - قال كالغيث استدبرته الريح فياتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. - فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرىً واسبغه ضروعًا وامده. - ثم ياتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل و يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذٰلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. - فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طاطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لُد فيقتله *(সহীহ্ মুসলিম)*

অর্থাৎ নোওয়াস বিন সামআন* (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাজ্জালের উল্লেখ করে বলেন, 'আমার জীবদ্দশায় যদি দাজ্জাল বের হয় তাহলে আমি তোমাদের

* *ষষ্ঠ টীকা ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

সামনে তার সঙ্গে (যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে) লড়বো। [এ বাক্যটি বস্তুত পরবর্তীকালে বা আখেরী যমানার সাথে সম্পৃক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী অর্থাৎ 'দাজ্জাল অবশ্যই মসীহ্ ইবনে মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালে বের হবে' মর্মে (ভবিষ্যদ্‌বাণীকে)– দুর্বল করে দিচ্ছে। বরং এ থেকে বুঝা যায় যে, দাজ্জালের বের হওয়ার জন্য কোনো সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয় নি। এ কারণেই তো স্বয়ং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (নিজ জীবদ্দশায়) ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কেও ধারণা করেছিলেন যে, সে-ই দাজ্জাল। তখন হযরত মসীহ্ কোথায় ছিলেন?]

ব্যাখ্যা

মোল্লা (ইমাম) আলী ক্বারী লিখেছেন, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে বা কাশফে দেখেছিলেন। আর এটি যেহেতু একটি রূপক জগৎ, সেহেতু মহানবী (সা.) দাজ্জালের হুলিয়া ও অবয়ব বর্ণনা করতে গিয়ে 'কা-আন্নি' অর্থাৎ 'যেন আমি' শব্দটি দ্বারা বর্ণনা করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ দৃশ্য বা দর্শন আক্ষরিক দর্শন নয় বরং এটি এক ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়।' আমি বলছি 'সিহাহ্ সিত্তার বহু হাদীস এ বিষয়ের অকাট্য ও সুনিশ্চিত প্রমাণ বহন করে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আ.) ও দাজ্জাল সম্পর্কিত যে-সব বিষয় জ্ঞাত হয়েছিলেন তা সবই নবী (সা.)-এর দিব্যদর্শন ছিল, যার নিজ নিজ জায়গায় লক্ষণাবলির নিরিখে যুক্তিযুক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত দামেস্ক সম্পর্কিত হাদীটিও সেগুলোর একটি যার এখন আমরা অনুবাদ করছি। এ সকল ভবিষ্যদ্‌বাণী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাশফ বা দিব্যদর্শন যা সত্য স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার নিরিখে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ– আমার উক্ত বর্ণনার সপক্ষে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী জোরালো ও সরব সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান যেমনটি কি-না নিম্ন লিখিত হাদীসটি যা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হাদীসটি হলো:

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايتنى الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كاحسن ما انت رأى من ادم الرجال له لمة كاحسن ما انت راء من اللمم قد رجلها فهى تقطر ماء متكئا على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم قال ثم اذا انا برجل جعد

قطط اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية كاشبه من رأيتُ من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبى رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال متفق عليه وفى رواية قال فى الدجال رجل احمر جسيم جعد الراس اعور العين اليمنى اقرب الناس به شبها ابن قطن

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'আজকের রাতে স্বপ্নে বা দিব্যদর্শনে আমি নিজেকে খানা-কা'বার কাছে দেখতে পাই। সেখানে গোধূম বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তার গায়ের রং গোধূম বর্ণের পুরুষদের মাঝে সর্বোত্তম বলে মনে হতো। তাঁর মাথার চুলগুলো এত পরিষ্কার দেখায় যেমনটি চিরুনি করলে হয়ে থাকে আর তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি দেখি, তিনি দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে খানা কা'বার তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে এই ব্যক্তি?' আমাকে বলা হলো, 'ইনি মসীহ্ ইবনে মরিয়ম'। এরপর একই স্বপ্নে আমি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাই যার চুলগুলো কোঁকড়ানো ছিল এবং ডান চোখ ছিল কানা যেন তার চোখ হলো আঙুর, তা ফোলা ও জ্যোতিবিহীন। সে দেখতে অনেকটা সেসব লোকের মতো ছিল যাদের আমি ইবনে কুতনের সঙ্গে দেখেছি। তার উভয় হাত দুইজন ব্যক্তির কাঁধে রাখা ছিল। সে খানা কা'বার তাওয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে এই ব্যক্তি?' মানুষ বলল, 'এ হচ্ছে দাজ্জাল।'

এখন পুরো হাদীসটি সম্পর্কে প্রণিধানে প্রতীয়মান হবে যে, দামেস্ক সম্পর্কিত সহীহ্ মুসলিমের হাদীসটিতে বর্ণিত বিষয়গুলোর বেশির ভাগ কথাই এ হাদীসটিতেও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় এ হাদীসটিতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটি তাঁর দিব্যদর্শন বা স্বপ্ন। অতএব এ জায়গা থেকে নিশ্চিতরূপে ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, দামেস্ক সংক্রান্ত যে হাদীসটি আমরা লিখে এসেছি সেটিও প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি স্বপ্ন বৈ কিছু নয়। যেমন, সেখানে 'কা-আন্নি' বা 'যেন আমি' শব্দটি বর্ণনা করে এরই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর এ হাদীসটি স্বয়ং মহানবী (সা.) যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, এটি তাঁর এক কাশফ বা স্বপ্ন তা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে তাঁদের প্রণীত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞ আলেমগণ এতে বর্ণিত একটি জটিলতা তুলে ধরে তার জবাব বা সমাধান উপস্থাপন করেছেন। এই সমাধানটি আমার দাবিকে এমনভাবে সমর্থন যোগায় যে তা যেন আমার এবং আমার বিরুদ্ধবাদীদের মাঝে চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসাকারী

এক প্রমাণ বিশেষ। অতএব বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীসটিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে দেখলাম।' এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'তেমনিভাবে দাজ্জালকেও খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে দেখেছি।' এ বর্ণনা থেকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এবং দাজ্জালের লক্ষ ও উদ্দেশ্য আবশ্যকীয় ভাবে এক ও অভিন্ন বলে মনে হয় আর তারা উভয়ে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত ও ইসলামের সত্যিকার অনুসারী বলেই প্রতীয়মান হয়; অথচ অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, দাজ্জাল খোদা হওয়ার দাবি করবে। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় তার আবার খানা-কা'বার তাওয়াফের সাথে কী সম্পর্ক? (অতীত কালের) বিজ্ঞ উলামা এর উত্তর দিয়েছেন যে "এ ধরনের কথা ও শব্দাবলি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা মহা ভুল। এসব প্রকৃতপক্ষে কাশফ ও সত্য স্বপ্নের আদলে বর্ণিত বিষয়াদি যার অর্থ ও ব্যাখ্যা করা উচিত যেমনটি কিনা সচরাচর স্বপ্নের তা'বীর বা অর্থ করা হয়। অতএব এর অর্থ হলো, অভিধানে 'তাওয়াফ' প্রদক্ষিণ করাকে বলা হয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর 'নযূল' বা অবতরণের সময়কালে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সময় তাঁর কর্ম-প্রয়াসের চারদিক ঘুরবেন (তথা প্রদক্ষিণ করবেন) এবং এ কাজের পরিপূর্ণ সমাধা চাইবেন। একইভাবে দাজ্জালও তার আবির্ভাবের সময় তার নৈরাজ্যবাদিতামূলক কর্মকাণ্ডের চারদিক ঘুরবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে চাইবে।"

এখন কোথায় ঐ সকল মৌলবী সাহেব যাঁরা এসব হাদীসের শব্দাবলিকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ করতে চান এবং এ বাক্যাবলির আক্ষরিক অর্থ না করাকে আবশ্যকীয় কুফর ও 'এলহাদ' (অবিশ্বাস ও নাস্তিক্য) বলে গণ্য করেন? নিজেদের হৃদয়ে একটু উঁকি মেরে দেখুন, অতীতের পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ হাদীসটির অর্থ করতে গিয়ে দাজ্জালের তাওয়াফ করাকে একটি স্বপ্নের ব্যাপার মনে করে এর এমন অর্থ করেছেন, যা বাহ্যিক শব্দাবলি থেকে যোজন যোজন দূরে। কাজেই যেখানে অনোন্যপায় হয়ে এ সকল দিব্যদর্শনের একটি অংশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে কী কারণে যথার্থ ও জোরালো হেতু ও লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য অংশেরও ব্যাখ্যা করা হবে না?!

স্পষ্ট হওয়া উচিত যেভাবে আমাদের (অতীতের বিজ্ঞ) উলামা দাজ্জালের তাওয়াফ করাকে একটি দিব্যদর্শনের বিষয় মনে করে এর এক রূপক অর্থ করেছেন, অনুরূপ ভাবে স্বয়ং আমাদের মহানবী 'খাতামুন্নবিয়ীন' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অনেক জায়গায় ব্যক্ত করেছেন যে, কাশফ বা দিব্যদর্শন মূলে তাঁর প্রতি যা কিছু

উন্মোচিত করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এর চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত অর্থ জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে তিনি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ এ হাদীসটি দেখুন যা সহীহ্ বুখারীর ৫৫১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে:

حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها اريتك فى المنام مرتين ارى انك فى سرقة من حرير و يقول هذه امرأتك فاكشف عنها فاذا هى انت فاقول ان يك هذا من عند الله يمضه

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাকে স্বপ্নে আমায় দু'বার দেখানো হয়। আমি তোমাকে রেশমের এক টুকরা কাপড়ের ওপর দেখতে পাই। আমাকে বলা হয়, 'ইনি তোমার স্ত্রী।' আমি সেটি খুলি। তখন দেখতে পাই যে, সেটি তুমিই। আমি তখন বলি, 'খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এর অর্থ যদি এটিই হয়ে থাকে যা আমি বুঝতে পেরেছি, তাহলে এটি এভাবেই ফলবে বা বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ স্বপ্ন ও কাশফ-এর তা'বীর বাহ্যিক ও আক্ষরিকভাবে পুরো হওয়া আবশ্যক নয়। কোন কোন সময় বাহ্যিকরূপেও পুরো হয় আবার রূপক অর্থেও পূর্ণ হয়। অতএব এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের সত্যতায় সন্দেহ করেন নি। কেননা নবীর স্বপ্নও এক প্রকারের ওহী হয়ে থাকে বরং এর পূর্ণতার ধরন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন– খোদা জানেন এটি কি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে পুরো হবে নাকি এর অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ পাবে।

এক্ষেত্রে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, ওহী, দিব্যদর্শন বা স্বপ্ন যা কোন নবী দেখে থাকেন এসবের তা'বির বা অর্থ করার ক্ষেত্রেও ভুল হতে পারে। সহীহ্ বুখারীর একই ৫৫১ পৃষ্ঠায় অন্য একটি হাদীসে এ রকম ভুল হওয়ার সম্ভাবনার কথা স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন। সে হাদীসটি নিম্নরূপ:

قال ابو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم رأيت فى المنام انى اهاجر من مكة الى ارض بها نخل فذهب وهلى الى انها اليمامة او هجر فاذا هى المدينة يثرب

অর্থাৎ আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মক্কা থেকে এমন এক জায়গার দিকে হিজরত করেছি যেখানে প্রচুর খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। অতএব আমার তখন ধারণা হলো যে, সেটি 'ইয়ামামা' বা 'হিজর' হবে। কিন্তু কার্যত সেটি সাব্যস্ত হলো মদীনা, যাকে 'ইয়াস্রেব'ও

বলা হয়।" এ হাদীসটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, দিব্যদর্শনমূলক বিষয়াদির ব্যখ্যায় নবীদের ভুল হতে পারে।

এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টত প্রতীয়মান হলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ও দাজ্জাল সম্পর্কে যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো সবই মহানবীর(সা.)-এর দিব্যদর্শন বিশেষ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহে পরিষ্কারভাবে এ কথার দিকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, এ কাশফগুলোকে কেবল বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বসো না। এগুলোর আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। এসব বিষয় অধিকাংশই আধ্যাত্মিক বিষয় যা বাহ্যিকরূপে প্রতিফলিত করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সাম্প্রতিককালের আলেম-উলামা আমাদের মনিব ও অভিভাবক মহানবী (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায় না। আর অনর্থক দিব্যদর্শনের রূপক বিষয়াদিকে বাহ্যিকতার পোষাক পরিধান করাতে চায়।

স্পষ্টভাবে জানা থাকা উচিত যে দিব্যদর্শনের জগতে বড়ো বড়ো বিস্ময়কর বিষয়াদি ঘটে থাকে। হরেক রকম উপমা পরিদৃষ্ট হয়। অনেক সময় এমন সব জিনিস দিব্যদর্শনে দৈহিকরূপে চোখের সামনে এসে যায় যা প্রকৃতপক্ষে রূহানী বা আধ্যাত্মিক হয়ে থাকে (দৈহিক নয়)। কোনো সময় মানুষের আকৃতিতে কোনো জিনিস দেখা যায়; অথচ সেটি মানুষ হয় না। যেমন, সাহাবী হযরত যিরারাহ্ আরবের এক রাজা নুমান বিন মুনযিরকে সার্বিক রাজকীয় সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকের সাথে স্বপ্নে দেখলেন এবং মহানবী (সা.) এর অর্থ করতে গিয়ে বললেন যে এদ্বারা আরব দেশকে বোঝায়, যা পুনরায় স্বীয় সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার দিকে ফিরে এসেছে। এটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে দিব্য দর্শনের বিষয়াদির ব্যাখ্যা দেখানো বিষয় হতে কত ভিন্ন। সুতরাং এ অধমের এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কোনো সময় স্বপ্ন অথবা দিব্যদর্শনে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি দৈহিক রূপধারণ করে যেমন মানুষের আকারে দেখা যায়। আমার স্মরণ আছে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (غفر الله له) যিনি একজন সম্মানিত রঈস ছিলেন এবং তাঁর এলাকা জুড়ে সম্মানিত ছিলেন, তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আমি স্বপ্নে একজন অতি সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পেলাম যার চেহারা বা অবয়ব এখনও আমার চোখের সামনে রয়েছে– সে বললো, 'আমার নাম রাণী'। আর সে ইশারা ইঙ্গিতে জানালো যে সে এই গৃহের সম্মান ও মর্যাদা বিশেষ। সে আরও বললো, 'আমি চলেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তোমার জন্য রয়ে গেলাম'। সে দিনগুলোতে আমি একবার স্বপ্নে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ ব্যক্তিকে

দেখলাম। আমি তাকে বললাম, 'তুমি একজন অদ্ভুত রকম সুদর্শন মানুষ!' সে তখন ইঙ্গিতে ব্যক্ত করল, 'আমি তোমার পরম সৌভাগ্য।' এবং 'তুমি একজন অদ্ভুত রকম সুন্দর মানুষ'- তার সম্পর্কে আমার এ কথার উত্তরে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমি একজন 'দর্শনি' (তথা তাক লাগানো সুপুরুষ)।' এই কয়েক দিন হলো, একজন যক্ষ্মারুগী যার মৃত্যু প্রায় ঘনিয়ে এসেছে এমন ব্যক্তি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হলো। সে আমাকে জানালো যে তার নাম 'দ্বিন মুহাম্মদ'। আর আমার অন্তরে উদ্রেক করা হলো, এ হচ্ছে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম যা দৈহিক রূপধারণ করে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আমি তাকে প্রবোধ দেই যে আমার হাতে সে রোগমুক্ত ও সুস্থ হবে। এমনি ধারায় কখনো পুণ্য বা মন্দ কর্মসমূহও দৈহিক আকার-আকৃতিতে (স্বপ্নে বা কাশফে) দেখা যায়। কবরে আমলসমূহের আকৃতি ধারণ করে পরিদৃষ্ট হওয়া মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বপ্নসমূহের তা'বীর বা ব্যাখ্যায় স্বপ্নে দেখা লোকদের নাম থেকে প্রায়শ ভালো বা মন্দ ফলাফল নির্ণয় করতেন।

এখন পুনরায় আমরা দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীসের অবশিষ্টাংশের অনুবাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মাঝে যে-ব্যক্তি তাকে অর্থাৎ দাজ্জালকে দেখতে পাবে তার উচিত হবে সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্ফের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ পাঠ করে। কেননা এগুলোতে রয়েছে দাজ্জালসৃষ্ট নৈরাজ্য থেকে নিরাপত্তা লাভের ব্যবস্থাপত্র। এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে যথাসাধ্য 'আসহাবে কাহ্ফ' (তথা গুহাবাসীদের) মতো অবিচল দৃঢ়তা অবলম্বন করা উচিত কেননা এ আয়াতগুলোতে উল্লিখিত লোকদের অবিচলতার উল্লেখ রয়েছে যারা প্রতিমা-পূজারি শাসকের অত্যাচারের ভয়ে গুহায় আত্মগোপন করেছিল। (হে আমার বন্ধুগণ! তোমরাও এ আয়াতসমূহ পাঠ করো। কেননা বহু দাজ্জাল তোমাদের সম্মুখে রয়েছে)। আবার বলেন 'নিরক্ষর' রসূল (সা.) যার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তিনি বলেন, দাজ্জাল সেই রাস্তা দিয়ে বের হবে যা সিরিয়া ও ইরাকের মাঝে অবস্থিত এবং ডানে-বাঁয়ে (অর্থাৎ সর্বত্র) ফ্যাসাদ ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে বেড়াবে। (এটিও একটি রূপক বাচনভঙ্গী, যেমনটি দিব্যদর্শনে সাধারণভাবে হয়ে থাকে)।

এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দারা! সে সময় তোমাদের অটল-অবিচল থাকতে হবে, যেভাবে 'আসহাবে কাহ্ফ' অটল-অবিচল ছিল।' হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, (সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন), 'হে আল্লাহ্র রসূল! দাজ্জাল কত কাল ব্যাপী দুনিয়ায় অবস্থান করবে? তিনি (সা.) বলেন, 'চল্লিশ দিন।' কিন্তু 'শারহুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থে আস্মা বিন্তে ইয়াযীদের রিওয়ায়াতে রয়েছে, 'চল্লিশ বছর অবস্থান করবে।' প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে

কোনো রকম স্ববিরোধ রয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। চল্লিশ দিন বা বছর বলতে কী বোঝায়*– এর প্রকৃত জ্ঞান সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ওপর সমর্পণ করা উচিত।

'মুসলিম' বর্ণিত হাদীসটির অবশিষ্ট অনুবাদ হলো, 'দাজ্জালের এক দিন এক বছরের সমান হবে। আবার একদিন এক মাসের সমান এবং একদিন এক সপ্তাহের সমান। বাকি দিনগুলো সাধারণ দিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।'(এগুলো সবই রূপক বিষয়) অতঃপর হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, ঐ দীর্ঘদিনগুলোতে কি এক দিনের নামায পড়া যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, 'না। বরং তোমরা নামাযের সময়গুলোর পরিমাণ-পরিমাপ অনুসারে অনুমান করে নিও।' (জানা থাকা আবশ্যক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ বক্তব্যটিতে একটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন, অর্থাৎ তিনি (সা.) খোদার শক্তিমত্তার ব্যাপকতাকে সামনে রেখে দিব্যদর্শনের বিষয়কে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন অনুসারে বাহ্যিক বিষয় ধরে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন। নচেৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুখারীর ৫৫১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসটিতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, কাশফমূহের ব্যাখ্যা কখনো বাহ্যিকভাবে বা প্রকাশ্যভাবে আবার কখনো অপ্রকাশ্যভাবে পূর্ণ হয়ে থাকে। আর সত্যিকার অর্থে সকল নবী ও ওলীদের আজ পর্যন্ত এ নীতিই চলে আসছে। অতএব তিনি যে নামাযসমূহ সেগুলোর সময়ের পরিমাপ করে আদায় করার কথা বলেছেন–এটি প্রশ্নকারীর বুদ্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা ও ধ্যানধারণাকে সামনে রেখে تكلموا الناس على قدر عقولهم (অর্থাৎ 'তোমরা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির পরিধি ও ধরন বুঝে কথা বলো')– অনুযায়ী দিয়েছেন। নচেৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোনো কাশফ বা দিব্যদর্শনমূলক বিষয়কে খোদা তা'লা কর্তৃক বিশেষভাবে প্রকাশ না করা পর্যন্ত কখনো কেবল বাহ্যিক অর্থে সীমাবদ্ধ বলে মনে করতেন না, যেমন কিনা বহু হাদীস থেকেই নবী করীম (সা.)-এর এ নীতি ও পবিত্র রীতিটি প্রমাণিত।

এরপর রিওয়াতকারী বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! পৃথিবীতে দাজ্জালের গতি কতটা দ্রুত হবে এবং তার দ্রুত চলার ধরনটি কেমন হবে? হুযূর (সা.) বলেন, 'তীব্র বায়ু পরিচালিত মেঘপুঞ্জের ন্যায় দ্রুত ধাবিত হবে।' অর্থাৎ এক মুহূর্তেই সহস্র সহস্র ক্রোশ ঘুরবে। কোনো জনবসতি অতিক্রম করার সময় তাদেরকে নিজ ধর্মের প্রতি আহ্বান করবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনলে সে তখন মেঘমালাকে তাদের জন্য বারিবর্ষণ আর ভূমিকে তাদের জন্য ফসলাদি উৎপন্ন করার আদেশ দেবে। (এসবই রূপক কথা, সতর্ক থেকো, ধোঁকা খেয়ো না)। তিনি (সা.) আরো বলেন, সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় সকালে চরতে যাওয়া গবাদি পশু বিকেলে এমন রিষ্ট-পুষ্ট হয়ে

---

* *সপ্তম টীকা ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

ফিরে আসবে যে, মোটাতাজা হয়ে তাদের পিঠ উঁচু হয়ে যাবে আর স্তন হবে দুধে পরিপূর্ণ এবং খুব বেশি খাওয়ার দরুন উদর টানটান দেখাবে।

এরপর দাজ্জাল আরেক জাতির কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের ঈশ্বরত্বে ঈমান আনার আহ্বান করবে। কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। এ কারণে দাজ্জাল তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেবে আর ভূমির শস্যোৎপাদন থামিয়ে দেবে। অতএব তারা দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে এবং পানাহারের জন্য তাদের কাছে কিছুই থাকবে না।

এরপর দাজ্জাল এক জনশূন্য মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে গিয়ে বলবে তোমার ভেতরকার সব ধনরত্ন বের করে দাও। তার আদেশ দেয়া মাত্র সেখানকার সব রত্নভাণ্ডার সেই বিরানভূমি হতে বেরিয়ে তার পেছনে ছুটবে, যেমনটি মৌমাছিরা তাদের রানী মৌমাছির পেছনে পেছনে যায়।

এরপর দাজ্জাল এক টগবগে যুবককে ডেকে তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করবে এবং তার দুই টুকরো করে পৃথক পৃথক ভাবে তির নিক্ষেপের দূরত্বে ফেলে দেবে। এরপর তার লাশকে ডাকবে। তখন সে ব্যক্তি জীবিত হয়ে এক উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত চেহারা নিয়ে তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে তার ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করবে। অতএব দাজ্জাল এ ধরনেরই সব বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে, এরই মধ্যে হঠাৎ মরিয়ম পুত্র মসীহ্ আবির্ভূত হবেন। তিনি একটি শুভ্র মিনারের পাশে দামেস্কের পূর্বদিকে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু ইবনে মাজার রেওয়ায়েতে রয়েছে মসীহ্ বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতীর্ণ হবেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস বা দামেস্কে নয় বরং মুসলমান বাহিনীর মাঝে অবতীর্ণ হবেন, যেখানে হযরত মাহ্দীও থাকবেন।

এরপর তিনি (সা.) বলেন, যখন মসীহ্ অবতীর্ণ হবেন, তিনি হলুদ রঙের পোশাক পরিহিত থাকবেন অর্থাৎ হলদে রঙের দু'টি কাপড় পরিহিত হবেন। (এটিতে এদিকে ইঙ্গিত বলে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা ভালো থাকবে না)। আর তাঁর উভয় হাতের তালু দুইজন ফেরেশতার বাহুর ওপর রাখা থাকবে। কিন্তু বুখারী শরীফে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রয়েছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে দুইজন ফেরেশতার পরিবর্তে দুইজন মানুষের কাঁধে হাত রেখে কা'বার তাওয়াফ করতে দেখেছেন। অতএব এ হাদীসটি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীসে উল্লিখিত দুইজন ফেরেশতা হলেন প্রকৃতপক্ষে সেই অপর হাদীসটিতে বর্ণিত দুইজন মানুষ; আর এদের কাঁধে হাত রাখার অর্থ হলো, তাঁরা প্রতিশ্রুত মসীহ্র সহায়ক ও সাহায্যকারী হবেন।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন তাঁর মাথা নীচু করবেন তখন তাঁর (মাথা থেকে) ঘামের ফোটা দৃশ্যমান হবে আর যখন মাথা উপর দিকে তুলবেন তখন তাঁর চুল থেকে রৌপ্যদানার মতো ঘামের ফোটাগুলো ঝরবে, যেমন মতি হয়ে থাকে। প্রতিশ্রুত মসীহ্র নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগার পর কোনো 'কাফির' তথা অস্বীকারকারীর পক্ষেই জীবিত থাকা সম্ভব হবে না, বরং তৎক্ষণাৎ মারা যাবে; তাঁর নিশ্বাসবায়ু তাঁর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাবে।

এরপর হযরত ইবন মরিয়ম দাজ্জালের সন্ধানে আত্মনিয়োজিত হবেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের গ্রামগুলোর মধ্যকার 'লুদ্দ্' নামের একটি গ্রামের দরজায় তাকে ধরে ফেলবেন ও তাকে ধরে হত্যা করবেন। এখানে আলোচ্য হাদীসটির অনুবাদ সমাপ্ত হলো।

এটি সেই হাদীস যা ইমাম মুসলিম (তাঁর সংকলিত) সহীহ্ মুসলিমে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বা দুর্বল জ্ঞান করে রঈসুল মুহাদ্দেসীন ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী ছেড়ে দিয়েছেন (সহীহ্ বুখারীতে স্থান দেন নি)। এ ক্ষেত্রে অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, হাদীসটিতে দাজ্জালের যে অবস্থা ও গুণাগুণ লেখা হয়েছে যেভাবে এবং যে ভাষায় তার আসার সংবাদ দেয়া হয়েছে তা অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিপরীত ও পরিপন্থি। কেননা 'সহীহাইন' বা বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসটিও রয়েছে:

وعن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر ابن عبدالله يحلف بالله ان ابن صياد الدجال قلت تحلف بالله قال انى سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم متفق عليه

আরেকটি হাদীস হলো

عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن صياد رواه ابوداؤد والبيهقى فى كتاب البعث والنشور

প্রথমোক্ত হাদীসটির অনুবাদ হলো, মুহাম্মদ বিন্ মুনকাদের তাবেয়ী রেওয়ায়েত করেন, 'আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ্কে দেখেছি যে তিনি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলতেন, 'ইবনে সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল।' মুহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেন, আমি জাবিরকে বললাম, আপনি কি খোদা তা'লার কসম খাচ্ছেন?! অর্থাৎ এ বিষয়টি তো সন্দেহজনক, সুনিশ্চিত নয়; তা সত্ত্বেও কেন কসম খাচ্ছেন? জাবের বলেন, 'আমি (হযরত) উমরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে এ বিষয়ে কসম

খেতে শুনেছি অর্থাৎ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খোদার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে কসম খেয়ে বলতেন যে ইবনে সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল।'

এরপর দ্বিতীয় হাদীসটির অনুবাদ হলো, নাফে' হতে বর্ণিত, ইবনে উমর (রা.) বলতেন, 'আল্লাহ্‌র নামে সপথ করে বলছি, আমি ইবনে সাইয়্যাদের দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করি না।' শারহুস্ সুন্নাহ্ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আরেকটি হাদীসে এ বাক্যটিও লেখা আছে, لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا انه هو دجال অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সর্বদা এ শঙ্কায় ছিলেন যে ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সর্বদা বদ্ধমূল ধারণা এটাই ছিল যে, ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল।'

বিশেষত সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনা থেকে যখন প্রমাণিত হলো যে ইবনে সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল, বরং সাহাবীরা (রিয্ওয়ানুল্লাহি্ আলাইহিম) আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেছেন, এ ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল, তাহলে ইবনে সাইয়্যাদের দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে আর কিবা সন্দেহ থাকতে পারে?! এখন ইবনে সাইয়্যাদের বৃত্তান্ত ও অবস্থা শুনুন যে তার পরিণাম কী হয়েছিল! এ বিষয়টি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়; সে বৃত্তান্ত হলো:

আবু সাঈদ খুদ্‌রি (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি ইবনে সাইয়াদসহ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ওই সফর কালে ইবনে সাইয়াদ আমাকে বলল, মানুষের অর্থাৎ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের এসব কথায় আমি খুবই মর্মাহত হই অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন, আমিই কিনা প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। অথচ আপনি জানেন, প্রকৃত বিষয় এর বিপরীত। আপনি শুনে থাকবেন যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জাল নিঃসন্তান হবে' অথচ আমার সন্তানসন্ততি আছে। তাছাড়া রসূল করীম (সা.) বলেছিলেন, 'দাজ্জাল 'কাফির' (অমুসলিম) হবে' অথচ আমি একজন মুসলমান। তিনি (সা.) আরো বলেছিলেন যে দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না অথচ আমি মদীনা থেকে এসেছি এবং মক্কায় যাচ্ছি।'*

এখন লক্ষ করা উচিত, এটি কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে কতক সাহাবী কসম খেয়ে বলেছেন, ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল। আর 'সাহীহাইন' তথা বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে লেখা আছে যে, 'এ ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল'-একথা হযরত উমরের কসম খেয়ে বলার পর মহানবী (সা.) নীরবতা অবলম্বন করত নিজের অভিমত জানিয়ে দেন যে প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ইবনে সাইয়াদই ছিল। সহীহ মুসলিমে স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে যে সে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্যে লাভ করেছিল

** অষ্টম টীকা ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

এবং তার সন্তান-সন্ততিও ছিল আর তার মক্কা মদিনায় যাওয়ার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লেখা আছে। শুধু তাই নয়, বরং সেসকল হাদীসে এ-ও লেখা আছে যে ইবনে সাইয়াদ মদীনা মনোওয়ারায় মারা যায় এবং তার জানাযার নামায পড়া হয়েছে। এখন প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখতে ও বুঝতে পারেন, হাদীসের যে-সব গ্রন্থে শেষ যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসার হাতে নিহত হওয়ার সংবাদ লেখা আছে, সে-সব কিতাবে এ-ও লেখা রয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই প্রকাশ পেয়েছিল এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্যে ভূষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

তার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করার বিষয়টিও সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী আবশ্যিক ছিল যা বুখারী ও মুসলিমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে একটি স্বপ্ন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা নবী করীম (সা.) দাজ্জালকে স্বপ্নের জগতে খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে দেখেছিলেন। মোটকথা, এ হাদীসগুলোতে যখন প্রতিশ্রুত দাজ্জাল সম্পর্কে এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেখানে এগুলোর বিপরীতধর্মী হাদীসসমূহে কী করে আস্থা রাখা যেতে পারে?! তবে যদি উলামা এ হাদীসগুলোকে 'মওযু' বা বানানো হাদীস সাব্যস্ত করে সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থাবলি থেকে বের করে দেন, তবে অবশ্যই তাদের দাবির সপক্ষে একটা ভিত রচিত হতে পারে। নইলে, اذاتعارضاتساقطا (অর্থাৎ দু'টি বিষয় যখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয় তখন দুটোই আস্থার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে– অনুবাদক)– এ নীতি অনুসরণে উভয় ধরনের হাদীসকে বিশ্বাসের অযোগ্য গণ্য করা উচিত।

এখানে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম মুসলিম লিখেছেন, প্রতিশ্রুত দাজ্জালের কপালে 'কাফ, ফা, রা' লেখা থাকবে। কিন্তু এই দাজ্জাল (ইবনে সাইয়াদ– অনুবাদক) এতে বর্ণিত হাদীস অনুসারে ইসলাম গ্রহণের সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম লেখেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিশ্রুত দাজ্জাল প্রবল বায়ু দ্বারা পরিচালিত মেঘপুঞ্জের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে।' কিন্তু মুসলিমের বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, এই দাজ্জাল (অর্থাৎ ইবনে সাইয়াদ) মক্কা থেকে মদীনায় যখন ফিরে গেল তখন হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রির চেয়ে বেশি হাঁটতে পারে নি। অনুরূপভাবে কেউ তার কপালে কাফ, ফা, রা লেখা দেখতে পায় নি। ইবনে সাইয়্যাদের কপালে কাফ, ফা, রা লেখা থাকলে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে কেন-ই তাকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন আর কেন বললেন যে, "তার (প্রকৃত) অবস্থা সম্পর্কে আমার এখনো সন্দেহ আছে। প্রতিশ্রুত দাজ্জাল যদি এ ব্যক্তিই হয়ে থাকে তাহলে ঈসা ইবনে মরিয়মই সেই ব্যক্তি যিনি তাকে বধ করবেন। আমরা একে হত্যা করতে পারব না! "আশ্চর্যের বিষয় হলো,

ইবনে সাইয়্যাদের কপালে 'কাফ, ফা, রা' (অক্ষরগুলো) লেখা না থাকা সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে সন্দেহ করার কী কারণ ছিল? আর যদি লেখা– ছিল তাহলে তাকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে বিশ্বাস না করারই-বা কী কারণ ছিল? অপরদিকে অন্যান্য হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, এক পর্যায়ে সেই যে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল এ বিশ্বাসই পোষণ করা হয়। যেমন সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) খোদার কসম খেয়ে বলেন, এখন এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে এ ব্যক্তিই হলো প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামও পরিশেষে বিশ্বাস করলেন কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, দাজ্জালের কপালে কাফ, ফা, রা অক্ষরগুলো লেখা সম্বলিত হাদীস সহীহ্ হয়ে থাকলে প্রারম্ভিককালে ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেন দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকলেন এবং কেন এ কথা বললেন যে, সম্ভবত এ ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হবে বা অন্য কেউও হতে পারে?

বলা হয় যে হয়তো তখন পর্যন্ত 'কাফ, ফা, রা' অক্ষরগুলো তার কপালে লেখা ছিল না। আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত যে সত্যি সত্যি প্রতিশ্রুত দাজ্জালের আখেরী যুগে অর্থাৎ সেই যুগে যখন মসীহ্ ইবন মরিয়ম স্বয়ং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, তখন আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত হয়ে থাকলে, সময় আসার আগেই এ সন্দেহ-সংশয় কেনই বা সৃষ্টি হলো? এরচেয়ে ও অধিক বিস্ময়কর বিষয় হলো, ইবনে সাইয়াদ এমন কোনো কাজও করে দেখায় নি যা প্রতিশ্রুত দাজ্জালের চিহ্নাবলির মাঝে গণ্য হতে পারত। যেমন, বেহেশত ও দোযখ তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকা, ধনসম্পদ ও রত্নভাণ্ডার তার পেছনে পেছনে ছুটে আসা, মৃতদের জীবিত করা, তার আদেশে মুষলধারে বারিধারা বর্ষিত হওয়া বিরান ভূমির তার আদেশে শস্যোৎপাদন এবং সত্তর গজ দীর্ঘ গাধায় তার আরোহণ।

এখন বড়ো সমস্যা হলো, আমরা যদি বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত ওই সব হাদীসকে সহীহ্ বলে মনে করি যা দাজ্জালকে আখেরী যুগে নামায় (অর্থাৎ শেষ যুগে তার জাহির হওয়া নির্ধারণ করে– অনুবাদক), তাহলে এ উভয় সহীহ্ হাদীস-গ্রন্থে পরিবেশিত এই সব হাদীস মওযূ' বা কৃত্রিম বলে সাব্যস্ত হয়। অপরদিকে এই হাদীসগুলোকে সহীহ্ বলে নির্ধারণ করলে অন্যগুলোকে 'মওযূ' বা কৃত্রিম বলতে হয়। যদি এই পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক হাদীসসমূহ 'সহীহাইন' তথা বুখারী ও মুসলিমে না হয়ে কেবল অন্য সব সহীহ্ (বলে গৃহীত) হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হতো, তা হলে হয়ত আমরা উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য গ্রন্থগুলোর হাদীসকে 'মওযূ' ও কৃত্রিম বলে নির্ধারণ করতাম। কিন্তু সমস্যা হলো, হাদীসের এ প্রধান দু'টি গ্রন্থে উক্ত উভয় প্রকারের হাদীস বিদ্যমান। উভয় প্রকার হাদীসে দৃষ্টিপাতে আমরা যখন বিস্ময়ের ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত হই যে, এগুলোর কোনটিকে সঠিক এবং

কোনটিকে ভুল বলে জ্ঞান করবো; তখন খোদা প্রদত্ত বিচারবুদ্ধি আমাদের সিদ্ধান্তের এ পন্থা বাতলে দেয় যে, যে-সব হাদীস সম্পর্কে যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আপত্তি দাঁড়ায় না সেগুলোকে সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত। অতএব সিদ্ধান্ত করার এ পন্থা অনুযায়ী ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে যে-সব হাদীস রয়েছে সেগুলো যুক্তিসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা ইবনে সাইয়াদ তার জীবনের প্রথম ভাগে নিঃসন্দেহে একটা দাজ্জালই ছিল কেননা কিছু শয়তানী ক্রিয়াচক্রের সাথে সম্পর্কের দরুন তার পক্ষ থেকে অদ্ভুত ধরনের বিষয়াদি প্রকাশিত হতো। এগুলোর দরুন অধিকাংশ মানুষ 'ফেতনা' বা পরীক্ষায় পড়েত কিন্তু পরবর্তীকালে ইবনে সাইয়াদ খোদা প্রদত্ত পথনির্দেশনার সুবাদে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে এবং শয়তানী পন্থা থেকে বেরিয়ে আসে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেভাবে (স্বপ্নে) দাজ্জালকে খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে দেখেছিলেন সেভাবেই সে তাওয়াফও করলো। তার ব্যাপারে এমন কোনো বিষয় নেই যা প্রকৃতির নিয়ম ও যুক্তি বহির্ভূত। তার প্রশংসায় এমন কোনো অতিশয়োক্তিও করা হয়নি যা শিরকের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমরা যখন অন্য সব হাদীসে দৃষ্টিপাত করি, যা প্রতিশ্রুত দাজ্জালের আবির্ভাবকাল এ পৃথিবীর শেষকাল বলে জানায়, তখন সে হাদীসগুলো এমন বিষয়বস্তুতে ভরা বলে প্রতীয়মান হয়, যা যুক্তির নিরিখে সঠিক ও সহীহ্ সাব্যস্ত হতে পারে না এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইসলামী একত্ববাদ পরিপন্থি। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় প্রকার তথা দাজ্জাল জাহির হওয়া সংক্রান্ত মুসলিম শরীফ বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীস, এর অনুবাদসহ দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছি। দর্শক নিজেরাই তা পাঠ করে অনুধাবন করতে পারেন, প্রতিশ্রুত দাজ্জালের যে-সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য এতে উল্লিখিত আছে এগুলো কতই না যুক্তি ও শরীয়ত পরিপন্থি!

এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা যদি দামেস্ক সম্পর্কিত হাদীসটিকে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে সহীহ্ এবং খোদা ও রসূলের মুখনিঃসৃত বাণী বলে মেনে নেই তাহলে এ কথার ওপর আমাদের ঈমান আনতে হবে যে, সত্যিই দাজ্জালকে এক রকম ঐশ্বরিক শক্তি দেয়া হবে এবং স্বর্গ-মর্ত্য তার আজ্ঞাবহ হবে এবং খোদা তা'লার মতো তার ইচ্ছায় সবকিছু ঘটতে থাকবে। বৃষ্টিকে বলবে, 'বর্ষিত হও'-তা বর্ষিত হবে। মেঘমালাকে আদেশ দেবে, 'অমুক দেশের দিকে যাও', তৎক্ষণাৎ তা সেদিকে চলে যাবে। পৃথিবীর বাষ্পসমূহ তার আদেশে আকাশের দিকে উত্থিত হবে। ভূমি যতই লোনা ও ক্ষারযুক্ত হোক না কেন কেবল তার ইঙ্গিতেই উত্তম ও সবচেয়ে উন্নতমানের ফসল উৎপন্ন করবে। মোটকথা, যেভাবে খোদা তা'লার মহিমা হলো,
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ [অর্থ: 'নিশ্চয় তাঁর ব্যাপার এমনই যে যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন সে বিষয়ে বলেন 'হয়ে যা'। অতএব সেটি হয়েই যায়।'

(সূরা ইয়াসিন: ৮৩)– অনুবাদক]। অনুরূপভাবে দাজ্জালও নাকি كُن فَيَكُونُ দ্বারা সবকিছু করে দেখাবে। কাউকে মৃত্যু দেওয়া, জীবিত করা সবই তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। বেহেশত ও দোযখ তার সঙ্গে থাকবে। মোটকথা, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে এবং এক সময়কাল পর্যন্ত সে সুষ্ঠুভাবে তার ইশ্বরত্বের কাজ চালাতে থাকবে যা চল্লিশ বছর বা চল্লিশ দিন হবে। ঐশ্বরিক সব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তার হাতে প্রকাশ পাবে।

এখন আমি জিজ্ঞেস করি, এ হাদীসটির বাহ্যিক শব্দাবলি থেকে যে বিষয়বস্তু প্রকাশ পায় বা প্রতিভাত হয় তা কি সেই তৌহিদ বা একত্ববাদের শিক্ষাসম্মত যা কুরআন করীম আমাদের দিয়ে থাকে? কুরআন মজীদের শত শত আয়াত কি এ চিরস্থায়ী ও স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তটি আমাদের শুনায় না যে, মরণশীল ও অন্তঃসারশূন্য মানব কখনো খোদার কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে না? অতএব হাদীসটির শব্দাবলিকে বা এ বিষয়টিকে যদি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে নেয়া হয় তবে তা কি কুরআন ঘোষিত তৌহিদের ওপর এক কলঙ্কের টিকা লেপন করে না?

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের একত্ববাদী ভাইয়েরা একদিকে গর্বের সাথে বলেন যে, আমরা সর্বতোভাবে শিরক থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। অংশীবাদিতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছি। অন্যেরা সবাই মুশরিক ও বেদা'তের পূজারি। আমরাই কেবল একত্ববাদী ও সুন্নতের অনুসারী। সবার সামনে তারা সগর্বে তাদের এই তৌহিদবাদী পন্থার সবিশেষ প্রশংসাও করে থাকেন। আবার একই সাথে এমন সব অংশীবাদীতাপূর্ণ বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল রয়েছে যে তারা একজন তুচ্ছ (খোদা ও রসূলের অস্বীকারকারী) কাফিরকে তথা দাজ্জালকে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের গোটা সিংহাসন ও মুকুট সঁপে দিয়েছে! একজন দুর্বল ভিত্তির মানুষকে তার মাহাত্মে ও ক্ষমতায় খোদা তা'লার সমকক্ষ বলে ধরে নিয়েছে! আওলিয়াদের 'কিরামত' বা নিদর্শন সমূহের অস্বীকারকারী হয়ে বসেছে কিন্তু দাজ্জালের কিরামতের কলেমা পাঠ করছে। কোনো ব্যক্তি যদি তাদের বলে যে সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (কুদ্দিসা সিররুহু) ডুবন্ত নৌকা বারো বছর পর জীবিত আরোহীসহ (নদীগর্ভ থেকে) বের করে এনেছেন আরেকবার রাগান্বিত হয়ে তিনি মৃত্যুর ফেরশ্‌তা বা আজরাঈলের পা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন কেননা সে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কোনো মুরিদের 'রূহ্' কবজ করে নিয়ে গিয়েছিল তাহলে এসব কিরামত তারা কখনো মেনে নেবেন না বরং এসব বিবরণ সম্বলিত মুনাজাতকারীদের তাঁরা মুশরিক বলে আখ্যায়িত করবেন।

কিন্তু অভিশপ্ত দাজ্জাল সম্পর্কে তারা প্রকাশ্যে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, শুধু 'মালাকুল মওত' কেন, সকল ফিরিশতা যারা পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে চন্দ্র, সূর্য, মেঘপুঞ্জ, বায়ুমণ্ডল

ও নদনদী ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত আছে সবাই দাজ্জালের আজ্ঞাবহ হবে এবং পরম আনুগত্যের সাথে তার সামনে সেজদাবনত হবে! এটি যে কত বড়ো শিরক তা একটু ভেবে দেখা উচিত। এর কোন সীমা বা কূলকিনারা আছে কি? আক্ষেপ! এ সকল লোকের হৃদয়ের ওপর এ কেমন পর্দা পড়ে গেল যে তারা রূপক কথাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে শিরকের এক প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে?! জোরালো সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এসব রূপক বিষয়গুলো গ্রহণ করা পছন্দ করে নি যদিও সেসবের সমর্থনে কুরআন মজীদ তৌহিদের নগ্ন তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান।

আক্ষেপ! অধিকাংশ মানুষ কাঠমোল্লাদের অনুসরণ করে থাকে এবং জানে না, এরূপ বিষয়াবলিকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে কত বিপত্তি দেখা দেবে। সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য নিবেদিত), যিনি আমাদে لا إله إلا الله -এর (তথা তৌহিদের) শিক্ষা দান করে আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুর যাবতীয় শক্তিকে আমাদের পদানত করেছেন এবং একজন মহাপরাক্রমশালী উপাস্যের আঁচল ধরিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত কিছুর মূল্য একটি মৃত কীটের চেয়ে তুচ্ছ ও নিম্নতর বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেই মহাপবিত্র নবী (সা.) কি আমাদের ভয় দেখানোর লক্ষ্যে শেষ যুগের জন্য এই 'জুজু' ছেড়ে গেছেন?!

পুনরায় বলছি, একত্ববাদীদের সেই সম্রাট (সা.) যিনি আমাদের শিরায় শিরায় ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বকালের জন্য (এ শিক্ষা ও বিশ্বাস) সঞ্চারিত করেছেন যে, খোদা তা'লার ঐশ্বরিক শক্তিনিচয় কোনো সৃষ্টজীবে থাকতে পারে না, তিনি কি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার বিপরীতে আমাদের এমন পাঠ দেয়া আরম্ভ করেছেন? অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! নিশ্চিত জেনে নাও যে, এ হাদীসের বা অনুরূপ হাদীসের অর্থ মোটেই আক্ষরিক হতে পারে না। জোরালো সাক্ষ্য ও প্রমাণসমূহ এক নগ্ন তরবারি নিয়ে এগুলোর দিকে যেতে বাধা দিচ্ছে। বরং এ সব হাদীস সেসব কাশফ বা দিব্যদর্শনের শ্রেণিভুক্ত, যার প্রত্যেক শব্দ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেভাবে আমি সহীহ্ মুসলিমের অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত করে একটু আগেই প্রমাণ করে এসেছি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন যে তাঁর এ যাবতীয় বর্ণনা তাঁর কাশফ ও দিব্যদর্শনের অন্তর্গত। দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীসটিতেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে যে 'কা-আন্নি' ('যেন আমি') খণ্ডবাক্য রয়েছে, এটিও উদাত্ত কণ্ঠে বলছে যে, এ যাবতীয় বিষয় স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত যার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক আর মোল্লা (ইমাম) আলী ক্বারীও তা-ই লিখেছেন। বস্তুত খোদা তা'লার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম পবিত্র কুরআনের আয়াত: خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا [অর্থ: 'মানুষকে দুর্বল করে

সৃষ্টি করা হয়েছে।' *(সূরা আন নিসা: ২৯)*– অনুবাদক] অনুযায়ী মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতার সপক্ষে প্রকাশ্য ও সরব সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। যা কোনো মনুষ্য সন্তানের ক্ষেত্রে এরকম শক্তিমত্তার অধিকারী হওয়ার কথা স্বীকার করে না যে, সে বাতাসের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে ভ্রমণে সক্ষম হবে আর আকাশের সব নক্ষত্র ও পৃথিবীর সব অণু-পরমাণু তার আজ্ঞাবহ হবে!!

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নিজেই বলেছেন যে এ হাদীসটির বিষয়বস্তু স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে, কেনইবা অনর্থক এর আক্ষরিক অর্থের ওপর জোর দেয়া হবে এবং কেন স্বপ্নের ন্যায় এর অর্থ করা হয় না? অথবা সাদৃশ্যমূলক বা দ্ব্যর্থবোধক দিব্যদর্শনের ন্যায় এর মূলতত্ত্ব খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেয়া হয় না? জাকারিয়ার পুস্তককে দেখ যা (তওরাতে) মালাকি (নবীর পুস্তক)-এর পূর্বে রয়েছে– এতে এ প্রকারের দিব্যদর্শন লিপিবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এগুলোর আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ করে না। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার সঙ্গে হযরত ইয়াকুবের কুস্তি লড়ার বিবরণ তওরাতে লেখা আছে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সে কাশফ বা দিব্যদর্শনটিকে কখনো বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারে না।

অতএব হে ভ্রাতাগণ! আমি নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাদের প্রতি এবং নিজ প্রিয় দ্বিনে ইসলামের প্রতি আমার পরম সহানুভূতির প্রেরণায় আপনাদের বোঝাচ্ছি। আপনারা একতরফাভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিব্যদর্শনসমূহকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে সীমাবদ্ধ করে ভুল করেছেন বরং মারাত্মক ভুল করেছেন। নিশ্চিত জানবেন যে, এসব বিষয়কে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা নিজেদের ঈমানী সৌধের ইট খুলে ফেলার মতো বিষয়। আমি বিস্মিত যে, আপনারা রূপক বিষয়াদি যদি গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে কেন এই বোধগম্যাতীত বিষয়াবলির তফসীর ও ব্যাখ্যাকে খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেন না? এতে আপনাদের ও আপনাদের ধর্মীয় উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার কিবা ক্ষতি হতো? কেবা আপনাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে? অথবা কবে এবং কখনই-বা আপনাদের মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাকিদ করা হয়েছে যে 'অবশ্য-অবশ্যই তোমরা এরকম শব্দাবলি কেবল বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করবে?

আপনাদের এই অজুহাতটি একটি অদ্ভুত অজুহাত যে, এ বিষয়ে অতীতের বুযূর্গানে উম্মতের 'ইজ্‌মা' তথা ঐকমত্য রয়েছে– যা উপস্থাপন করতে গিয়ে আপনারা চিন্তা করেন নি যে, কোনো 'ইজ্‌মা' আছে বলে ধরে নিলেও তা কেবল বাহ্যিক শব্দাবলির ওপর হয়ে থাকবে, এমনটি কখনো হয় নি যে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হলফ করে এ অঙ্গীকার করবে যে, এ হাদীসটির শব্দাবলি থেকে

যে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ প্রতীয়মান হয় প্রকৃতপক্ষে কেবল তাই বুঝায়! কিন্তু এমনটি কখনো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এসব পুণ্যাত্মারা এ উল্লিখিত হাদীসগুলো 'আমানত' তথা তাদের কাছে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে) তুলে দিয়েছেন এবং এগুলোর প্রকৃত অর্থের বিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এ বুযূর্গদের প্রতি ইজ্‌মার অপবাদ এমন অলীক ও ভিত্তিহীন যে এর কোনো প্রমাণ পেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বলছি, 'ইজমা' তো দূরে থাক এ শ্রেণির হাদীসগুলো সাধারণভাবেও সাহাবীদের মাঝে বিস্তার লাভ করে নি। পরিষ্কার কথা, সকল সাহাবীর যদি একথার ওপর ঐকমত্য হতো যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল শেষ যুগে বের হবে এবং হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ.) তাকে বধ করবেন, তাহলে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সামনে কেনই বা বলবেন যে ইবনে সাইয়াদই আগমনকারী প্রতিশ্রুত দাজ্জাল?

সে অবশেষে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে মদীনা মনোয়ারায় মারা যায়। হে ভ্রাতাগণ! এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম উভয় গ্রন্থে লেখা রয়েছে। তাছাড়া আবু দাউদ ও বাইহাকীতে হযরত নাফে' (রা.) বর্ণিত হাদীসেও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত উমর কসম খেয়ে বলতেন, 'খোদার কসম! এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এই ইবনে সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। ভালো কথা, এ শেষোক্ত হাদীসটির কথা বাদ দিন, কেননা তিনি হলেন কেবল একজন সাহাবী! হয়ত তিনি ভুল করে থাকবেন! কিন্তু পূর্বোক্ত সেই হাদীসটির সম্পর্কে কী অজুহাত দেখাবেন যা আমি এখনই উল্লেখ করলাম?– যাতে হযরত উমর (রা.) নিজে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সকাশে কসম খেয়ে বলেছিলেন, 'প্রতিশ্রুত দাজ্জাল এই ইবনে সাইয়াদই' আর তা শোনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নীরব থেকে এবং অস্বীকার না করে সেই কসমের সত্যতায় মোহরাঙ্কিত করেন এবং হযরত উমরের অভিমতের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

সাহাবীদের মাঝে হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা যে কত বড়ো তা জানেন কি? এমন কি কখনো কখনো তাঁর রায় বা অভিমতের অনুকূলে কুরআন করীমের আয়াত অবতীর্ণ হতো। তাঁর পক্ষে এ মর্মে পবিত্র হাদীস রয়েছে যে, 'শয়তান উমরের ছায়া দেখলেও পালায়।' দ্বিতীয়ত এ হাদীসটিও রয়েছে; 'আমার পরে কোনো নবী আসার থাকলে উমর (নবী) হতেন।' তৃতীয়ত এ হাদীসটিও রয়েছে: 'পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে 'মুহাদ্দাস'রা (তথা ওহী-এলহাম বা ঐশীবাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ) ছিলেন। আমার উম্মতে 'মুহাদ্দাস' থেকে থাকলে তিনি হলেন উমর।' এখন ভেবে দেখুন, উমর (রা.)-এর উচ্চমর্যাদার সাথে হযরত নোওয়াস বিন সাম্'আন-এর কিবা তুলনা?!

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যে ব্যুৎপত্তি হযরত উমর (রা.)-কে দান করা হয়েছিল হযরত নোওয়াসের তার সাথে কী-বা তুলনা হতে পারে?! তদুপরি এ হাদীসটি হলো 'মুত্তাফাক আলাইহ্'– যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে (তাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে) লিপিবদ্ধ করেছেন। নোওয়াস বর্ণিত দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীসটি রয়েছে 'সহীহ্ মুসলিমে' দাজ্জালের যে পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে তা অযৌক্তিক ও খোদার একত্ববাদ পরিপন্থি। তা ছাড়া, হযরত উমর (রা.) কর্তৃক (ইবনে সাইয়্যাদের দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে) কসম খাওয়া এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তার কথা প্রত্যাখ্যান না করায় এটাই সাব্যস্ত হয় যে, নিশ্চয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এবং সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতেও প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ইবনে সাইয়াদই ছিল। 'শারহুস্-সুন্নাহ্' বর্ণিত হাদীস থেকেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, দীর্ঘকাল ব্যাপী সবসময় রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে ইবনে সাইয়্যাদের প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হওয়ার– বিষয়টি নিয়ে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন।

এখন ইবনে সাইয়্যাদের চিহ্নিত দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টি যখন এমন চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, এতে কোনো রকম সন্দেহ-শংসয়ের অবকাশ থাকল না, তখন এ ক্ষেত্রে স্বভাবত এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে দাজ্জাল যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই জন্ম লাভ করে এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্যে ভূষিত হয়ে পরিশেষে মদীনায় মারাও গেল তখন হযরত মসীহ্– যাঁর পুনরাগমনের মুখ্য উদ্দেশ্যই দাজ্জালকে বধ করা বলে ব্যক্ত করা হয়! তাহলে তাঁর হাতে কে নিহত হবে? কেননা দাজ্জাল তো থাকলই না– যাকে তিনি হত্যা করবেন? অথচ এই বিশেষ কাজটি তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে দিতে পারি না যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল (উল্লিখিত আক্ষরিক অর্থে) আখেরী যুগে আসার কথা সম্পূর্ণভাবে অসত্য।

এখন মোদ্দাকথা হলো, ইমাম মুসলিম পেশকৃত দামেস্ক সংক্রান্ত এ হাদীসটি স্বয়ং মুসলিমের আরেকটি হাদীস দ্বারা আস্থার অযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয় এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে রিওয়ায়াতকারী নোওয়াস বিন সাম্'আন ঐ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। ইমাম মুসলিমেরই অবশ্যকর্তব্য ছিল নিজহাতে তাঁর বর্ণিত হাদীসটির বিরোধ দূরীভূত করা, কিন্তু তিনি যে এ স্ববিরোধের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মুহাম্মদ বিন মুনকাদির বর্ণিত হাদীসটিকে একেবারে নিশ্চিত ও একান্ত নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট মনে করতেন এবং নোওয়াস বিন সাম্'আন বর্ণিত হাদীসটিকে উপমা ও রূপকের শ্রেণিভুক্ত বলে বিশ্বাস করতেন, এর মূলতত্ত্ব ও প্রকৃত মর্ম খোদা তা'লার হাতে ন্যস্ত করতেন।

মোটকথা, হে ভ্রাতাগণ! এ হাদীসসমূহে দৃষ্টিপাতে প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, ইসলামের প্রারম্ভিককালে মানুষ প্রতিশ্রুত দাজ্জাল সম্পর্কে কখনো এ মর্মে মতৈক্য রাখতেন না যে দাজ্জাল শেষ যুগে আবির্ভূত হবে এবং হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হয়ে তাকে হত্যা করবেন। বরং তাঁরা তো (ইহুদী বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি) ইবনে সাইয়াদকেই চিহ্নিত দাজ্জাল বলে বিশ্বাস করেছিলেন।

জানা কথা যে, নিজেদের জীবদ্দশায় তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন, সে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, এরপর এ-ও দেখেছেন যে সে মদীনা মনোওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেছে আর মুসলমানগণ তার জানাযার নামায আদায় করেছেন। এতকিছু সত্ত্বেও বুযুর্গ সাহাবীদের এ বিশ্বাস পোষণ করা কীভাবে সম্ভব ছিল যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম শেষ যুগে চিহ্নিত দাজ্জালকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন? কেননা এ সকল বুযুর্গ তো পূর্বেই প্রতিশ্রুত দাজ্জালের মৃত্যুবরণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এরপরও ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে কী করে এ বিশ্বাসটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে যে, হযরত মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ ও চিহ্নিত দাজ্জালকে বধ করার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন?! এটাতো প্রকাশ্যভাবে দু'টি স্ববিরোধের সমাহার। কোনো বুদ্ধিমান ও বস্তুবাদী ব্যক্তি এরকম দু'টি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। এখন ভেবে দেখা উচিত, আখেরী যুগে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ও মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (যুগপথ) আবির্ভাব হবে বলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত ছিল– এ বর্ণনাটি এ সকল পুণ্যাত্মাদের অনেক বড়ো ভিত্তিহীন অপবাদ!

এছাড়া এ-ও ভাবা উচিত, 'সকল নবী নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে সতর্ক করে এসেছেন এবং আমিও তোমাদের সবাইকে সতর্ক করছি যে দাজ্জাল শেষ যুগে বের হবে'– এ কথা যদি সত্যিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে থাকেন, তাহলে সকল সাহাবায়ে কেরামের উচিত ছিল এই উপদেশ ও বার্তাটি অন্যদের কাছে পৌঁছানোর অবধারিত দায়িত্ব হিসেবে 'তাবেয়ীন'-দের কাছে পৌঁছে দেয়া; যার ফলে আজ সহস্র সহস্র সাহাবার বর্ণনা সূত্রে এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বিদ্যমান থাকতো।

অথচ নোওয়াস বিন সামা'আন এবং অন্য দুই একজন ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। বরং এটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নোওয়াস বিন সাম'আন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। অতএব ভেবে দেখুন, একদিকে বলা হয় যে, এ হাদীসটির সম্পর্কে মোটের উপর সকল সাহাবাকে তাকিদ করা হয়েছিল, 'তোমরা সবাই এ বিষয়টি তাবেয়ীনদের পৌঁছে দিও' অপরদিকে আমরা যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দু'একজন ছাড়া আর কাউকে তা পৌঁছাতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায় যে-পরিমাণ দুর্বলতা এ হাদীসটিতে দেখা যায় তা গবেষকদের দৃষ্টি থেকে আদৌ

গোপন থাকতে পারে না। তথাপি এ হাদীসটির সম্পর্কে 'তাওয়াতর' বা বিভিন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ব্যাপকভাবে বর্ণিত বলে দাবি করা চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন মনমানসিকতা ছাড়া আর কী হতে পারে?!

অতএব হে লোকসকল! আপনারা খোদাকে ভয় করুন এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের ওপর এমর্মে অপবাদ আরোপ করবেন না যে, তাদের সবার এ বিষয়ে 'ইজমা' ছিল যে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং খোদার মতো নিদর্শন প্রদর্শনকারী এক চোখ কানা দাজ্জালকে বধ করবেন। এ বিশ্বাস সম্পর্কে বস্তুতপক্ষে সেসব পুণ্যাত্মারা জানতেনই না। তাঁরা যদি এ সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন আর কোনো কোনো হাদীসের বিধৃত কথা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁদের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে থাকতেন তাহলে এটা কি সম্ভব ছিল যে সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীনের কাছে বার্তা পৌঁছানোর অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব পালন করতেন না আর তাবেয়ীন-তবাতাবেয়ীনদের এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'ওসীয়্যত' (বা তকিদপূর্ণ নির্দেশ) পালন না করা চরম অবাধ্যতার শামিল। কাজেই এমন অবাধ্যতামূলক পাপ জ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক কী করে সংঘটিত হতে পারতো? অতএব স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এ কথাটি অন্যদের পৌঁছানোর সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো তাকিদ করা হয় নি আর জ্যেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-ও এ বার্তা তাবেয়ীনের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সার্বিক উদ্দীপনায় মনোযোগী হন নি। এ হাদীসের বিষয়বস্তুও এমন বিরল ও এত স্বল্পপরিচিত ছিল যে ইমাম বুখারীর মতো হাদীস বিশারদদের নেতা এ হাদীসটি পান নি যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম দামেস্কের পূর্বদিকে মিনারার কাছে অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক বিশ্বজুড়ে যে-সব কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে চলেছে তা সবই দাজ্জাল সম্পাদন করে দেখাবে। এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এ হাদীসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইজমার দাবি করা এবং একথা বলা যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে ইসলামের সকল প্রথম সারির পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্য চলে আসছে– এটা কত বড়ো মিথ্যা রটনা! বরং এ হাদীসটি তো ঐ সব 'মুতাওয়াতির' তথা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারাই বিলুপ্তপ্রায় গণ্য হয় যেগুলোতে সর্বজনগ্রাহ্য পরম নির্ভরযোগ্য সাহাবীদের রেওয়ায়েতমূলে দাজ্জাল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে সে প্রকৃতপক্ষে ইবনে সাইয়াদই ছিল এবং সে নোংরা ইয়াজিদের রাজত্বকালে মদীনা মনোওয়ারায় মারা যায় এবং তার জানাযার নামায পড়া হয়।

এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার, কুরআন মজীদ তো ডাকঢোর পিটিয়ে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মারা যাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে, মুসলিম ও বুখারীর সহীহ্ হাদীসসমূহ সমস্বরে প্রকাশ করছে যে সত্যিকার অর্থে ইবনে সাইয়াদই চিহ্নিত দাজ্জাল ছিল, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো বুযুর্গ সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে কসম খেয়ে বলছেন, 'প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ইবনে সাইয়াদই বটে আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম নিজেও একথার সত্যায়ন করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইবন সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল; যে অবশেষে মুসলমান হয়ে যায় এবং ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মদীনায় ইহধাম ত্যাগ করে আর মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এ সকল মুসলমান ভ্রাতা জেদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে না।

হে ভ্রাতাগণ! এ বিতর্কিত বিষয়ের দুই পা ছিল। একটি হলো মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আখেরী যুগে সশরীরে আকাশ থেকে নেমে আসা। এটিকে কুরআন মজীদ এবং সেই সাথে কতিপয় পবিত্র হাদীস মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণের সংবাদ প্রদান করে ভেঙ্গে দিয়েছে। দ্বিতীয় পা হলো শেষ যুগে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়া সংক্রান্ত; এটিকে সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারী উভয় গ্রন্থে প্রধান প্রধান সাহাবী বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং ইবনে সাইয়াদকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে নির্ধারণ এবং পরিশেষে মুসলমানদের জামা'তভুক্ত করে তাকে মৃত্যুও দিয়েছে।

অতএব এ বিতর্কের পদযুগল যখন ভেঙ্গে গেল তখন তেরোশ বছর পর এখন আবার এই পাবিহীন মৃতটি কেন এবং কীসের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারে? اتقوا الله! اتقوا الله!! اتقوا الله!!! (অর্থ: আল্লাহ্কে ভয় করুন! আল্লাহ্কে ভয় করুন! আল্লাহ্কে ভয় করুন!– অনুবাদক)।

মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণ সম্পর্কে আমাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য প্রমাণসমূহ এতো বিপুল পরিমাণে রয়েছে যে, এগুলো এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে সবিস্তারে তুলে ধরা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে কুরআন করীমে গভীর দৃষ্টিপাত করুন আর একটু চোখ মেলে দেখুন, পবিত্র কুরআন কত পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে যা এতো স্পষ্ট ও অকাট্য যে, এর আমরা অন্য কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশ দেখি না। উদাহরণস্বরূপ, খোদা তা'লা কুরআন করীমে ঈসার কথা উদ্ধৃত করে বলেন: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ
[অর্থ: 'আর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন একমাত্র তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।' *(সূরা আল মায়েদা: ১১৮)*– অনুবাদক]।

এস্থলে আমরা কি 'তাওয়াফ্ফী' শব্দের 'ঘুম' বলে অর্থ গ্রহণ করতে পারি? এ অর্থ কি এ জায়গায় যথার্থ ও সমীচীন হবে (যেমন কিনা উলামা এ আয়াতের অর্থ করেন:) যে 'তুমি যখন (হে আল্লাহ্!) আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে আর গভীর ঘুমে আমাকে আচ্ছন্ন করলে তখন আমার ঘুমিয়ে পড়ার পর একমাত্র তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে'? এ অর্থ এস্থলে কখনো প্রযোজ্য হয় না। বরং 'তাওয়াফ্ফী' শব্দটির সোজা-সরল ও সঠিক অর্থটিই এখানে প্রযোজ্য আর তাহলো 'মৃত্যু'।* তবে মৃত্যু বলতে সেই মৃত্যু বুঝায় না যা (আলেমদের ধারণা অনুসারে) আকাশ থেকে নেমে আসার পর (তাঁর ওপর) আপতিত হবে। কেননা যে প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁর উম্মতের পথভ্রষ্ট হওয়ার সময়কার মৃত্যুর সঙ্গে উক্ত প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। খ্রিষ্টানরা কি এখন 'সিরাতে মুস্তাকীমে' প্রতিষ্ঠিত? এটা কি সত্য নয় যে, যে বিষয়ে খোদা তা'লা ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রশ্ন করেছেন সে বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্তই পূর্ণ রূপধারণ করেছে? এছাড়া, হাদীস অনুযায়ীও হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণ করা প্রমাণিত। যেমন 'তফসীর মাআলিম' গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় يٰعِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)* আয়াতের তফসীরে লেখা আছে: আলী বিন তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'এ আয়াতের অর্থ হলো: اِنِّیْ مُمِیْتُکَ (অর্থ: 'আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো')। এ আয়াতের উক্ত অর্থের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করে আল্লাহ্ তা'লার নিম্নের আয়াত সমূহ:-

১। قُلْ يَتَوَفّٰكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ – *[(সূরা আস সাজদাহ: ১২)* অর্থ: মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যু দেবে– অনুবাদক]।

২। اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ – *[(সূরা আন নাহল: ৩৩)* অর্থ: পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু দেয়– অনুবাদক]।

৩। اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ *[(সূরা আন নাহল: ২৯)* অর্থ: 'ফেরেশতারা তাদের এমতাবস্থায় মৃত্যু দেবে যখন তারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচারকারী হবে।'– অনুবাদক]। মোটকথা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর বিশ্বাস এটাই ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গিয়েছেন। দর্শকগণ অবশ্যই জানেন যে হযরত ইবনে আব্বাস কুরআন করীমের ব্যুৎপত্তি লাভে প্রথম সারির লোকদের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ এক দোয়াও রয়েছে।

** নবম টীকা ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

অতঃপর, এ 'মাআলিম' তফসীরগ্রন্থেই লেখা রয়েছে, 'ওহ্‌ব' হতে বর্ণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) তিন ঘণ্টার জন্য মারা গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে বর্ণিত, খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হলো তিনি সাত ঘণ্টা পর্যন্ত মৃতাবস্থায় ছিলেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের লেখক এজন্য বিস্মিত যে, সাত ঘণ্টা পর্যন্ত মৃত থাকা সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন ইসহাক খ্রিষ্টানদের কোন পুস্তকাদি থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন? কেননা খ্রিষ্টানদের সকল ফির্কার এ কথায় একমত বলে মনে হয় যে, তিনদিন পর্যন্ত মৃতাবস্থায় ছিলেন। এরপর কবর থেকে তাঁকে আকাশের দিকে ওঠানো হয়েছিল। চার ইঞ্জিল থেকেও এটাই প্রমাণিত। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) ইঞ্জিলসমূহে তিন দিনের জন্য তাঁর মৃত্যুবরণের কথা স্বীকার করেন।' যাইহোক না কেন তাঁর মৃত্যু প্রমাণিত। উল্লিখিত এসব প্রমাণ ছাড়াও তার মৃত্যুবরণ সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সর্ববাদী সম্মত মতৈক্য রয়েছে। ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণাদি তাঁর মৃত্যুবরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলিতেও ভবিষ্যদ্‌বাণীস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছিল।

অতএব ধারণা একেবারেই অসত্য ও অলীক যে মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা তাঁর সেই ভৌতিক দেহে প্রবেশ করে আর সেই দেহ জীবিত হয়ে আকাশে উত্থিত হয়! সমগ্র ঐশীগ্রন্থাবলির ঐকমত্যে এটা প্রমাণিত যে, সকল নবী ও আল্লাহ্‌র ওলীরা মৃত্যুবরণের পর পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠেন অর্থাৎ এক ধরনের জীবন তাঁদের দান করা হয়– যা অন্যদের দান করা হয় না। এ (গূঢ়তত্ত্বের) দিকেই সেই হাদীসটি ইঙ্গিত করে যাতে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "খোদা তা'লা আমাকে কবরে মৃতাবস্থায় থাকতে দেবেন না।* বরং জীবিত করে আমাকে তিনি নিজের দিকে ওঠাবেন (পুনরুত্থিত করবেন)। যুবুর: ১৬ শ্লোকেও হযরত দাউদ (আ.) হযরত দাউদ (আ.) 'ওহী ইলাহী' তথা ঐশীবাণীর আলোকে বলেন যে 'তুমি (হে খোদা!) আমার আত্মাকে কবরে থাকতে দেবে না এবং তুমি তোমার পবিত্র এ বান্দাকে বিকৃত হতে ও পচতে গলতে দিও না বরং তুমি আমাকে জীবিত করবে এবং নিজের দিকে উঠাবে'। অনুরূপভাবে শহীদদের স্বপক্ষেও কুরআন করীম বলে:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থাৎ 'খোদার পথে যারা নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত বলে মনে কোরো না, বরং তারা জীবিত; তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের রিযিক দান করা হয়।' *(সূরা আলে ইমরান: ১৭০)*

আরো একটি হাদীসও হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণ প্রমাণ করে। সেটি হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কিয়ামত

** দশম টীকা ২১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

কবে হবে (বা কবে আসবে)? তিনি বললেন, 'আজকের তারিখ থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সমস্ত মানবসন্তানদের ওপর কিয়ামত এসে যাবে।' এতে এ বিষয়ের দিকে ইশারা ছিল যে, সমসাময়িক লোকদের একজনও উল্লিখিত এই একশ' বছর কালের বেশি জীবিত থাকতে পারবে না। এ কারণেই অধিকাংশ আলেম ও সুফি-দরবেশরাও বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন যে, খিজারও মারা গেছেন। কেননা পরম সত্য সংবাদদাতা' (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীতে কোনো মিথ্যা অন্তর্নিহিত থাকার অবকাশ নেই বা বৈধ নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমাদের উলামা হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে উল্লিখিত এই কিয়ামতের গণ্ডিরও বাইরে রেখেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার, বনি ইসরাঈলের অন্যান্য নবীদের তুলনায় হযরত মসীহ্কে কেন বেশি মাহাত্ম্য দেওয়া হয়?! দৃশ্যত এমনটি প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাপকহারে খ্রিষ্টানরা যখন ইসলামধর্মে প্রবেশ করে এবং হযরত মসীহ্ সম্পর্কিত কিছু কিছু শিরকপূর্ণ ধ্যানধারণা নিজেদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে তখন আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ (তাদের সংস্পর্শে আসার কারণে) হযরত ঈসাকে সেই সব অযথা মাহাত্ম্য দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যা কুরআন করীম স্বীকার করে না। এই কারণে বিশেষত হযরত মসীহ্র প্রশংসার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে এমন বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয় যাতে ভারসাম্যের লেশমাত্র নেই। ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত যে, বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদা তা'লা এ অধমকে আদম (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেন। এর দরুন আলেমদের কেউ মনক্ষুণ্ন হন নি। এরপর নূহ (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি আখ্যা দিয়েছেন তাতেও কেউ দুঃখিত হন নি। এরপর ইউসুফ (আ.)-এর সদৃশ বলে আখ্যা দেওয়া হয়, তাতেও কোন মৌলবী সাহেবের রাগ হয় নি। এরপর হযরত দাউদের সদৃশ বলে আখ্যা দেওয়া হয় তাতেও আলেমদের কেউ মর্মাহত হন নি। এরপর এ অধমকে হযরত মূসার সদৃশ বলেও আখ্যায়িত করা হয় তবুও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোক ও মুহাদ্দিসদের মাঝে কেউ উত্তেজিত হন নি। এমন কি, এরপর আল্লাহ্ তা'লা এ অধমকে হযরত ইব্রাহীমের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেন তবুও কোনো ব্যক্তি এতটুকু রাগ ক্রোধও প্রকাশ করেন নি। এরপর এত সুনিশ্চিত অর্থে সদৃশ সাব্যস্ত করা হয় যে (এ অধমকে) বার বার 'ইয়া আহমদ'-এর অভিধায় সম্বোধন করে রূপক বা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে নবীকুল শিরোমণি ও মনোনীতদের নেতা হযতর আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেন তবুও আমাদের মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসদের কেউ কোন রাগ ও উত্তেজনা অনুভব করেন নি।

এরপর যখন খোদা তা'লা এ অধমকে ঈসা বা ঈসার প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করলেন তখন ক্রোধ ও রাগের আতিশয্যে সবার চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করল এবং ভীষণ উত্তেজনার বশে তাদের কেউ এ অধমকে 'কাফির' সাব্যস্ত করলো আর কেউ বা এ অধমকে 'মুলহিদ' আখ্যা দিল। যেমন– 'লাখুকে' নিবাসী মৌলবী সাহেবের পুত্র মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব এ অধমের নাম 'মুলহিদ' রেখেছেন এবং যত্র তত্র এ মন্তব্যও করেছেন যে, 'এ ব্যক্তি অত্যন্ত বাজে মানুষ। যেমন লাহোর জেলার শরকপুর নিবাসী এক ব্যক্তির কাছে বলে যে, এ ব্যক্তি মুলহিদ, অধর্মের অনুসারী, দুষ্ট এবং এমন নয় যার সাথে মেলামেশা করা যেতে পারে। এছাড়া এসব ক্ষেপাটে লোকেরা এখানেই ক্ষান্ত হন নি বরং তারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকেও এতদ্বিষয়ে কোন স্বর্গীয় সাক্ষ্য পাওয়ার জন্য অভিলাষ পোষণ করে (আর মনে করে যে,) এটি লাভ হলে খুব মজা হবে আরো জুতসই সাব্যস্ত হবে। অতএব তারা ক্রোধ ও ক্ষোভে ভরা হৃদয়ে 'ইস্তেখারা' (প্রার্থনা) করে। আর যেহেতু আদিকাল থেকে প্রকৃতিতে বিরাজমান খোদা তা'লা রীতি হলো, প্রবৃত্তির কামনা বাসনার বশবর্তী হয়ে কোন ব্যক্তি যখন কোন অদৃশ্যের সংবাদ উন্মোচিত হবার বাসনা পোষণ করে তখন শয়তান তার সেই অভিলাষে অবশ্যই নাক গলায় ও হস্তক্ষেপ করে থাকে; তবে নবী ও মুহাদ্দাসগণ ব্যতীত কেননা তাদের প্রতি অবতীর্ণ ওহী এলহাম শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্র রাখা হয়। অতএব এ কারণেই স্বনামধন্য মৌলবি আব্দুর রহমান সাহেব ও তাঁর সমমনা মিঞা আব্দুল হক্ব গাজনবীর ইস্তিখারার সময় পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত 'বি'সুল ক্বারীন' তথা অতি মন্দ সাথী (শয়তান) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় এবং তাদের মুখ দিয়ে জারি করা হয় যে, এ ব্যক্তি তথা এ অধম কিনা জাহান্নামী ও নাস্তিক এবং এমন কাফির যে কখনো হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। আমি জিজ্ঞেস করি, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বৈধ কি যে, যে বিষয়ে 'খায়রুল কুরূন' (তথা ইসলামের সর্বোত্তম তিন শতাব্দীর) লোকেরা মতৈক্য রাখত না এবং সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা' (বা সর্বসম্মত অভিমত) প্রমাণিত নয়, সে বিষয়ে এমন এক এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুফুরি ফতওয়া প্রদান করবে যার সত্যতার পক্ষে হয়ত পবিত্র কুরআন ও কতিপয় হাদীসও সাক্ষ্য দেয়? যাদের বোধবুদ্ধি আছে তারা অনুধাবন করতে পারবেন যে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তির মসীল বা প্রতিচ্ছবি হওয়া সম্পর্কে এ অধমের প্রতি অবতীর্ণ এলহাম হাদীস ও কুরআনের আদৌ পরিপন্থি নয় আর হাদীসগ্রন্থাবলিকেও কখনো নিরর্থক ও অকার্যকর সাব্যস্ত করে না বরং এগুলোর সত্যায়নকারী ও এসবের সত্যতা প্রকাশকারী বটে। অতএব এ কি সত্য নয় যে, কুরআন করীম মরিয়ম পুত্র হযরত সা (আ.)-এর মারা যাওয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায়

বর্ণনা করছে এবং স্বয়ং সহীহ্ মুসলিমের কতিপয় হাদীস প্রমাণ করছে যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জালও মৃত্যুবরণ করেছে? এমতাবস্থায় কুরআন করীম ও কতিপয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে এছাড়া অন্য কোন পন্থা খোলা রয়েছে কি যে, মরিয়ম পুত্র হযরত মসীহ্র অবতীর্ণ হওয়া বলতে তাঁর একজন বা একাধিক সদৃশের আবির্ভাব অর্থ করা হবে? এরপর 'এলহাম'ও যদি এদিকেই পরিচালিত করে তাহলে তা কুরআন ও হাদীস সম্মত বলে সাব্যস্ত হলো, নাকি বিরোধী সাব্যস্ত হলো!

এখন বাকি রইল নিজেকে কোন নবীর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি আখ্যায়িত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা? স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা উচিত, আপনারা এ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনুধাবন করতে পারবেন, দুনিয়াতে যত নবী প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা সবাই প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন যাতে মানুষ তাঁদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। আমরা যদি তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে তাদের প্রতিচ্ছবি হতে না পারি বরং এমন ধারণা পোষণ করলে মানুষ যদি কাফির ও নাস্তিক হয়ে যায় তাহলে নবীগণের আগমন বৃথা এবং তাদের প্রতি আমাদের ঈমান আনাও বৃথা। কুরআন করীম পরিষ্কার ভাষায় এ দিকনির্দেশনাই দান করে এবং উম্মুল কিতাব সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে 'মসীল' তথা প্রতিচ্ছবি হওয়া সম্ভব বলে আশ্বাস দেয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তাকিদ করেন, 'পাঁচবেলা আমার সমীপে দণ্ডায়মান হয়ে তোমরা নিজেদের নামাযে আমার কাছে এ দোয়া প্রার্থনা করো: (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) অর্থাৎ হে আমাদের 'রহমান ও রহীম' খোদা! তুমি আমাদের এমন হেদায়াত দান করো যাতে আমরা তোমার মনোনীত নবী আদম (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। আল্লাহ্র নবী শীসের প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। দ্বিতীয় আদম নূহ্ (আ.)-এর প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। 'কলীমুল্লাহ্' মূসা-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই আর 'রূহুল্লাহ্' ঈসা (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই এবং 'হাবীবুল্লাহ্' (আল্লাহ্র পরম প্রিয় বন্ধু) মহানবী আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই। এক কথায় জগৎজুড়ে যত সিদ্দীক ও শহীদ ছিলেন তাদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই।

এখন আমাদের আলেম সমাজ যারা 'মসীল' তথা প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবিকে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা বলে মনে করেন আর যে ব্যক্তিকে এলহাম ঐশীবাণীর মাধ্যমে অর্জনযোগ্য পদমর্যাদা লাভের সুসংবাদ দান করা হবে তাকে যাঁরা নাস্তিক, কাফির ও জাহান্নামী আখ্যা দেন তারা একটু ভেবেচিন্তে বলুন, সূরা ফাতিহার মহতী

এ আয়াতের যদি সেই অর্থ না হয়ে থাকে যা আমি পেশ করেছি তাহলে এর অন্য অর্থটি কী? এ অর্থ যদি এর প্রকৃত অর্থ না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' কেন বলেন?

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ *(সূরা আলে ইমরান: ৩২)* অর্থাৎ তাদের বলে দাও তোমরা যদি খোদা তা'লাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো যেন খোদা তা'লাও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের তিনি নিজ ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে নেন। এখন চিন্তা করা উচিত, মানুষ যখন একজন প্রেমাস্পদ বা প্রিয়ভাজনের অনুসরণ করার কারণে নিজেও প্রেমাস্পদে পরিণত হলো তখন সে কি সেই প্রেমাস্পদের সদৃশই হলো? নাকি অসদৃশ থাকল?

পরিতাপ! আমাদের বিদ্বেষপরায়ণ বিরুদ্ধবাদীরা একটুও চিন্তা করেন না যে, প্রভুর সন্ধানী ব্যক্তির জন্য এটিই তো উত্তম ও উৎকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা যা তাকে সংগ্রাম সাধনায় অনুপ্রাণিত করে। আর এটিই তো এক শক্তিশালী ইঞ্জিনস্বরূপ যা খোদাভীতি ও পবিত্রতা, আন্তরিক নিষ্ঠা ও অবিচল দৃঢ়তার উন্নত মার্গসমূহের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এটিই পিয়াস জাগানিয়া সেই অগ্নি যার দরুন পুণ্য পথযাত্রীর ভেতর বাইরে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। যদি এ লক্ষ অর্জন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই প্রকৃত পরম প্রিয় আল্লাহ্‌র সত্যিকার অন্বেষীরা জীবন্তই মরে যাবে। আজ পর্যন্ত যত বড়ো বড়ো সিদ্ধি লাভকারী সুফি গত হয়েছেন তাঁদের একজনেরও এ বিষয়ে মতবিরোধ নেই যে, এই মহতী ধর্ম ইসলামে নবীসদৃশ হওয়ার পথ খোলা রয়েছে। যেমন– স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রূহানী ও রাব্বানী উলামার জন্য এ সুসংবাদ দিয়েছেন: عُلَمَاءُ اُمَّتِى كَاَنْبِيَاءِ بَنِى اِسْرَائِيْلَ (অর্থাৎ 'আমার উম্মতের উলামা তথা প্রকৃত জ্ঞানীগুণিগণ হবে বনী ইসরাঈলী নবীগণের তুল্য'– অনুবাদক)।

আর হযরত বায়েজীদ বুস্তামীর (কুদ্দিসা সিররুহু) পবিত্র বাক্যাবলি "আমি আদম। আমিই শিস। আমিই নূহ্। আমিই ইব্রাহীম। আমিই মূসা। আমিই ঈসা। আমিই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা ইখ্‌ওয়ানিহি আজ্‌মায়ীন)।" এ ভিত্তিতেই 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য পুস্তকেও লেখা রয়েছে।

যদিও উল্লিখিত বাক্যসমূহের কারণে হযরত বায়েজিদ বুস্তামীকে (রহ.) সত্তর বার কাফির আখ্যা দিয়ে তাঁর নিজ শহর বুস্তাম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং মৌলবী মুহাম্মদের উত্তরসূরি উল্লিখিত মিঞা আব্দুর রহমানের মতো তারাও

বায়েজিদ (রহ.)-কে কাফির ও মুল্‌হিদ নামে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি করেছিল। কিন্তু সেই যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এমনভাবে তার প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে যার কোন সীমা নেই এবং নিজেদের শরীয়ত পরিপন্থি কথাবার্তারও অনুতাপসূচক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে।

অনুরূপভাবে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রণীত 'ফতুহুল গাইব' পুস্তকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে, মানুষ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ছেড়ে এর কবল থেকে মুক্ত হয়ে খোদার সত্তায় বিলিন হওয়ার কল্যাণে সকল নবী রসূলের সদৃশ বরং তাদেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়।

আর এ অধমের বন্ধু মৌলবী আবু সাইদ মোহাম্মদ হুসাইন বাটালবীও তাঁর প্রকাশিত 'ইশাআতুস্ সুন্নাহ' পত্রিকার ৭ম খণ্ডের ৭ম সংখ্যায় সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার বিষয়টির বৈধতা ও সম্ভাবতায় অনেক কিছু লিখেছেন। 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে এ অধমের পক্ষ থেকে, তার প্রতিশ্রুত মসীলে মসীহ্ হওয়া সম্পর্কিত যে দাবি লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসে এ অধম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণীস্বরূপ সংবাদ দেওয়া হয়েছে; শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব যদিও উল্লিখিত বিষয়ে খোলাখুলি কোন সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি কিন্তু এর সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কেননা বারাহীন গ্রন্থের 'রিভিউ' (পর্যালোচনা) লেখার অবস্থান থেকে এ প্রসঙ্গে তাঁর পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা এবং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানস্বরূপ কিছুই না বলা এরই জোরালো প্রমাণ যে, তিনি এ বিষয়েরও বিরোধী নন যে, এ অধম রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্– পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা 'বারাহীন' গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছিল যে এ অধম আধ্যাত্মিকভাবে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, যার সংবাদ আল্লাহ্ ও রসূল পূর্ব থেকে দিয়ে গেছেন। তবে ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে অন্য কোন প্রতিশ্রুত মসীহ্ও ভবিষ্যতে কোন সময়ে আবির্ভূত হতে পারেন– এ বিষয়ে আগেও অস্বীকার করা হয় নি এবং এখনো অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু এখনকার ও বারাহীনে আহমদীয়ার বর্ণনার মাঝে এটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, এলহামের সংক্ষিপ্ততা ও সবদিক না জানার দরুন পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়েছিল এবং এখন বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। যাহোক, মৌলবী সাহেব এ অধমের 'মসীহ্ সদৃশ' হওয়ার বিষয়ে সম্ভাব্য প্রমাণ অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবীর বক্তব্য এ বিষয়ের সমর্থনের উদ্দেশ্যে 'ফতুহাতে মক্কীয়া'-এর ২২৩ তম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করেন। সেই উদ্ধৃতিটি অনুবাদসহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে:

غاية الوصلة ان يكون الشيء عين ما ظهر ولا يعرف كما رأيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم وقد عانق ابن حزم المحدث فغاب احدهما فى الأخر فلم نرالا واحداً وهو رسول اللّٰه صلعم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالا تحاد (فتوحات مكية)

অর্থাৎ পরম মিলনের অর্থ হলো একটি জিনিসের হুবহু সেই জিনিস হয়ে যাওয়া যেটিতে তা প্রকাশিত ও দৃশ্যমান হয় কিন্তু স্বয়ং সেটিকে(অর্থাৎ মূল জিনিসকে) দেখা যায় না। যেমন– আমি স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখলাম তিনি মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মদ বিন হায্মকে আলিঙ্গন করেছেন। একজন অপরজনের সত্তায় একাকার হয়ে গেছেন, মহানবী ছাড়া আর কেউ দৃশ্যমান হলো না।" এরপর স্বনামধন্য মৌলবী সাহেব তাঁর কথার সমর্থনে নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত 'আত্হাফুন্ নুবালা' পুস্তক থেকে একটি রুবায়ী বা চার পঙক্তিবিশিষ্ট কবিতা অনুবাদসহ উদ্ধৃত করেন। সেটি নিম্নরূপ:

توهم واشينا بليل مزاره فهم ليسعى بيننا بالتباعد

فعانقته حتى اتحدنا تعانقا فلما اتانا ما رأى غير واحد

অর্থাৎ আমার কুৎসাকারী (প্রতিদ্বন্দ্বী) রাতে আমার কাছে আমার প্রেমাস্পদের আসার কথা টের পেয়ে আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করতে লাগল। অতএব আমি আমার প্রিয়কে গলায় জড়ালাম। এরপর সে হিংসুক এলো এবং আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না।" এরপর তিনি নিম্নরূপ ফার্সি পঙ্ক্তি দুটি উদ্ধৃত করেন:

جذبہ شوق بحدیست میاں و تو

اگر رقیب آمد اور شناخت نہیں مانتے تو

(অর্থ: 'আমাদের দুইজনার মাঝে পরস্পরকে পাওয়ার আবেগ যখন চরম মার্গে উপনীত তখন কুৎসাকারী প্রতিদ্বন্দ্বী আসে কিন্তু তোমার ও আমার মাঝে পার্থক্যসূচক চিহ্ন শনাক্ত করতে পারে নি।'– অনুবাদক)

এরপর তিনি দোয়াযুক্ত এ বাক্যটি লিখেন:

رزقنا الله من هذا الاتحاد فى الدنيا والآخرة

অর্থাৎ 'খোদা তা'লা ইহকাল ও পরকালে আমাদেরকে অনুরূপভাবে একাকার করে দিন।'

এরপর আমি মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণ সম্পর্কিত (আলোচনার) পরিশিষ্ট বর্ণনা করতে চাই। আর সেটি হলো, যদি এ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, যদিও পবিত্র হাদীস কুরআন ও ইঞ্জিলের আলোকে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যু প্রমাণিত কিন্তু সেই সাথে কুরআন মজীদে رَافِعُكَ إِلَيَّ (অর্থ: 'আমি তোমাকে আমার দিকে ওঠাবো'– অনুবাদক) শব্দগুচ্ছও তো রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, তিনি জীবিত হয়ে পুনরায় আকাশে উত্থিত হয়েছেন।

এই সন্দেহের অপনোদন হলো, رَافِعُكَ إِلَيَّ বাক্যটিতে কোথাও আকাশের কোন উল্লেখ নেই। এর অর্থ শুধুমাত্র এটুকুই যে, "আল্লাহ্ বলেন, হে ঈসা আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাবো'। এটি স্বতঃই প্রকাশিত যে পুণ্যবান ব্যক্তি যখন মারা যায় তাকে তাঁর দিকেই আধ্যাত্মিকভাবে উঠানো হয়। আল্লাহ্ কি দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন যেখানে হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসার আত্মা অবস্থিত? এছাড়া সেই সাথে কুরআন করীম এবং পবিত্র হাদীস অনুযায়ী প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) সন্দেহাতীতভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন এই প্রমাণের উপস্থিতিতে 'রাফা' শব্দের 'দেহসহ উঠানো' অর্থ করা চরম পর্যায়ের ভুল বইকি। বরং কুরআন করীমের উল্লিখিত আয়াতের প্রসঙ্গ বা পূর্বাপর আয়াত অনুযায়ী স্বতঃস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, ঈসা (আ.) মারা যাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ তার আত্মাকে আকাশের দিকে (ঊর্ধলোকে) উঠানো হয়। কারণ কুরআন করীমে স্পষ্টত লেখা রয়েছে যে, প্রত্যেক মু'মিন যখন মারা যায় তখন তার আত্মাকে খোদা তা'লার দিকে উঠানো হয় এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়। যেমন– আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي

অর্থাৎ– হে আল্লাহ্তে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের কাছে চলে এসো। তুমি তাতে সন্তুষ্ট, তিনিও তোমাতে সন্তুষ্ট। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" এই জায়গাটিতে 'মা আলীম' এর তফসীরকারক আয়াতটির তফসীর (ব্যাখ্যা) প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের ৯৭৫ পৃষ্ঠায় লেখেন: "আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, মু'মিন বান্দা যখন মৃত্যুর মুখে পতিত হয় তখন খোদা তা'লা তার কাছে দুইজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাদের সাথে বেহেশতের কিছু তোহফাও পাঠান। সেই ফেরেশতারা এসে তার আত্মাকে বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি সুরভিত ও সন্তুষ্ট অবস্থায় নিজ প্রভু প্রতিপালকের দিকে চলে এসো। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।' তখন সেই আত্মা মৃগনাভির সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পরম আনন্দদায়ক সুগন্ধির মতো বেরিয়ে আসে যা নাসিকায় প্রবেশ করে মন মস্তিষ্ককে সুরভিত করে। আর ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তে প্রান্তে ঘোষণা দিতে থাকেন: 'একটি

আত্মা আসছে, এটি অতি পবিত্র ও সুরভিত।' তখন আকাশের কোন দুয়ার এমন থাকে না যা তার জন্য অবারিত করা হয় না। আকাশের সব ফেরেশতা তখন তার জন্য প্রার্থনারত হন, এমনকি সে আত্মা আল্লাহ্‌র আরশের পায়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং খোদা তা'লার সমীপে সিজদাবনত হয়। অতঃপর মিকাইলকে আদেশ দেওয়া হয়, 'যেখানে অন্যান্য আত্মা রয়েছে সেখানে একেও নিয়ে যাও।"

এখন কুরআনের এ আয়াত এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণিত উল্লিখিত রিওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনের আত্মাকে তার অন্তর্ধানের পরে পরেই আকাশে (ঊর্ধ্বলোকে) পৌঁছানো হয়। যখন এ হলো বাস্তবতা তখন يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)* অথবা بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ *(সূরা আন নিসা: ১৫৯)*– আয়াতদ্বয়ের 'হযরত ঈসাকে দেহসহ আকাশে ওঠানো হয়েছিল' মর্মে অর্থ করা এটা নিছক স্বেচ্ছাচারিতা ও জোর খাটানোর শামিল। অথচ (কুরআন শরীফে) ইবনে আব্বাস বর্ণিত রিওয়ায়েত এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম কুরআনের পূর্বাপর ক্রমিক বর্ণনা অনুযায়ী مُتَوَفِّيكَ শব্দের অর্থ একমাত্র এটাই যে 'আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো।' আর এটাও স্বতঃস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের প্রাঞ্জল ভাষ্য অনুযায়ী মৃত্যুর পরে পরেই পুণ্যবান সৎ ব্যক্তিদের আত্মা তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে যায় এমন নয় যে মৃত্যুর ফেরেশতা মানুষের আত্মা 'কবজ' করে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ধরুন! আমরা যদি 'ওহ্‌ব' বর্ণিত এ মর্মের রেওয়ায়েতটি গ্রহণও করি যে, হযরত ঈসা তিন বা সাত ঘণ্টাব্যাপী মৃতাবস্থায় পড়ে ছিলেন তবে কি আমরা এ-ও মেনে নিতে পারি যে, তিন বা সাত ঘণ্টাব্যাপী 'মালাকুল মওত' ফেরেশতা হযরত ঈসার আত্মাকে নিজ মুঠোয় নিয়ে চেপে ধরে সেখানেই বসে থাকেন অথবা যেখানে যেখানে মানুষ তার শবদেহ বয়ে নিয়ে যায় 'মালাকুল মওত' ফেরেশতাও তার সাথে সাথে ঘুরতে থাকে কিন্তু আকাশের দিকে তাঁর আত্মাকে ওঠায় নি?– এরকম কাল্পনিক ধ্যানধারণা পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। যখন আবশ্যকীয়ভাবে এটাই মানতে হলো যে, সকল মু'মিনের আত্মাকে তাঁদের অন্তর্ধানের পর আকাশের দিকে ওঠানো হয়। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 'রাফিউকা ইলাইয়া' ('তোমাকে আমার দিকে উঠাবো')-এর অর্থ একমাত্র এটাই যে, হযরত ঈসা যখন মারা গেলেন তখন তখনই তাঁর আত্মাকে আকাশে ওঠানো হয়েছিল। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের জ্যোতি ও বিবেক নির্দ্বিধায় একথা বুঝে ও গ্রহণ করে যে, একজন মু'মিন ব্যক্তির মারা যাওয়ার পর শরীয়ত ও প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তার আত্মা আকাশের দিকে বা ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হওয়া আবশ্যক আর বিষয়টি অস্বীকার করা ধর্মের মৌলিক ও মুখ্য বিষয়াবলিকেই অস্বীকার করার শামিল। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর বিপক্ষে কোনো প্রমাণ

খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। হযরত ঈসা যদি অন্তর্ধানের পর প্রকৃতপক্ষে দেহসহ উত্থিত হয়ে থাকেন তাহলে কুরআন করীমে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি এরকম হওয়া উচিত ছিল: يا عيسىٰ انى متوفّيك ثم محييك ثم رافعك مع جسدك الى السماء অর্থাৎ 'হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত বা মৃত্যু দেবো এরপর তোমাকে জীবিত করব। তারপর তোমাকে তোমার দেহসহ আকাশের দিকে উঠাবো।'

কিন্তু এখন তো (আয়াতটিতে) مُتَوَفِّيكَ-এর পর কেবল মাত্র رَافِعُكَ ছাড়া অন্য কোন শব্দ পবিত্র কুরআন জুড়ে কোথাও পাওয়া যায় না। যা محييك-এর পরে থাকা উচিত ছিল। যদি কোন জায়গায় এসে থাকে তাহলে সেটি দেখানো উচিত। আমি দাবির সাথে বলছি, হযরত ঈসা প্রকৃতই মৃত্যুবরণ করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়ার পর সুনিশ্চিত এটাই মানতে হবে যে, যেখানেই رَافِعُكَ অথবা بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ শব্দগুচ্ছ রয়েছে সেখানেই এর অর্থ হবে হযরত ঈসার আত্মা উত্থিত হওয়া, যা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অতি আবশ্যকীয় বিষয়। আবশ্যকীয় বিষয়কে বাদ দিয়ে অনাবশ্যক বিষয়াদির ধারণা মাথায় স্থান দেয়া সর্বৈব অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। আমি বলে এসেছি যে, সকল নবী ও রসূলকে খোদা তা'লার দিকেই ওঠানো হয়ে থাকে।এখন আমি সুষ্ঠু ও সার্বিকভাবে প্রমাণ করে এসেছি যে, হযরত মসীহ্কে দেহসহ আকাশে উঠানো হয়েছিল– মর্মে বিশ্বাসটি কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা আদৌ প্রমাণিত হয় না। বরং এটি নিছক অবান্তর ও অলীক স্ববিরোধী রেওয়ায়াতের ওপর এর ভিত্তি বলেই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু দর্শন মনস্ক এ যুগটিতে যা জ্ঞানবুদ্ধির শিষ্টতা ও চিন্তাধারার প্রখরতায় বিকশিত, এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে ধর্মীয় সফলতা লাভের আশা রাখা বিরাট এক ভুল ছাড়া কিছু নয়। আফ্রিকার মরুতে বা আরবের মরুবাসী বেদুইনদের মাঝে অথবা সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এবং বন্য জনগোষ্ঠীর মাঝে যদি এসব অসার ও অর্থহীন কথাবার্তা ছড়ানো হয় তাহলে এগুলো হয়তো সহজেই বিস্তারলাভ করতে পারে। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী আর সেই সাথে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে (সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে) প্রমাণিত হওয়ার অযোগ্য বরং এর বিরোধী প্রমাণিত হচ্ছে; এমন সব ধ্যানধারণা শিক্ষিত লোকের মাঝে আমরা কখনো প্রচার করতে ও বিস্তার দিতে পারি না।

একই সাথে ইউরোপ আমেরিকার গবেষণামনস্ক লোকদের যারা নিজেদের ধর্মের অহেতুক বিষয়াবলির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে তাদের কাছে এ ধরনের জিনিস উপহারস্বরূপ পাঠাতে পারি না! নূতন নূতন জ্ঞানের আলো যাদের মন মস্তিস্ককে মানবীয় শক্তিবৃত্তিতে সমৃদ্ধ করেছে তারা এ ধরনের কথা কেনই-বা গ্রহণ করবে

যেগুলোতে খোদা তা'লা ও তাঁর তৌহীদের অবমাননা হয় এবং তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের ও তাঁর পবিত্র কিতাবের মূলনীতিসমূহ বাতিল ও ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়?

এক্ষেত্রে এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সশরীরে মসীহ্ (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বস্তুতপক্ষে তাঁর সশরীরে আকাশে ওঠা সংক্রান্ত মূল বিষয়ের শাখা বিশেষ। কাজেই হযরত মসীহ্ ইহজীবনে প্রদত্ত দেহ সহকারেই আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন– এ বিতর্কটিও হযরত মসীহ্র দেহসহ আকাশে উত্থিত হওয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিতর্কটির শাখাস্বরূপ হবে। বিষয়টি যখন এ রকমই সাব্যস্ত হলো, তখন প্রথমত সেই আকিদা বা বিশ্বাসটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার যেটি মূল বা আসল বলে নির্ধারিত হয়েছে, সেটি কতটুকু কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত। কেননা মূলের যদি যথাযথ নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাহলে এর শাখাটি মানতে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বই থাকবে না। কমপক্ষে সম্ভাব্যতাস্বরূপ হলেও আমরা গ্রহণ করে নিতে পারব যে, এক ব্যক্তির যখন মাটির দেহসহ আকাশে উঠে যাওয়া প্রমাণিত হয়েছে তখন সে দেহ সহকারেই ফিরে আসাতে সমস্যা কোথায়! বিতর্কের মূলটি যদি পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, বরং বাস্তব বিষয় যদি এর বিপরীত প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা শাখাকে কোনোভাবেই স্বীকার করে নিতে পারি না। যদি শাখার সমর্থনে কিছু হাদীসও থেকে থাকে তবু আমাদের ওপর অবশ্যকর্তব্য বর্তাবে আসলের সঙ্গে সেগুলোর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা। মূলের দৃষ্টিকোণ থেকে সে হাদীসগুলো যদি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে নেওয়া না যায় তাহলে আমাদের অবশ্যকর্তব্য হবে সেগুলোকে রূপক ও উপমামূলক (বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত) বলে গণ্য করা এবং হযরত মসীহ্র অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে কোন 'মসীহ্ সদৃশ' ব্যক্তির আগমন স্বীকার করা। যেমন স্বয়ং হযরত মসীহ্ (আ.) এলিয়া নবী সম্পর্কে স্বীকার করেছিলেন (যে, ইয়াহইয়া নবী 'এলিয়াসদৃশ' হয়ে প্রেরিত হয়েছেন)। অথচ ইহুদীদের এ বিষয়ে সর্ববাদী সম্মত ঐকমত্য ছিল এবং এখনো আছে যে, এলিয়া আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। স্মরণ রাখা আবশ্যক, এলিয়া নবীর আকাশে যাওয়া আর আকাশ থেকে কোন যুগে অবতীর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীরূপে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল আর মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীদের সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস এ যাবৎ এটাই যে, হযরত এলিয়া দেহসহ জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন এবং আখেরী যুগে তিনি সেই দেহসহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। সুতরাং এলিয়ার সশরীরে আকাশে যাওয়া (তওরাতের) 'রাজাবলি-২, অধ্যায়-২, ১১তম শ্লোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতঃপর তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি মালাকী নবীর সহীফার ৪র্থ অধ্যায় পঞ্চম

শ্লোকে ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ইহুদী এখনো অপেক্ষমান রয়েছে। মসীহ্‌র এ বাণী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদীদের সম্মিলিত অভিমত বা বিশ্বাসের পরিপন্থি ছিল যে "এলিয়া যাঁর আগমনের কথা ছিল তিনি এ ব্যক্তিই, অর্থাৎ ইয়াহইয়াই। এ কারণেই তারা মসীহ্ ও ইয়াহইয়া কাউকে গ্রহণ করে নি। কেননা তারা আকাশের পথপানে চেয়েছিল যে, কখন এলিয়া নবী ফেরেশতাদের কাঁধে ভর করে নেমে আসেন। যে-সব বড়ো সমস্যার তারা সম্মুখীন হয়েছিল তা হলো (এলিয়ার) সেভাবে অবতীর্ণ হওয়ার ওপর তাদের 'ইজমা' তথা ঐকমত্য হয়। আর বাহ্যিকভাবে রাজাবলি ও মালাকীর শব্দগুলো এরই প্রমাণ বহন করছিল। অতএব তারা উল্লিখিত পরীক্ষায় পড়ে হযরত ইয়াহইয়াকে গ্রহণ করে নি। বরং হযরত মসীহ্‌র নবুয়্যতকেও অস্বীকার করে। কেননা তাদের কিতাবসমূহে লেখা ছিল, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্‌র আগমনের পূর্বে আকাশ থেকে এলিয়ার অবতরণ আবশ্যক। অতএব আকাশ থেকে যেহেতু এলিয়ার অবতরণ সেভাবে সংঘটিত হয় নি যেভাবে তারা ধরে নিয়েছিল সেহেতু বাহ্যিকতা ও আক্ষরিকতার ধ্বজাধারিত্বের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে দুইজন সত্য নবী, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ ও হযরত ইয়াহইয়ার নবুয়্যত প্রত্যাখ্যান করতে হলো। ইহুদীগণ যদি বাহ্যিকতার ধ্বজাধারী হওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে তওরাতের রাজাবলি ও মালাকীর ভাষ্যগুলোকে উপমার ভাষায় ও রূপক অর্থে গ্রহণ করত তাহলে আজ ভূপৃষ্ঠে একজন ইহুদীও পরিদৃষ্ট হতো না। সবাই তারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হতো। কেননা রাজাবলি ও মালাকী সহীফাদ্বয়ে এলীয়া নবীর পুনরাগমন দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এটাই বুঝানো হয়েছিল যে, প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবি হিসেবে তিনি পুনরায় আসবেন যার মাধ্যমে ইয়াহইয়ার আগমন বুঝানো হয়েছিল যিনি প্রকৃতপক্ষে স্বীয় আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির দিক দিয়ে এলিয়ার সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি ছিলেন। ইহুদীরা তাদের দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার কারণে এ সকল আধ্যাত্মিক অর্থের দিকে দৃষ্টি দেয় নি এবং বাহ্যিকতার পূজায় লিপ্ত থাকে। একটু মনোযোগ সহকারে ভাবলে বুঝা যাবে যে, হযরত ইয়াহইয়াকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইহুদীরা যে পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিল, আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা কখনো সেরকম কোনো পরীক্ষায় নিপতিত হন নি। কেননা তওরাতের 'রাজাবলি-২', ২য় অধ্যায়ে পরিষ্কার ভাষায় এখনো লেখা রয়েছে যে, এলিয়া নবী সশরীরে আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছিলেন আর তাঁর চাদর ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়েছিল। এরপর মালাকি, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম শ্লোকে একইভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তিনি পুনরায় আসবেন এবং মসীহ্‌র জন্য পথ সুগম করবেন। কিন্তু আমাদের ভাই মুসলমানরা এসব জটিলতা থেকে একেবারে মুক্ত। কেননা

কুরআন করীমে সশরীরে ওঠানোর ইঙ্গিতটুকুও নেই। বরং মসীহ্‌র মৃত্যুবরণের কথা বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। যদিও কিছু হাদীসের ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতে বিচ্ছিন্ন সনদ সূত্রে স্ববিরোধে পরিপূর্ণ এমন উল্লেখ কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সাথে এ সকল হাদীসেই হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়ার স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে। এখন এটা স্পষ্ট যে, সংঘাত ও স্ববিরোধ সত্ত্বেও অযৌক্তিক অংশের দিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনই-বা কী?! যেখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সেই পথও খোলা বলে মনে হয় যাতে শরীয়ত ও যুক্তির দিক থেকে কোন আপত্তির লেশমাত্রও নেই, অর্থাৎ মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ ও তাঁর আত্মার উত্থিত হওয়ার বিষয়ে; সুতরাং আমরা কেন সে পথ অবলম্বন করব না যার প্রতি কুরআন করীমের 'বাইয়্যেনাত' তথা উজ্জ্বল যুক্তিপ্রমাণ জোর দিচ্ছে?

আমরা এলিয়া নবীর ঊর্ধ্বগমন ও অবতরণ সম্পর্কিত বৃত্তান্তটি এখানে এ উদ্দেশ্যে সবিস্তারে তুলে ধরেছি যাতে আমাদের ভাই মুসলমানরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন যে, যে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের জন্য তারা লড়তে মরতে উদ্যত তিনিই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং সে সিদ্ধান্তেরই কুরআন করীমও সত্যায়ন করেছে। আকাশ থেকে যদি সেভাবে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ না হয় যেভাবে এলিয়ার অবতরণের অসম্ভাব্যতার কথা হযরত মসীহ্ বর্ণনা করেছেন তাহলে তো হযরত মসীহ্ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী নন, বরং নাউযুবিল্লাহ্ মসীহের নবুওয়তের সত্যায়নকারী কুরআন করীমের ওপরও আপত্তি বর্তায়! এখন হযরত মসীহ্‌কে যদি সত্যনবী বলে মানতে হয় তাহলে তাঁর দেয়া সিদ্ধান্তকেও মানা আবশ্যক। হঠকারিতামূলকভাবে এটা বলা উচিত নয় যে, এ যাবতীয় সব কিতাবই প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত। নিঃসন্দেহে এই শ্লোকগুলো বা জায়গাগুলোর সঙ্গে প্রক্ষেপণের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তাই ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা উভয়পক্ষ এই সব ভাষ্য ও বর্ণনার সত্যতায় বিশ্বাসী।

তদুপরি আমাদের 'ইমামুল মুহাদ্দিসীন' তথা শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ হযরত ইসমাঈল (রহ.) তাঁর প্রণীত ও সংকলিত সহীহ্ বুখারীতে এ-ও লিখেছেন যে, এসব কিতাবে শব্দগত কোন পরিবর্তন হয় নি। এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য এবং আগেও আমি কয়েকবার বর্ণনা করে এসেছি যে, ঐশী গ্রন্থাবলিতে যত ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে এর সবকটির পেছনে উদ্দেশ্য হলো এক ধরনের পরীক্ষা নেয়া। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ভবিষ্যদ্‌বাণী যদি অতি পরিষ্কার ও স্বতঃস্পষ্টক্ষরে কোন নবী সম্পর্কে করা হতো তাহলে এরকম ভবিষ্যদ্‌বাণীর সর্বাধিক অধিকার রাখতেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কারণ হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আকাশ থেকে

নেমে আসার বিষয়টি অস্বীকার করা আবশ্যকীয়ভাবে কোন কুফুরি বা অবিশ্বাস নয়। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালত অস্বীকার করা হলে নিঃসন্দেহে সেই অস্বীকার চিরস্থায়ী জাহান্নামে পৌঁছাবে। কিন্তু দর্শকবৃন্দ জ্ঞাত হবেন যে, সমস্ত তওরাত ও ইঞ্জিলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আর তেমনি হযরত মসীহ্ (আ.) সম্পর্কেও এমন কোন স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভবিষ্যদ্‌বাণী খুঁজে পাওয়া যায় না, যার কারণে আমরা গিয়ে ইহুদীদের ঘাড় ধরে বসতে পারি। হযরত মসীহ্‌ও ইহুদীদের বার বার বলতে থাকেন, 'আমার সম্পর্কে মূসা (আ.) তওরাতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন।' কিন্তু ইহুদীরা সর্বদা তাঁকে এ উত্তরই দেয়, 'যদিও এটা সত্য যে, আমাদের গ্রন্থাবলিতে একজন মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তুমি নিজ চোখে দেখে নাও, মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কে আমাদের এ নিদর্শন দেয়া হয়েছে যে, তাঁর পূর্বে আকাশ থেকে অবশ্যই এলিয়া অবতীর্ণ হবেন যাঁর আকাশে যাওয়ার কথা তওরাতে 'রাজাবলি' কিতাবে বর্ণিত রয়েছে।' এর উত্তরে হযরত মসীহ্ যদিও একথাই বলতে থাকেন, 'সে এলিয়া হলেন যাকারিয়ার পুত্র ইউহান্না বা ইয়াহইয়া (আ.)।' কিন্তু এই কাল্পনিক ব্যখ্যার প্রতি কেবা কর্ণপাত করবে! ইহুদীরা তাদের ভাষ্যে আপাতদৃষ্টিতে সত্যের উপর ছিল বলে মনে হতো। কাজেই খোদা তা'লা এলিয়া নবীকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করে ইহুদীদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় সম্পূর্ণ দূর করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনি তেমনটি করেন নি, যাতে করে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয় পক্ষকে পরখ করা হয়। কেননা দুষ্টপ্রকৃতির লোক নিছক বাহ্যিক যুক্তির নিরিখে সন্দেহমুক্ত এমন ক্ষেত্রে ঘৃণ্যভাবে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু একজন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সত্যতা বুঝার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা অন্যভাবে করা যায় এবং একজন নবী যে তাঁর সত্যতার অন্যান্য যে চিহ্ন ও লক্ষণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন সেগুলোর আলোকে তাঁর প্রতি ঈমান আনা উচিত।

তবে এটা সত্য এবং একেবারে সত্য যে, 'রাজাবলি' ও 'মালাকি'-এর বর্ণনাগুলোকে মুসলমানরাও ইহুদীদের মতো বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে যাকারিয়া-পুত্র হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে ওই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতার প্রতীক ও সত্যায়নস্থল বলে সাব্যস্ত করতে পারবে না এবং এই প্যাঁচে পড়ে মরিয়ম পুত্র হযরত মসীহ্‌র নবুওয়তও কখনো প্রমাণিত হতে পারে না। কুরআন করীম আকাশ থেকে এলিয়া নবীর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছে এবং মসীহ্ ও ইয়াহইয়া উভয়কে সত্য নবী হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। নইলে কুরআন করীম যদি আকাশ থেকে এলিয়ার অবতীর্ণ হওয়াটাকে সেভাবেই গ্রহণ করত, অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে,

যেমন কিনা আমাদের ভাই মুসলমানগণ হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্কে ধারণা করে থাকে তাহলে কুরআন করীম হযরত মসীহ্‌কে কখনো নবী আখ্যা দিত না। কেননা 'রাজাবলি' ও 'মালাকি' হলো ঐশী কিতাব। এ জায়গাগুলোতে তাদের বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকলে সেগুলো পরিহার করার ফলশ্রুতিতে সেসব গ্রন্থ তুচ্ছ ও বেকার বলে সাব্যস্ত হবে। আমার বন্ধু মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব এ জায়গাটি নিয়ে ভাবুন। যদি বলা হয়, রাজাবলি ও মালাকি-এর এ জায়গাগুলো প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হওয়া– কি সম্ভব নয়? আমি এখনি লিখে এসেছি যে, এটি নিছক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা, কেননা উল্লিখিত জায়গাগুলো যদি প্রক্ষিপ্ত হতো তাহলে ইহুদীদের মোকাবিলায় হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের পক্ষ থেকে এটা উত্তম উত্তর হতো যে 'তোমাদের কিতাবগুলোতে এলিয়ার আকাশে যাওয়া এবং তারপর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যা কিছু লিখা আছে তা সম্পূর্ণ ভুল এবং এ জায়গাগুলো প্রক্ষিপ্ত।'

কিন্তু হযরত মসীহ্ এমন কোন অজুহাত না দেখিয়ে তিনি বরং উল্লিখিত জায়গাগুলোর সত্যায়ন করেছেন। তা ছাড়া ওই কিতাবগুলো যেভাবে ইহুদীদের কাছে মর্যাদাপূর্ণ ছিল সেভাবেই হযরত মসীহ্ এবং তার হাওয়ারীরাও এ কিতাবগুলো পাঠ করতেন এবং এগুলোর প্রতি যত্নবান ছিলেন। বস্তুত ইহুদীদের জন্য আমরা এমন কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখি না যা এ জায়গাগুলোকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার বিষয়ে তাদের প্রলুব্ধ করতো। মোটকথা মসীহ্ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষেত্রে এলিয়া সম্পর্কিত বৃত্তান্তটি ইহুদীদের পথে এমন পাথর রেখে দিয়েছে যে, তারা এখন পর্যন্ত সেই পথটিকে পরিষ্কার করে উঠতে পারে নি। এর ফলশ্রুতিতে তাদের মাঝে অসংখ্য মানবাত্মা অবিশ্বাস নিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তওরাতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন– যদিও দুটি জায়গায় এ রকম ভবিষ্যদ্‌বাণী পাওয়া যায় যা চিন্তাশীলদের সামনে প্রকাশ করে যে, এটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই লিপিবদ্ধ হয়েছে; অবশ্য যদি তারা ন্যায়পরায়ণ হয়। কিন্তু এগুলোতেও কুটতর্কের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন– তওরাতে লেখা আছে যে, হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে বললেন, "খোদা যিনি তোমার মহান খোদা, তিনি তোমার জন্য তোমারই মধ্য থেকে তোমারই ভাইদের মধ্য থেকে আমার মতো একজন নবী আবির্ভূত করবেন।" এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটিতে এ বিপত্তিগুলো রয়েছে যে, এ তওরাতেই কোন জায়গায় বনী ইসরাঈলকেই বনি ইসরাঈলের ভাই বলে লেখা হয়েছে আর কোন জায়গায় বনি ইসমাঈলকেও বনি ইসরাঈলের ভাই হিসেবে লেখা হয়েছে। সেই সাথে আবার অন্যান্য ভাইয়েরও উল্লেখ রয়েছে। এখন অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে এ কথার মীমাংসা কীভাবে

হবে যে, 'বনি ইসরাঈলের ভাইদের মাঝে' বলতে কেবল মাত্র বনি ইসমাঈলকেই বুঝায়? বরং 'তোমারই মধ্য থেকে'– যে খণ্ডবাক্য লেখা আছে তা বাক্যটিকে বেশি সন্দেহযুক্ত করে তুলে আমরা যদি অনেকগুলো জোরালো যুক্তিপ্রমাণ ও লক্ষণাবলিকে একত্র করে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও হযরত মূসার মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত করে একজন সত্যান্বেষীর উদ্দেশ্যে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে দেখাই যে, প্রকৃতপক্ষে এ স্থলে ভবিষ্যদ্‌বাণীটির সত্যায়নস্থল ও সত্যায়নকারী আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নয়। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটি এরূপ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট তো নয় যে, প্রত্যেক চরম অজ্ঞ ও আহাম্মক ব্যক্তিকেও এর মাধ্যমে আমরা মানতে বাধ্য করতে পারি বরং এটি বুঝার জন্য পুরো জ্ঞানবুদ্ধির দরকার এবং বুঝাবার জন্যও পুরো জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন। খোদা তা'লা যদি সৃষ্টিকে পরীক্ষা করতে না চাইতেন বরং ভবিষ্যদ্‌বাণীর সবদিক দিয়ে খোলাখুলি বিবরণই যদি ঐশী অভিপ্রায় হতো তাহলে এটি এভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল: 'হে মূসা! আমি তোমার পরে (খ্রিষ্টীয়) বাইশতম শতাব্দীতে আরবদেশে বনি ইসমাঈলদের মাঝে একজন নবী পয়দা করব– তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ এবং মাতার নাম হবে আমেনা এবং তিনি মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করবেন। আর এই হবে তার অবয়ব। এখন স্পষ্ট যে, তওরাতে যদি এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ হতো তাহলে কারও পক্ষে উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজন (বা অবকাশ) থাকত না এবং দুষ্কৃতপরায়ণদের সবার হাত-পা বাঁধা পড়ত। কিন্তু খোদা তা'লা এমনটি করেন নি। এখন প্রশ্ন হলো খোদা তা'লা কি এমনটি করে দেখাতে সক্ষম ছিলেন না? এর উত্তর এটাই যে, নিঃসন্দেহে সক্ষম ছিলেন। বরং তিনি চাইলে এর চেয়েও আরো অধিক পরিষ্কার ও স্পষ্ট বিবরণ লিখে দিতে পারতেন যাতে করে তাদের সবার মাথা ঝুঁকে যেতো এবং দুনিয়ায় কোন অস্বীকারকারী থাকতো না। কিন্তু তিনি এতো পরিষ্কারভাবে ও সবিস্তারে লেখা এজন্য পছন্দ করেন নি যে, সদাসর্বদা ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহে এক ধরনের পরীক্ষা করা তাঁর অভিপ্রেত হয়ে থাকে, যাতে বুদ্ধিমান এবং সত্যান্বেষীরা সেটি বুঝে নেন আর যাদের অন্তরে গর্ব, অহংকার, ত্বরাপ্রবণতা ও বাহ্যদর্শিতা রয়েছে তারা এটি গ্রহণে বঞ্চিত থাকে।

এখন নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন ইবনে মরিয়ম দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে দামেস্কের পূর্ব দিকে মিনারার কাছে অবতীর্ণ হবেন বলে যে, ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে সেটির অবস্থাও একই। কেননা যদি অবিকল সেভাবেই, অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটির পূর্ণ হওয়ার থাকে তাহলে এমনভাবে অবতরণ করার সময় জগদ্‌বাসীর মাঝে কেবা অস্বীকার করতে পারে? তাদের মাঝে কি কোন কাফির বা

অবিশ্বাসী থাকতে পারে? সারাবিশ্বে এখন যে-সব জাতি বসবাস করে তারা ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান, হিন্দু কি বৌদ্ধ বা তারকাপূজারি মোটকথা, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখুন! প্রকাশ্যভাবে কোন নবীকে আকাশ থেকে আপনারা যদি নামতে দেখতে পান আপনারা কি তা সত্ত্বেও তাঁর নবুওয়ত ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থাকবেন? নিঃসন্দেহে সব জাতির মানুষ এ উত্তরই দেবে, 'আমরা যদি ফেরেশতাদের কাঁধে হাত রেখে সে বুযূর্গকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখি তাহলে নিঃসন্দেহে ঈমান আনব।' অথচ আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কুরআন করীমে বলেন:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

অর্থাৎ 'আক্ষেপ সেই বান্দাদের প্রতি যাদের কাছে এমন কোন নবী আসে না যাকে নিয়ে তারা হাসিবিদ্রুপ করে না' *(সূরা ইয়াসিন: ৩১)*। অনুরূপভাবে কুরআন করীমের বহু জায়গায় লেখা আছে, এমন কোন নবী আসেন নি যাঁকে সবাই সর্বসম্মতভাবে মেনে নিয়েছে। এখন যদি হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে সত্যি সত্যি সেভাবেই (আকাশ থেকে) নেমে আসতে হয় যেভাবে উলামা বিশ্বাস করে বসে আছেন তাহলে জানা কথা যে, কোন একটি মানুষও অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের উলামাদের স্মরণ রাখা উচিত, এমনটি কখনো ঘটে নি এবং কখনো ঘটবে না। কেননা খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেন, 'আমি যদি ফেরেশতাদেরও পৃথিবীতে নবী নিযুক্ত করে পাঠাতাম তাহলে তাদের বিষয়টিও অস্পষ্টতা ও সংশয়মুক্ত রাখতাম না।' অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রেও সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ থাকত। জানা কথা যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার নিদর্শন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছেও চাওয়া হয়েছিল। আর তখন এই মু'জিযা প্রদর্শনের প্রয়োজনও খুব বেশি ছিল। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালত অস্বীকার করায় চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা এ নিদর্শন দেখান নি। বরং প্রশ্নকারীদের পরিষ্কার জবাব দেয়া হয় যে, এ পরীক্ষাগার তুল্য ভুবনে খোদা তা'লা এমন প্রকাশ্য ও খোলাখুলি মু'জিযা কখনো দেখান না, যাতে 'ঈমান বিল গাইব' তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধানটিতে ব্যতিক্রম না ঘটে। কেননা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে অবতরণ করতে দেখা গেলে আর ফেরেশতাও আকাশ হতে অবতরণ করতে চোখে পড়লে বিষয়ের পুরো মীমাংসা হয়ে গেল, কোন পর্দাই আর থাকলো না। তখন এমন হতভাগা কে হবে যে, তা অস্বীকার করবে? কুরআন করীম এমন সব আয়াতে পরিপূর্ণ যাতে বলা হয়েছে, ওই রকম খোলাখুলিভাবে মু'জিযা দেখানো খোদা তা'লার রীতি নয়! অথচ মক্কার

কাফিররা সর্বদা এরূপ মু'জিযা দেখাবার জন্যই দাবি জানাতো। আর খোদা তা'লা তাদের বলতেন, 'আমরা চাইলে আকাশ থেকে এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারি যার দরুন সকল কাফির ও অস্বীকারকারীর মাথা নত হয়ে যায়। কিন্তু এই পরীক্ষাগারে এরূপ নিদর্শন দেখানোর আমাদের রীতি নেই। কেননা এতে 'ঈমান বিল গাইব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস (এর বিধান) বিনষ্ট ও তিরোহিত হয়, যার ভিত্তিতে সব সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। অতএব হে ভ্রাতাগণ! কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে একান্তই হিতাঙ্ক্ষাস্বরূপ আপনাদের বুঝাতে চাই যে, এই অলীক ধ্যানধারণা থেকে নিবৃত্ত হোন এবং নিম্নোক্ত কারণ দুটির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন। এ দুটি বিষয় যে কত জোরালো ও স্পষ্টত দৃশ্যমান!

প্রথমত, এলিয়া নবীর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া, অর্থাৎ তিনি যে অবতীর্ণ হলেন সেটি কীভাবে ঘটল? দ্বিতীয়ত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনেও এ প্রশ্নটির উপস্থাপন এবং قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي *(সূরা বনি ইসরাঈল: ৯৪)* আয়াতটিতে এর উত্তর প্রদান। গভীর মনোনিবেশে চিন্তা করুন, এ আয়াতটি কি এ বিষয়টি বুঝাবার জন্য অতি জোরালো যুক্তি ও পর্যাপ্ত প্রমাণস্বরূপ নয়? এতে কি বুঝা যায় না যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বলতে আক্ষরিক অর্থে বাহ্যিকভাবে অবতীর্ণ হওয়া বুঝায় না বরং রূপকার্থে প্রতিচ্ছবি আকারে অবতীর্ণ হওয়া বুঝায়? আবহমান কাল থেকে আজ পর্যন্ত পূতপবিত্র ব্যক্তিরা এভাবেই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে এসেছেন এবং রূপক ভাষায় সর্বদা এটাই বলে এসেছেন যে, 'ইনি দ্বিতীয় আদম এসেছেন, ইনি দ্বিতীয় ইউসুফ এসেছেন বা ইনি দ্বিতীয় ইব্রাহীম এসেছেন'। কিন্তু মাটির দেহসহ কোন আদম সন্তানকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে এখন পর্যন্ত কেউ দেখে নি। অতএব যে বিষয়টি বিশ্ব জুড়ে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার রীতিনীতি বিরোধী এবং প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থি ও বিরোধী এবং বর্তমান ও দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার বিপরীত, সেটি মানার জন্য কেবল 'যয়ীফ' (দুর্বল), পরস্পর বিরোধী, সংকীর্ণ অর্থবোধক ও দুর্বোদ্ধ রেওয়ায়েতগুলোর দ্বারা কাজ চালানো যায় না। অতএব আপনারা এমনটি প্রত্যাশা করবেন না যে সত্যি সত্যি ও বাস্তবে সবার চোখে পড়বে যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে ফেরেশতারাসহ অবতীর্ণ হচ্ছেন। যদি এ শর্তসাপেক্ষেই উল্লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতি ঈমান আনতে হয় তাহলে এর প্রকৃতস্বরূপ সবার জানা, তিনি কখনো আকাশ থেকে ওভাবে নামবেন না এবং আপনাদের ঈমান আনাও হবে না। এমন যেন না হয় যে, বেলুনে আরোহণ করে কোন ব্যক্তি আপনাদের সামনে অবতরণ করলে আপনারা না আবার ধোঁকায় পড়ে যান। অতএব সাবধান থাকুন, ভবিষ্যতে আপনাদের এসব বদ্ধমূল

ধ্যানধারণার কারণে এরকম কোন অবতরণকারীকে ইবনে মরিয়ম মনে করে বসবেন না! এটি নিয়মের বিষয় ও একটি নীতিগত কথা, যে-ব্যক্তি সত্যকে অগ্রাহ্য করে তাকে আবার অন্য সময়ে মিথ্যা গ্রহণ করতে হয়। অতএব যে-সব দুরাত্মা ও হতভাগা লোক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অগ্রাহ্য করেছিল তারা অচিরে মুসাইলামা কায্যাবকে গ্রহণ করে, এমনকি ছয়-সাত সপ্তাহের মধ্যেই তাদের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায় যারা সবাই তার প্রতি ঈমান আনে।

অতএব খোদা তা'লাকে ভয় করুন এবং পৃথক পৃথকভাবে নিভৃতে বসে চিন্তাভাবনা করুন, এখন পর্যন্ত ঐশী রীতিনীতি কী ধারায় চলে এসেছে। আর এ-ও ভেবে দেখুন, সহীহ্ হাদীসসমূহে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কোথাও উল্লেখ নেই। শুধু 'নাযালা' (সে অবতীর্ণ হলো) বা 'ইয়ানযিলু' (সে অবতীর্ণ হবে) শব্দদ্বয় আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ দেয় না। ধরে নিন, যদি 'আকাশ' শব্দও থাকতো তবুও তা আমার উদ্দেশ্য বা আমার উপস্থাপিত অর্থের জন্য কোনভাবে ক্ষতিকর বা বিপত্তিকর ছিল না। কেননা তওরাত ও ইঞ্জিলেও এ রকম সূত্র বা শ্লোক বহুল সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় যেগুলোতে নবীদের সম্পর্কে লিখা আছে যে, তাঁরা আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। যেমন– ইউহান্নার ইঞ্জিলে হযরত ইয়াহইয়ার পক্ষ থেকে তাঁর এই উক্তিটি লিপিবদ্ধ রয়েছে: 'যেব্যক্তি ভূপৃষ্ঠের দিক দিয়ে আসে সে পার্থিব হয়ে থাকে এবং পার্থিব কথা বলে। আর যে আকাশ থেকে আসেন তার অবস্থান সবার ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ নবীদের বাণী অপরাপর বুদ্ধিমানদের উক্তির চেয়ে অগ্রগণ্য, কেননা নবী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন)'। দেখুন ইউহান্না, অধ্যায়: ৩, শ্লোক: ৩১। অতঃপর দ্বিতীয় উক্তিটি হলো: 'আমি আকাশ থেকে এজন্য অবতীর্ণ হই নি যে, নিজের ইচ্ছামত চলি (বা স্বেচ্ছাচারিতা করি)।' (ইউহান্না, অধ্যায়: ৬, শ্লোক ১১)। এরপর তৃতীয় উক্তিটি হলো: 'যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে ছাড়া কেউ আকাশে যায় নি' (ইউহান্না, অধ্যায়: ৩ শ্লোক ১৩)। 'আমরা অবতীর্ণ করেছি' অথবা 'এটি অবতীর্ণ হয়েছে' এ কথাটির কখনো এ অর্থ নয় যে, একে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কেননা কুরআন করীমে এ-ও বলা হয়েছে: 'আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি।' 'গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছি।'*

এখন এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, সমস্ত গবাদি জন্ম হয় পশুর প্রজনন প্রক্রিয়ায়। কোন ব্যক্তি ঘোড়া, গরু বা গাধা ইত্যাদি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে কখনো দেখে নি। অথচ

** একাদশ টীকা ২১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

এ স্থলে আক্ষরিকভাবে 'নুযুল' বা অবতরণ শব্দটি মওজুদ রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি এসব আয়াতের আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে না। অতএব এটি যখন জানা গেল যে, খোদা তা'লার কালামে এমন সব উপমা ও রূপক অর্থবোধক এবং ইশরা ও ইঙ্গিতমূলক শব্দাবলি স্পষ্টাকারে বিদ্যমান রয়েছে আর তাই স্পষ্টত রূপক ভাষাতেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা লোহা, পোশাক ও গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছেন আর এ দ্বারা অন্য কিছু বুঝানো হয়েছে। অতএব স্পষ্ট বিষয় যে, ঐশী রীতি হলো, কোন জিনিসের অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ অন্য কিছু হয়ে থাকে। ইনসাফ করা উচিত, হযরত মসীহ্র আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কথাটি কি লোহা এবং (গবাদি পশু ইত্যাদির অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত) এ আয়াতগুলোর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে?! বরং হযরত মসীহ্র অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কেবল কোন কোন হাদীস সূত্রে বিবেচিত এবং হাদীসগুলোও এমন যে, এগুলোতে 'আকাশে'র উল্লেখ নেই, কেবল 'অবতীর্ণ হওয়া' কথাটি লেখা আছে। কিন্তু গাধা ও গরু গবাদি পশুর অবতীর্ণ হওয়ার কথা কুরআন করীম স্বয়ং বর্ণনা করেছে। অতএব চিন্তা করে দেখুন! কোন দিকটি অগ্রাধিকার লাভের মর্যাদা রাখে? কেবল নাযেল বা অবতীর্ণ হওয়া বলায় যদি হযরত মসীহ্র আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক মনে করা হয় তাহলে এথেকেও বেশি স্পষ্টাকারে বর্ণিত রয়েছে গবাদি পশুর অবতীর্ণ হওয়ার কথা। কাজেই এ (আক্ষরিক) অর্থের ওপরই যদি ঈমান আনতে হয় তাহলে প্রথমে লোহা ও গবাদি পশু, গাধা ও গরুর ওপর এ মর্মে ঈমান আনুন যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষেই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে অথবা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য এমনটি করুন যে, (পবিত্র আয়াতে বর্ণিত) 'আনযালনা' (আমরা অবতীর্ণ করেছি) শব্দটিকে যা 'মাযী' তথা অতীতকাল সূচক ক্রিয়াপদে আছে এটি 'মুযারেয় ইস্তিকবাল' তথা ভবিষ্যৎকাল সূচক ক্রিয়ার অর্থে ধরে নিয়ে আয়াতটির এভাবে তফসীর করুন, 'আখেরী যুগে হযরত মসীহ্ যখন আকাশ থেকে নামবেন তখন একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা বহু সংখ্যক গাধা– বিশেষত বাহন হিসেবে ব্যবহার্য গাধা আর তেমনি অনেকগুলো গরু, ঘোড়া ও খচ্চর এবং লোহাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ করবেন', যাতে করে আয়াত ও হাদীসসমূহের অর্থের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধিত হয়!! নইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই আপত্তি করার অধিকার রাখে, কুরআন করীমের আয়াতসমূহের অর্থ কেন আক্ষরিক দিক থেকে রূপক অর্থের দিকে ঘোরানো হয়? আর হাদীসসমূহে হযরত ঈসার অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে যে একই শব্দাবলি রয়েছে সেগুলোর বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের ওপর কেন এত জোর দেয়া হয়? অথচ জোরালো যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হযরত মসীহ্ মাটির দেহসহ কখনো

আকাশে যান নি এবং আকাশ শব্দও আয়াতগুলোর কোথাও নেই। প্রথম আয়াতটি হলো يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)* আর দ্বিতীয়টি হলো: بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ *(সূরা আন নিসা: ১৫৯)*। এ দুটিরই অর্থ হলো, খোদা তা'লা মসীহ্কে মৃত্যু দেওয়ার পর নিজের দিকে উঠিয়ে নেন। পুণ্যবান বান্দার যখন মারা যান তাঁদের সম্পর্কেও যেমন সাধারণভাবে এটাই বলা হয় যে, অমুক বুযূর্গ ব্যক্তিকে খোদা তা'লা নিজ সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। যেমন, ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ ['হে আল্লাহ্তে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর দিকে চলে এসো' *(সূরা আল ফাজর: ২৯)*]– আয়াতটি এদিকেই ইঙ্গিত করছে। খোদা তা'লা তো সর্বত্র বিরাজমান। খোদা তা'লা 'হাযির নাযির' তথা সর্বত্র সব সময় উপস্থিত ও সবকিছু দেখেন। তিনি পার্থিব ও শরীরী কোন সত্তা নন। তাঁর কোন নির্দিষ্ট দিকও নেই। তথাপি কোন ব্যক্তিকে খোদা তা'লার দিকে ওঠানো হয়ে থাকলে তার সম্পর্কে কী করে বলা যেতে পারে যে, নিশ্চয় তার দেহ আকাশে পৌঁছে গিয়ে থাকবে? এ কথাটি সত্য হতে যোজন যোজন দূরে। বস্তুত সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ আত্মিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খোদা তা'লার দিকে উন্নীত হয়ে থাকেন। তাঁদের মাংস ও হাড়গোড় কখনো খোদা তা'লার সকাশে পৌঁছায় না। তিনি নিজেই একটি আয়াতে বলেন:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

অর্থাৎ "কুরবানীর পশুর রক্ত ও মাংস খোদা তা'লার সকাশে কখনো পৌঁছে না। বরং তাঁর সকাশে তোমাদের পক্ষ থেকে সৎকর্মের প্রকৃত প্রাণ বা নির্যাস পৌঁছে যা হলো খোদাভীতি ও পবিত্র চিত্ততা।" *(সূরা আল হজ্জ: ৩৮)*

গোটা এ বর্ণনাটি থেকে একজন সত্যান্বেষী এ বিষয়ে পুরোপুরি স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে যে, কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের যেখানে যেখানে কোন জড়দেহধারী বস্তুর 'আকাশ থেকে' নামা বা নামানোর কথা লেখা আছে– হযরত মসীহ্ হোন বা অন্যান্য জড়বস্তু সেসব জায়গায় এসব শব্দ বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে কখনো গ্রহণ করা হয় না। কাজেই আমাদের উলমাও কেবলমাত্র হযরত মসীহ্কে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সব জায়গায় বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থেই গ্রহণ করে থাকেন। কেবল মাত্র হযরত মসীহ্র সম্পর্কেই তাঁদের মনমস্তিষ্কে এমন জেদ ও উগ্রভাব আসন গেড়ে বসেছে যে, তারা তাঁকে তাঁর জড়দেহসহ আকাশে পৌঁছান এবং পরবর্তী কোন অজানা যুগে সেই দেহসহ আকাশ থেকে তাঁর নেমে আসায় তারা বিশ্বাস করেন।

খোদা তা'লা তাদের এহেন অবস্থায় দয়াপরবশ হোন, তারা আমাদের মনিব ও অভিভাবক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ এই মাকাম ও

মর্যাদার প্রতি লক্ষ করেন না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও কল্যাণরাজি যদিও তাঁর প্রতিই সর্বাধিক ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৈহিক 'রাফা' সম্পর্কে, অর্থাৎ তাঁকে দেহসহ মিরাজের রাতে আকাশে উঠানো হয়েছিল– এ সম্পর্কে প্রায় অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস তেমনই ছিল যেমন হযরত মসীহ্কে আকাশে ওঠানোর সম্পর্কে এ যুগের মানুষ (সাধারণভাবে) বিশ্বাস পোষণ করে, অর্থাৎ তাঁকে যেন তাঁর দেহসহ ওঠানো হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁকে দেহসহই নামানো হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা সে কথা স্বীকার করেন নি। তিনি বরং বলেন, এটি এক 'রুইয়া সালেহা' (সত্যস্বপ্ন) ছিল। আর এজন্য কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে নাউযুবিল্লাহ্ ধর্মদ্রোহী বিপথগামী আখ্যায়িত করেন নি এবং 'ইজমা'র পরিপন্থি কথা বলায় তাঁর ওপর হামলাও করেন নি। অতএব হে ন্যায় বিচারক ও সত্যান্বেষীগণ! হে খোদাভীরু বান্দার! এ স্থলে একটু থামুন এবং ধীরেসুস্থে ও প্রজ্ঞার সাথে গভীরভাবে চিন্তা করুন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সশরীরে আকাশে ওঠা এবং আবার সশরীরে নেমে আসা কি এমন একটি আকিদা বা বিশ্বাস নয় যাতে 'ইজমা' তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের আস্থা ছিল এবং কয়েকজন যাঁরা এর বিপক্ষে অভিমত পোষণ করেছেন, কেউ তাঁদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেন নি? কেউ তাঁদের খোদাদ্রোহী, পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত বলে আখ্যা দেন নি। এরপর এ-ও লক্ষ করা উচিত যে, আমাদের নবী (সা.)-এর সশরীরে মে'রাজের বিষয়টি হুবহু হযরত মসীহ্র সশরীরে আকাশে ওঠা ও আকাশ থেকে নেমে আসার মতো একই ধরনের ব্যাপার। এমন একটি সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার বিষয়ে কতিপয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা কর্তৃক আমার রায় বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা প্রকারান্তরে আমার মতেরই সমর্থন বটে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সশরীরে মে'রাজ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন প্রকৃতপক্ষে ও প্রকারান্তরে হযরত মসীহ্র কথিত দৈহিক 'রাফা' ও সশরীরে ঊর্ধ্বগমন সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই বটে। অতএব সকল এরূপ মু'মিন যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য, সম্মান ও মর্যাদাকে হযরত মসীহ্র সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে উন্নততর ও মহত্তর জ্ঞান করেন তাঁদের পক্ষে আদব ও শিষ্টাচারমূলক পন্থা হলো, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, ঐশী নৈকট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের যে মার্গ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য বৈধ নয় সেটি হযরত মসীহ্র জন্যও আরো অধিক অবৈধ হবে। কেননা যেখানে মুসলমানদের সাধারণ ধর্মমত ও বিশ্বাস হলো, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আখেরী যুগে একজন উম্মতী

হিসেবে আসবেন এবং তিনি 'মুক্তাদি' তথা অনুগমনকারী ও অনুসরণকারী হবেন 'মুক্তাদা' তথা অনুসৃত হবেন হবেন না, অর্থাৎ নামাযে পেশ ইমাম হবেন না।

অতএব এমতাবস্থায় এটি স্পষ্ট যে, সেই ব্যক্তি যিনি পরিশেষে উম্মতি হয়ে আসবেন তার মর্যাদা সেই অপর ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে নিম্নতর হওয়াই আবশ্যকীয় যাঁকে উম্মতের নবী রসূল ও নেতা আখ্যা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)। আর বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার হবে যদি একজন উম্মতির সেই সব প্রশংসা করা হয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হবে যা তার পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক রসূলের ক্ষেত্রে করা হয় নি এবং সেই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এই উম্মতিকে দেওয়া হবে যা তার রসূলকে দেওয়া হয় নি! যদি বলেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে উম্মতি বলে কোথায় অভিহিত করা হয়েছে? তাহলে আমি বলি যে, সহীহ্ বুখারীর সেই হাদীসটি দেখুন যাতে বলা রয়েছে: اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ (অর্থাৎ তিনি তোমাদেরই মধ্যকার তোমাদের ইমাম তথা পথপ্রদর্শক হবেন'– অনুবাদক)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উল্লিখিত 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হতে) সম্বোধনে সম্বোধিত হলো সেই সমস্ত উম্মতি, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ হতে দুনিয়ার শেষ অবধি (সৃষ্টি) হতে থাকবে। অতএব এটি স্পষ্ট যে, সম্বোধিত যখন কেবল উম্মতি এবং এই উম্মতের লোকদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আগমনকারী ইবনে মরিয়ম তোমাদেরই মধ্য হতে হবেন এবং তোমাদের মাঝেই জন্মগ্রহণ করবেন। সুতরাং প্রকারান্তরে এ বাক্যটির এ অর্থই দাঁড়ায় যে, (এ উম্মতে) আগমনকারী ইব্নে মরিয়ম কোন (স্বাধীন স্বতন্ত্র) নবী হবেন না। বরং তিনি হবেন উম্মতিদের মধ্যকার এক ব্যক্তি।

এখন ভেবে দেখা উচিত যে, এর চেয়ে অধিকতর জোরালো প্রমাণ এ বিষয়ে আর কী হতে পারে যে, 'ইবনে মরিয়ম' দ্বারা এস্থলে সেই নবীকে বুঝায় না যাঁর প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা নবুয়ত এমন এক নেয়ামত যা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কেননা নবীকে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ দান থেকে বিচ্যুত ও বঞ্চিত করা কখনো বৈধ নয়। যদি ধরা হয় যে, তিনি নবী হওয়ার অবস্থায় আসবেন এবং তিনি (আল্লাহ্ প্রদত্ত) তাঁর (স্বাধীনস্বতন্ত্র) নবুয়তের মর্যাদাসহ নাযেল হবেন তাহলে মনে রাখতে হবে, 'খতমে নবুওত' এর পথে প্রতিবন্ধক। অতএব এটি এক জোরালো প্রমাণ বিশেষ তবে এর জন্য শর্ত হলো এ গূঢ়তত্ত্বটি সে-ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন যাঁর হৃদয়ে খোদাপ্রদত্ত তাক্বওয়া ও বুঝার মতো সদ্‌বুদ্ধি কাজ করবে।

আমার বন্ধু মৌলবী আবু সায়ীদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী তাঁর এক পত্রে আমাকে লেখেন, 'আপনার প্রতিশ্রুত সদৃশ' হওয়া যদি স্বীকার করা হয় তাহলে বুখারী,

মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ বৃথা ও অকেজো বলে প্রতিপন্ন হবে এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে বিপত্তি দেখা দেবে।' অতএব সর্বাগ্রে আমি ব্যক্ত করতে চাই যে, আমার এ বন্ধুটি হলেন সেই মৌলবী সাহেব যিনি তাঁর পত্রিকা 'ইশাআতুস্ সুন্নাহ্'-এর ৭ম খণ্ডের ৭ম সংখ্যায় আমার প্রণীত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' সম্পর্কে 'রিভিউ' (পুস্তক টসমালোচনা) লিখেছেন এবং এতে তিনি এ অধমের 'মসীহ্ সদৃশ' হতে পারার কথা স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহ্ ও রসূলের 'প্রতিশ্রুত' হওয়ার স্বপক্ষে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। এ দুটি বিষয়ে আমার দাবির উল্লেখ সে গ্রন্থটিতে রয়েছে। অর্থাৎ 'বরাহীন' গ্রন্থে এ অধম অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছে, এ অধম হযরত মসীহ্র সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি এবং সেই সাথে প্রতিশ্রুতও, রূপকভাবে যার আগমনের প্রতিশ্রুতি কুরআন করীমে ও হাদীসসমূহে দেয়া হয়েছে।

অতএব এ অধমকে 'মসীহ্ সদৃশ' হিসেবে মানলে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম বৃথা ও অকেজো হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে– মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন সাহেবের এ বক্তব্য দৃষ্টে আমি ভীষণভাবে বিস্মিত হয়েছি। কেননা ইতোমধ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলোতে আমি নূতন কোন কথা লিখি নি। এগুলো তো সেই সব পুরানো কথাই, যা আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে লিখে এসেছি যেগুলোর সম্পর্কে মৌলবী সাহেব তাঁর প্রণীত 'রিভিউ'-এর ধারাবাহিক বক্তব্য উপস্থাপনের মাঝে নীরব থেকে এ অধমের দাবির সত্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে এসেছেন। শুধু তাই নয়, বরং সম্ভাব্যরূপে (যৌক্তিকভাবে) এ অধমের মসীহ্ সদৃশ হওয়াও তিনি তাঁর অতি সুস্পষ্ট বর্ণনায় স্বীকার করেছেন। তবে এখন এ পুস্তকটিতে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হয়ে বারাহীনে আহমদীয়ায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর চেয়ে এটুকু বেশি এ কথাই লিখেছি যে, মসীহ্ ইব্নে মরিয়ম রূপকভাবে প্রতিচ্ছবি হিসেবে আবির্ভূত হবেন, সেই আসল (তথা বনী ইসরাঈলী) মসীহ্ কখনো আসবেন না। অতএব এ বিষয়ে যদি কোন 'ইজ্মা' (তথা সর্বসম্মত অভিমত) আছে বলে ধরেও নেওয়া হয় তবে আমি এই ইজ্মার একটি ব্যাখ্যা করেছি মাত্র। এর বিপক্ষে কিছুই লিখি নি। আর যথাসম্ভব মৌলবী সাহেব অবহিত আছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের 'ইজমা'র বিপক্ষে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মি'রাজ-এর উভয় অংশ সম্পর্কে এ অভিমতই তুলে ধরেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সশরীরে বাইতুল মুকাদ্দাসেও যান নি এবং সশরীরে আকাশেও ওঠেন নি। বরং পুরো মি'রাজ একটি সত্যস্বপ্ন ছিল। কাজেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহার (মি'রাজ সম্পর্কিত) এ বক্তব্যটি

বুখারী ও মুসলিমের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলে নি এবং 'সিহা সিত্তাহ্'কেও অকোজে বা নিষ্ক্রিয় করে নি তাহলে এ অধমের উল্লিখিত দাবি ও এ এলহামের মাধ্যমে 'সিহা সিত্তাহ্' কী করে বৃথা ও নিষ্ক্রিয় হবে?! হযরত মসীহ্র সশরীরে আকাশে যাওয়া সেভাবে প্রমাণিত নয় যেভাবে আমাদের নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের (মি'রাজে) আকাশে যাওয়া প্রমাণিত? অতএব হে আমার ভ্রাতা! এ স্থলে গভীরভাবে চিন্তা করুন; তড়িঘড়ি করবেন না।

تامل کناں درخطا و صواب بہ از ژاژ خایانِ حاضر جواب

(অর্থাৎ 'শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সম্পর্কে ধীরস্থীরভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তির সাথে প্রত্যুৎপন্নমতি লোকদের কিবা তুলনা হতে পারে?'– অনুবাদক)।

আর মৌলবী সাহেব এ মর্মে অজুহাত দেখান যে, যদিও তিনি তার 'রিভিউ'তে আমার সম্পর্কে সম্ভাব্যতা তথা যৌক্তিকভাবে 'মসীহ্ সদৃশ' হওয়া মেনে নিয়েছেন একইভাবে প্রতিচ্ছবিস্বরূপ বা আধ্যাত্মিকভাবে আমার 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' হওয়াও মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে মরিয়ম পুত্র হযরত মসীহ্ (আ.) সম্পর্কে সিহা সিত্তাহ্য় (তথা ছয়টি প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থে) মওজুদ যাবতীয় লক্ষণসম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা লাভের সার্বিক প্রতীক ও বিকাশস্থলরূপে তো আমাকে তিনি মেনে নেন নি। এ আপত্তির উত্তর হলো, এ অধমের পক্ষ থেকেও এ মর্মে কোন দাবি নেই যে, মসীহ্ সদৃশ হওয়া আমার সত্তাতেই সীমাবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে আর কোন মসীহ্ আসবেন না। বরং আমি তো স্বীকার করি এবং বার বারই বলি যে, একজন কেন, দশ হাজারের চেয়েও বেশি সংখ্যক মসীহ্ আসতে পারেন এবং সম্ভবত তাঁদের মধ্যকার কোন একজন প্রথমে দামেস্কেই অবতীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু হে আমার বন্ধু! আমাকে একথা মানতে অবশ্যই অপারগ জ্ঞান করবেন যে, পরলোকগত (ইসরাঈলী) মসীহ্ তাঁর ভৌত ও জড় দেহসহ আকাশ থেকে নেমে আসবেন।

ইসলাম যদিও খোদা তা'লাকে সর্বশক্তিমান বলেই বর্ণনা করে এবং খোদা ও রসূল বর্ণিত বিষয়কে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির ওপর প্রাধান্য দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে অহেতুক ও অকেজো বলে সাব্যস্ত করতে চায় না। বরং পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির পরিপন্থি কোন বিষয় যদি কোন ঐশীগ্রন্থে লেখা পাওয়া যায় এবং আমরা যদি এর সকল দিকের প্রতি সার্বিক দৃষ্টিপাতে এ বাস্তব সত্যে উপনীত হই যে, প্রকৃতপক্ষেই সে বিষয়টি অযৌক্তিক কিন্তু মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির ঊর্ধ্বে নয়; তাহলে শরীয়ত ও ঐশী গ্রন্থ সেই অযৌক্তিক বিষয়টিকে আবশ্যকীয়ভাবে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে ধরে নিতে আমাদের কখনো অনুমতি

দেয় না। বরং কুরআন করীমে আমাদের পরিষ্কারভাবে তাগিদ করা হয়েছে যে, 'আয়াতে মুতাশাবিহাত', অর্থাৎ যে-সব আয়াতের অর্থের বিষয়টি মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির জন্য অস্পষ্ট থাকে সেগুলোর বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের ওপর কখনো এমন জোর দেয়া উচিত নয় যেন সেটিই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রকৃত অর্থ,* বরং সেগুলোতে মোটামুটিভাবে ঈমান রাখা উচিত এবং সেগুলোর মূলতত্ত্ব খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

এখন লক্ষ করুন! এটি খোদার পক্ষ থেকে এমন এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষা যে এরই সুবাদে আমরা হাজারো কলহবিবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি যেগুলো পৌরাণিক কাহিনি অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়ে এখনো তৈরি হয়ে চলছে। কেননা সবরকম আপত্তি বা বিতণ্ডা মানবীয় বিচারবুদ্ধির পরিপন্থি বিষয়কে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে নেয়ার দরুন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব আমরা যখন এই জেদ ও হঠকারিতাকেই পরিত্যাগ করলাম এবং মহান খোদা তা'লার নির্দেশনা অনুযায়ী সকল 'মুতাশাবিহাত' (রূপক ভাষায় বর্ণিত আয়াত বা হাদীস)-এর ক্ষেত্রে যেগুলো বুঝার বিষয়টি মানবীয় বুদ্ধিমত্তার সামনে ঘোলাটে থেকে যায়, সেসব ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন নির্দেশিত এ নীতিটি অবশ্য পালনীয় যে, এগুলোর প্রতি আমরা সামগ্রিকভাবে ঈমান আনব এবং এগুলোর মূলতত্ত্ব খোদা তা'লার ওপর সমর্পণ করব। যদি তদ্রূপ করা হয় তাহলে আপত্তি করার কোন ভিত্তি রচিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ কোন সহীহ্ হাদীসে যদি লেখা থাকে, 'দশের সঙ্গে দশ যোগ করলে বিশ নয় বরং পনেরো হবে' তাহলে সে হাদীসটির বিষয়বস্তুকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে নেয়ার আমাদের প্রয়োজন কী আর এভাবে অযথা হঠকারিতা প্রদর্শন করে বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি ঠাট্টার সুযোগ দেয়ার দরকারই বা কী? আমাদের জন্য কুরআন করীমের শিক্ষার কল্যাণে এ হাদীসটিকে 'মুতাশাবিহাত'-এর আওতাভুক্ত করা এবং ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে নিজেদের রক্ষা করার পথ খোলা আছে। কিন্তু যদি আমাদের জ্ঞানে পরিপক্ক করা হয়, অর্থাৎ এলহামে যদি আমাদের সেই যুক্তিসম্মত পথ দেখানো হয় যার মাধ্যমে মানুষ আশ্বস্ত হতে পারে তাহলে এরকম আয়াত বা হাদীসকে 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। বরং এলহামের মাধ্যমে প্রকাশিত যুক্তিসম্মত অর্থাবলি আমরা কৃতজ্ঞতা ভরে গ্রহণ করে নেব।

যদি বলা হয়, কুরআন করীমের এমন অর্থ করা ইলহাদ (বা ধর্মদ্রোহিতার) শামিল যা পূর্ববর্তীগণ হতে উদ্ধৃত নয় যেমন কিনা 'লাক্ষুকে' নিবাসী মৌলবী আব্দুর রহমান

** দ্বাদশ টীকা ২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

এ অধম সম্পর্কে লিখেছেন তাহলে আমি বলছি, এমন কোন অভিনব ও অদ্ভুত অর্থ আমি উপস্থাপন করি নি যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন এবং তাবে' তাবেয়ীন-এর 'ইজমা' (বা সর্বসম্মত অভিমত) বিরোধী হয়। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম হযরত মসীহ্‌র মৃত্যু সম্পর্কে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এসেছেন। চিহ্নিত দাজ্জালের মারা যাওয়াও স্বীকার করেছেন। কাজেই 'ইজমা' বিরোধী হওয়া কোথায় এবং কী করে প্রমাণিত হলো?! কুরআন করীমে ত্রিশের কাছাকাছি এমন সাক্ষ্য রয়েছে যা মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ জাজ্বল্যমানভাবে তুলে ধরছে। মোটকথা, হযরত মসীহ্ মাটির দেহ সহকারে আকাশে উঠে গেছেন এবং সেই দেহসহই অবতীর্ণ হবেন– এসব কথা অত্যন্ত বাজে, ভিত্তিহীন ও অলীক ছাড়া কিছু নয়। এসব কথার ওপর সাহাবায়ে কেরামের কখনো 'ইজ্‌মা' (বা ঐকমত্য) হয় নি। যদি হয়ে থাকে তাহলে এর সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রদানকারী ন্যূনকল্পে তিনশ' বা চারশ' সাহাবার নাম উপস্থিত করুন। নচেৎ একজন বা দুইজনের বর্ণনাকে 'ইজমা' বলে অভিহিত করা ভীষণ সততা বিবর্জিত কাজ। তাছাড়া এটাও এ মহোদয়গণের সর্বৈব ভ্রম যে, কুরআন করীমের তত্ত্বতথ্য ও অর্থাবলিকে তারা বিগত যুগে সীমাবদ্ধ মনে করেন। এ ধারণাটি যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে কুরআন করীম মু'জিযা হিসেবে (প্রতিষ্ঠিত) থাকে না। কুরআন যদি কেবল ভাষার অলংকরণ ও বাগ্মিতার দিক দিয়ে মু'জিযা হয়ে থাকে তবে তা হয়ত কেবল সেই আরবদের জন্য হবে যারা এর অলংকরণ ও বাগ্মিতাকে বুঝার বিষয়ে বিশেষ রুচিজ্ঞানের অধিকারী। জানা আবশ্যক, কুরআন করীমের প্রকাশ্য অলৌকিকতা যা প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হতে পারে, যা তুলে ধরে আমরা প্রত্যেক দেশের মানুষকে তা সে হোক ভারতীয় বা পারসিক বা ইউরোপীয় হোক বা আমেরিকান অথবা অন্য কোন দেশের তাদের প্রত্যেককেই অভিযুক্ত ও নিরুত্তর এবং নির্বাক করতে পারি তা হলো, কুরআন করীমের সেই চিরসত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলি এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের জগৎ যা প্রত্যেক যুগে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্মোচিত হতে থাকে এবং প্রত্যেক যুগের ধ্যানধারণার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সৈনিকদের ন্যায় দণ্ডায়মান রয়েছে। কুরআন করীম যদি সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব ও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের দিক দিয়ে একটি সীমিত ঐশীগ্রন্থ হতো তাহলে এটি কখনো পূর্ণ মু'জিযা বা নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারতো না। কেবল 'বালাগত ও ফাসাহাত' তথা ভাষাগত অলংকরণ ও স্পষ্ট বর্ণনা এমন বিষয় নয় যার নিদর্শনমূলক অবস্থা ও অবস্থান প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির বোধগম্য হতে পারে। এর স্পষ্ট নিদর্শনমূলক দিক হলো পবিত্র কুরআন অপরিসীম সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বে সমৃদ্ধ। যে ব্যক্তি

কুরআন করীমের এই নিদর্শনমূলক দিকটা স্বীকার করে না সে পবিত্র কুরআনে বিধৃত জ্ঞানভাণ্ডার হতে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত।

ومن لم يؤمن بذالك الاعجاز فوالله ما قدر القرآن حق قدره وما عرف الله حق معرفته وما وقر الرسول حق توقيره

(অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি কুরআনের এই মু'জিযায় বিশ্বাস করে না সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনকে এর যথাযথ মর্যাদা দিতে পারে নি এবং সে আল্লাহ্‌কেও সেভাবে চেনে নি যেভাবে তাঁর সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান থাকা উচিত আর মহানবী (সা.)-কেও যথাযথ মর্যাদা দেয় নি।"– অনুবাদক)

হে খোদার বান্দারা! নিশ্চিত স্মরণ রাখবেন, কুরআন করীমে অনন্ত সত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলির নিদর্শন এমন পরিপূর্ণ নিদর্শন যা প্রত্যেক যুগে অসির চেয়েও অধিক কাজ করেছে। প্রত্যেক যুগ তার নিত্যনূতন অবস্থা ও পরিস্থিতির আদলে যত রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবতারণা করে এবং যত উঁচু মাপের জ্ঞানতত্ত্বের দাবিদার হোক না কেন তার পূর্ণ প্রতিকার, দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া ও পুরোপুরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। কোন ব্যক্তি সে ব্রাহ্মসমাজি বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হোক বা আর্যসমাজি কিংবা অন্য যেকোন ধরনের দার্শনিক হোক সে কখনো এমন নূতন কোন ঐশী সত্য আবিষ্কার করে দেখাতে পারবে না, যা কুরআন করীমে পূর্বেই বিদ্যমান নেই। কুরআন করীমের দুষ্প্রাপ্য বিস্ময়াবলি কখনো নিঃশেষিত হতে পারে না। যেভাবে নিখিলবিশ্বরূপী গ্রন্থে বিরাজমান প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত বিস্ময়কর ও রহস্যসময় গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি কোন বিগত যুগে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, বরং সদা নিত্যনূতনভাবে সামনে আসতে থাকে, সে একই অবস্থা এ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের বাণীরও যাতে করে খোদা তা'লার বাণী ও কর্মের মাঝে সামঞ্জস্য নিরূপিত ও প্রমাণিত হয়। আর আমি ইতঃপূর্বে লিখে এসেছি, কুরআন করীমের বিরল বিস্ময়াবলি প্রায়শ আমার প্রতি এলহামযোগে উন্মোচিত হতে থাকে। আর সেগুলোর অধিকাংশ এত অভিনব যে, এগুলোর নামচিহ্নও পূর্ববর্তী তফসীরসমূহে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন– এ অধমের প্রতি উন্মোচিত হয়, আদম সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তা সূরা আল আসরের অক্ষরসমূহের সংখ্যমানে চান্দ্র বর্ষপঞ্জির হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে আর তা হলো চার হাজার সাতশ' চল্লিশ (বছর)। এখন বলুন, কুরআন করীমের এ সকল অকাট্য সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব যাতে কুরআনের নিদর্শন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট তা কোন তফসীর গ্রন্থে লিখা আছে?

অনুরূপভাবে খোদা তা'লা আমার ওপর কুরআন করীমের এই সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ *(সূরা আল ক্বদর: ০২)*-এর কেবল মাত্র এ অর্থ নয় যে, একটি বরকতমণ্ডিত রাত রয়েছে যেটিতে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং নিঃসন্দেহে আয়াতের সহীহ্ ও সঠিক উল্লিখিত অর্থ সত্ত্বেও এর অন্তর্নিহিত অন্যান্য অর্থও রয়েছে যা 'ফতেহ্ ইসলাম' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন বলুন! এ সকল জ্ঞানতত্ত্ব কোন তফসীর গ্রন্থে লিখা আছে? আর এ-ও স্মরণ রাখুন, কুরআন করীমের একটি অর্থের পাশাপাশি আরেকটি অর্থের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন স্ববিরোধ সৃষ্টি হয় না এবং কুরআনের শিক্ষায় কোন ত্রুটিও দেখা দেয় না। বরং এক আলোর সাথে আরেকটি আলো একাকার হয়ে 'ফুরক্বানের মাহাত্ম্যের আলো পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়। যেহেতু যুগ অন্তহীন বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহের কারণে স্বভাবতই অন্তহীন ধ্যানধারণার জন্ম দিয়ে থাকে, সেহেতু এর নিত্যনূতন আঙ্গিকে প্রকাশিত হওয়া নূতন নূতন জ্ঞানবিজ্ঞান দৃশ্যপটে নিয়ে আসা আর সেই সাথে নতুন কুসংস্কার ও কুপ্রথারও সূচনা এর একটি অবধারিত দিক। কাজেই এমতাবস্থায় সেই কিতাব যা 'খাতামুল কুতুব' হওয়ার দাবি রাখে সেটি যদি যুগের সকল রং ও রূপের সাথে খাপ খাইয়ে এতে পুঞ্জিভূত সব গ্লানির সমীচীনভাবে সার্বিক প্রতিকার সাধন না করে তাহলে সেটি কখনো 'খাতামুল কুতুব' বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। আর এতে যদি যুগের সকল পরিবর্তিত অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে তাহলে আমাদের মানতে হবে যে, কুরআন করীমে নিঃসন্দেহে অপরিসীম সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং এটি প্রত্যেক যুগের সাথে জড়িত সকল চাহিদা পূরণে পুরোপুরি সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্রস্বরূপ বটে।

এখন এ-ও স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক কামিল এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র চিরায়ত রীতি এমনটিই বলবৎ রয়েছে যে, কুরআন করীমের গোপন রহস্য ও বিস্ময়াবলি তার প্রতি প্রকাশিত হয়ে এসেছে। বরং প্রায়শ একজন এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়পটে কুরআন করীমের আয়াত এলহামরূপে 'ইলক্বা' (বা সঞ্চার) করা হয় এবং এতে আসল অর্থ থেকে পৃথক অন্য কোন বিষয় উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, মরহুম মৌলবী আব্দুল্লাহ্ গযনবী (রহ.) তাঁর পত্রে লিখেছেন, 'আমার প্রতি একবার এলহাম অবতীর্ণ হয়: قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا (অর্থ: 'আমরা বললাম, হে আগুন! শীতল হও এবং শান্তির কারণ হয়ে যাও"– অনুবাদক) কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি। এরপর এলহাম হয়: قلنا يا صبر كوني بردًا وسلامًا (অর্থ: 'আমরা বললাম, হে ধৈর্য! শীতল হও এবং শান্তির কারণ হয়ে যাও– অনুবাদক)। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আগুন বলতে এখানে 'ধৈর্য' বুঝানো হয়েছে। তিনি

অতঃপর বলেন, 'একবার আমার প্রতি এলহাম অবতীর্ণ হয়: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق (অর্থ: 'হে প্রভু প্রতিপালক! আমাকে তুমি উত্তমভাবে প্রবেশ করাও এবং উত্তমভাবে বের করে আনো"– অনুবাদক)। আর এতে (অর্থাৎ এ এলহামে আয়াতের) আসল অর্থ উদ্দিষ্ট ছিল না। বরং এতে বুঝানো হয়েছিল যে, মরহুম মৌলবী সাহেব পার্বত্য কাবুল স্টেট থেকে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের ছত্রছায়ায় চলে আসবেন। অনুরূপভাবে, তিনি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ এলহামসমূহে কুরআন করীমের বেশকিছু আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলোর আসল অর্থের পরিবর্তে অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর কিছু চিঠিপত্র এ অধমের কাছে সংরক্ষিত আছে। ইনশাআল্লাহ্ প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে।

এখন মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব অনুগ্রহপূর্বক বলুন, পূর্ববর্তী বুযুর্গানের রীতি পরিপন্থি কুরআন করীমের অর্থ করলে মানুষ 'মুলহিদ' বা খোদাদ্রোহী হয়ে যায় আর এ কারণেই এ অধমও তার দৃষ্টিতে 'মুলহিদ' (পথভ্রষ্ট)। কেননা সে খোদা তা'লার এলহাম মূলে কুরআন করীমের কোন কোন আয়াতের অন্তর্নিহিত (গোপন) অর্থ প্রকাশ করে থাকে। অতএব, তাঁর মুর্শিদ মরহুম আব্দুল্লাহ্ গজনবী সম্পর্কে তাঁর কী ফতোয়া? হযরত আব্দুল্লাহ্ গযনবী সাহেবের প্রতি এমন সব এলহামও হয়েছে, যে আয়াতগুলো বিশেষভাবে নবীদের জন্য ছিল সেগুলো উম্মতের লোকদের সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং দুইবার তিনি কুরআন করীমে বিশিষ্ট্য সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে যে-সব আয়াত ছিল সেগুলোর বিষয়ে এ মর্মে পত্র লেখেন যে, 'এ এলহামসমূহ আপনার সম্পর্কে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।' সে এলহামগুলোতে আয়াত: ১) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا *(সূরা আশ শামস: ১০)*,

২) أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ *(সূরা আল বাকারা: ২৮৭)* অন্তর্ভুক্ত আছে।

আর এ অধম যে মরহুম মৌলবী আব্দুল্লাহ্ গজনবী সাহেবের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সুধারণা পোষণ করে থাকে সেটি প্রকৃতপক্ষে এ কারণেই যে, তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল যে, এ অধম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হতে চলেছে। তিনি এ সম্পর্কিত বেশকিছু পত্র লিখেছেন যাতে তার প্রতি অবতীর্ণ বরকতময় এলহামসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। কিছু লোকের কাছে উল্লিখিত বিষয়ে মৌখিকভাবে বর্ণনাও করেন এবং দিব্যদর্শনেও তিনি তাঁর উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও বাসনা প্রকাশ করেন।

মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন: কোথায় কোরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণ করেছেন? বরং رَافِعُكَ إِلَيَّ এবং بَل رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ আয়াতদ্বয়ের অংশ প্রমাণ করছে যে, মসীহ্ দেহসহ আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছিলেন। অনুরূপ, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ *(সূরা আন নিসা: ১৫৮)* আয়াতটিও এটাই প্রমাণ করে যে মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হন নি এবং নিহতও হন নি।

উত্তর: অতএব জানা আবশ্যক, খোদা তা'লার দিকে কারো উত্থিত হওয়ার অর্থই হলো মারা যাওয়া। অর্থাৎ খোদা তা'লার ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ [অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্তে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও' *(সূরা আল ফাজ্‌র: ২৯)* অনুবাদক] আর إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ [হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে তোমাকে উঠাব *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)*– অনুবাদক] বলার অর্থ এক ও অভিন্ন। উক্ত বাক্যদ্বয়ের একই অর্থ [বিধায় এটাই সাব্যস্ত হয় যে, ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন]। তাছাড়া কুরআন করীমে হযরত মসীহ্র মারা যাওয়া সম্পর্কে যত বিস্তারিত, বিশদ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এর চেয়ে বেশি কল্পনা করা যায় না। কেননা খোদা তা'লা যুগপৎ সাধারণ ও বিশেষ তথা উভয়ভাবে ঈসা (আ.)-এর মারা যাওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন, সাধারণভাবে তাঁর মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কে বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেবল একজন রসূল। তার পূর্বে যে রসূলেই এসেছে, অতীত হয়ে গেছে তথা ইন্তেকাল করেছে। এখন এই রসূল (মুহাম্মদ সা.) মারা গেলে অথবা নিহত হলে তোমরা কি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করবে?' *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)*

এখন লক্ষ করুন, যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত এ আয়াতটি স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, সকল রসূলই মৃত্যুর সম্মুখীন হবেন সে মৃত্যু প্রাকৃতিক ধারায় হোক অথবা হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সংঘটিত হোক না কেন। বিগত নবীদের একজনও এমন নেই যিনি মৃত্যু এড়াতে পেরেছেন। অতএব, এস্থলে দর্শকবৃন্দ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারছেন যে, হযরত মসীহ্ বিগত নবী-রসূলগণের মধ্যকার একজন হওয়া সত্ত্বেও যদি এখনো মারা না গিয়ে থাকেন, বরং জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হয়ে থাকেন তাহলে এ আয়াতের বিষয়বস্তু যা সার্বিকভাবে অতীতের সকল নবীর মৃত্যুর প্রমাণ বহন করছে, সঠিক বলে সাব্যস্ত হতে পারে না বরং এ যুক্তি দেয়াটাই বৃথা ও বিতর্কিত।

সাধারণ বা সর্বজনীন যুক্তি উপস্থাপনের ধারাবাহিকতায় যে দ্বিতীয় আয়াতটি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে সে আয়াতটি হলো:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

অর্থাৎ 'আমরা কোন নবীর দেহ এমন বানাই নি যা খাবারের মুখাপেক্ষী ছিল না। তারা সবাই মারা গেছে। তাদের মধ্যকার কেউ আর নেই। *(সূরা আল আম্বিয়া: ৯)*

একইভাবে সাধারণ বা সর্বজনীন নিয়মের অধীনে আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

[অর্থাৎ 'আর আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন দান করি নি। অতএব তুমি মারা গেলে তারা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" *(সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫-৩৬)*– অনুবাদক]।

তৃতীয় আয়াত যা সাধারণ বা সর্বজনীন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের পন্থায় হযরত মসীহ্র মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে তা হলো:

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

অর্থাৎ 'হে মানব সন্তান! তোমরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথমত যারা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই মারা যায়, অর্থাৎ তারা চরম বার্ধক্যে পৌঁছে মারা যায় না, বরং তার আগেই মারা যায়। দ্বিতীয়টি হলো সেই শ্রেণির লোক যারা এতো বেশি বৃদ্ধ হয়ে যায় যা জীবনের অতি নিকৃষ্ট অবস্থা তাদের মাঝে প্রকাশ পায় যা ঘৃণাব্যঞ্জক। এমন কি জ্ঞানী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার পর একেবারে অবুঝ শিশুর মতো হয়ে যায় এবং আজীবন আহরিত ও সঞ্চিত জ্ঞানবুদ্ধির সবকিছুই অকস্মাৎ ভুলে যায়' *(সূরা আল হাজ্জ: ৬)*। খোদা তা'লা যেহেতু মানবজাতির জীবনপদ্ধতির নিরিখে তাদের বিভক্তি কেবল দুটি শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন সেহেতু হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম সকল মাটি সৃষ্ট বান্দাদের মতো উল্লিখিত বিভক্তির বাইরে থাকতে পারেন না। এটা কোন দার্শনিকদের তৈরি প্রকৃতির আইন নয় যা কেউ নস্যাৎ বা নাকচ করে দিবে, বরং এটি আল্লাহ্র সৃষ্ট নিয়ম বা আইন যা স্বয়ং মহান আল্লাহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতএব এই ঐশী বিভক্তি অনুসারে যা আবশ্যকীয় তা হলো, হযরত মসীহ্ (আ.) হয়তো مِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ তথা মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবেন এবং মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী বেহেশতে সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবেন যার সম্পর্কে তিনি নিজেই

ইঞ্জিলে উল্লেখ করেছেন পক্ষান্তরে তিনি যদি এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত মারা না গিয়ে থাকেন তাহলে কালের প্রভাবে বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকবেন যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর থাকা বা না থাকা সমান কথা।

এ ছাড়া যে স্পষ্ট আয়াতসমূহ বিশেষভাবে মসীহ্‌র মৃত্যুর প্রমাণ বহন করছে আমরা সেগুলো বার বার উল্লেখ করব তা আবশ্যক নয়।

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ যদি 'রাফা' প্রাপ্তদের দল হতে আলাদা থাকেন যারা চিরকালের জন্য পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হয়েছেন তাহলে তিনি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না যারা পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন বরং মৃত্যুর পর তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর তিনি যদি তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়ে থাকেন আর আয়াত ফাদখুলী ফী ইবাদী অনুসারে সে সকল মৃতদের দলে যোগ দিয়ে থাকেন তাহলে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন। কেননা মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মসীহ্ ওই পরলোকগত নবীগণের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন এবং ইয়াহইয়া নবীর পাশে তিনি অবস্থান লাভ করেছেন। এমতাবস্থায় إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ – আয়াতের অর্থ হবে: عبادى المتوفين المقربين وملحقك بالصّٰلحين (অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার সেই বান্দাদের দিকে 'রাফা' দান করব তথা উন্নীত করব যারা আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তোমাকে সালেহীনের সাথে মিলিত করব– অনুবাদক)। অতএব বিদ্বেষমুক্ত বুদ্ধিমান লোকদের জন্য প্রকৃত সত্য অনুধাবনে এটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত মসীহ্‌কে জীবিতাবস্থায় সশরীরে ওঠানো হয়ে থাকলে তিনি আবার মৃতদের মাঝে কেন ঢুকলেন?। অবশ্য এর সাথে এটুকু বর্ণনা করা আবশ্যক যে, কিছু অজ্ঞ ও অবুঝ লোক মনে করে, উল্লিখিত আয়াত দুটি দ্বিবিধ অর্থ বোধক।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কুরআন করীমের 'তফসীর বির্ রায়' বা ধারণা নির্ভর তফসীর করা মু'মিনের শোভা পায় না। সত্য কথা হলো কুরআন করীমের কতক অংশ অন্য কতক অংশের জন্যেও স্বয়ং ব্যাখ্যাকারী ও বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই إِنِّي مُتَوَفِّيكَ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)* এবং فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي *(সূরা আল মায়েদা: ১১৮)*– হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কে এ দুটি আয়াত প্রকৃতপক্ষে মসীহ্ (আ.)-এর মারা যাওয়ারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে। এ আয়াতগুলোর অন্য কোন অর্থ থেকে থাকলে এ বিবাদের মীমাংসা কুরআন করীম দ্বারাই করানো উচিত। কুরআন করীম যদি এ توفّى শব্দটিকে যুগপৎ কখনো মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার করে আর

কখনো এমন অর্থেও ব্যবহার করে যা মৃত্যুর সাথে একেবারেই সম্পর্ক না রাখে তাহলে এমতাবস্থায় বিতর্কিত জায়গায় সমানভাবে বিপরীত দুটি অর্থের অবকাশ থেকে যাবে। কিন্তু যদি একটি বিশেষ অর্থ বেশিরভাগ বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন করীম ব্যবহার করে থাকে তাহলে সে অর্থই বিতর্কিত স্থানে অগ্রাধিকার পাবে। কুরআন করীম যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র সংশ্লিষ্ট শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার করে থাকে তাহলে বিতর্কিত স্থানটিতেও চূড়ান্তভাবে এ সিদ্ধান্তই হবে, অর্থাৎ সমগ্র কুরআন করীমে تَوَفّٰى শব্দের যে অর্থটি করা হয়েছে এখানেও সে অর্থই হবে।

কেননা খোদা তা'লার পক্ষে তাঁর এই অতি প্রাঞ্জল ও বাগ্‌বিদগ্ধ কিতাবে ধরনের একটি বিতর্কিত স্থানে যা বিরাট এক বিতণ্ডার বিষয় বলে তিনি নিজেই জানেন, এরূপ বিরল ও অস্পষ্ট শব্দাবলি ব্যবহার করা একেবারেই অসম্ভব ও অকল্পনীয় যা তাঁর পুরো গ্রন্থে কোথাও করা হয় নি। তিনি যদি এমনটি করেন তাহলে তিনি নিজেই তাঁর সৃষ্টিকে সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দিতে চান বলে প্রতীয়মান হবে। তবে এটা স্পষ্ট যে, তিনি কখনো এমনটি করতে পারেন না। এটা কী করে সম্ভব যে, খোদা তা'লা তাঁর কুরআন করীমের তেইশটি জায়গায় একটি শব্দের একই অর্থ করবেন আর এরূপ দুটি জায়গায় যা অধিক স্পষ্ট বর্ণনার মুখাপেক্ষী ছিল সেখানে কিনা ভিন্ন কিছু অর্থ নির্ধারণ করে নিজেই (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁর সৃষ্টজীবকে ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দেবেন?

হে দর্শক! আপনাদের সামনে পরিষ্কার থাকা উচিত যে, এ অধম পবিত্র কুরআনের আদ্যোপান্ত সেই সকল শব্দ যেগুলোতে تَوَفّٰى শব্দটি বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোতে গভীর মনোনিবেশে যখন প্রত্যক্ষ করে তখন স্পষ্টত প্রকাশ পায় যে, কুরআন করীমে বিতর্কিত জায়গা দুটি ছাড়া উল্লিখিত শব্দটি তেইশ জায়গায় লেখা আছে আর প্রত্যেক জায়গাতেই মৃত্যু এবং 'রূহ কবজ' (অর্থাৎ মৃত্যু দেয়ারও অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। এমন একটি স্থানও নেই যেখানে تَوَفّٰى শব্দটি অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। এগুলো নিম্নরূপ:

সূরার নাম	পারা নম্বর	আয়াত নম্বর	কুরআন করীমের আয়াত
আন নিসা	৪	১৬	حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ
আলে ইমরান	৪	১৯৪	وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
আস সাজদাহ্	২১	১২	قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ
আন নিসা	৫	৯৮	اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ

আল মু'মিন	২৪	৭৮	فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ
আল নাহল	১৪	২৯	الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ
আল নাহল	১৪	৩৩	تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ
আল বাকারা	২	২৩৫	يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
আল বাকারা	২	২৪১	يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
আল আনআম	৭	৬২	تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
আল আ'রাফ	৮	৩৮	رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ
আল আ'রাফ	৯	১২৭	تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ
আত তওবা[১]	১০	৫১	يَتَوَفَّى (সূরা আল আনফাল)
মুহাম্মদ	২৬	২৮	فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ
ইউনুস	১১	৪৭	وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
ইউসুফ	১৩	১০২	تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ
আর রা'দ	১৩	৪১	اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
আল মু'মিন	২৪	৬৮	وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى
আল মু'মিন[২]	২৪	৭৮	اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
আন নাহল	১৪	৭১	ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ
হাজ্জ	১৭	০৬	وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى
যুমার	২৪	৪৩	اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
আল আনআম	৭	৬১	هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى
ইউনুস[৩]	১১	১০৫	الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ

এখন এটা স্পষ্ট যে, কুরআন করীমের এ সকল জায়গায় 'তাওয়াফ্ফি' শব্দটির অর্থ 'মৃত্যু এবং রূহ্ কবজ করাই বুঝানো হয়েছে এবং সর্বশেষে উল্লিখিত (সূরা যুমার ও সূরা আনআমের) আয়াত দুটি বাহ্যত নিদ্রা বুঝায় বলে প্রতীয়মান হলেও

নোটঃ

(১) আল আনফাল-এর স্থলে ভুলবশত আত তওবা লেখা হয়েছে।

(২) এ আয়াতটি তালিকার পঞ্চম নম্বরে উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু ভুলবশত এখানে আবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

(৩) এ আয়াতটি ভুলবশত তালিকায় লিপিবদ্ধ হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দুটিতেও নিদ্রা বুঝানো হয় নি বরং এখানেও আসল লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু এবং এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে যে, নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যুই বটে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে যেমন 'রূহ্ কবজ' করা হয় তেমনি নিদ্রায়ও 'রূহ কবজ' করা হয়ে থাকে। অতএব এ জায়গা দুটিতে নিদ্রার জন্য 'তাওয়াফ্ফি' শব্দটির প্রয়োগ করা বস্তুত একটি ইস্তিয়ারা বা রূপক ভাষ্য যা নিদ্রা নির্দেশক শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে নিদ্রা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এখানে 'তাওয়াফ্ফি' শব্দ দ্বারা প্রকৃত মৃত্যু বুঝায় না, বরং 'রূপক মৃত্যু' বুঝানো হয়েছে আর সেটি হচ্ছে নিদ্রা। এ বিষয়টি সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরও জানা থাকবে যে, কোন শব্দ যখন সর্বস্বীকৃত একটি বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অর্থাৎ এমন অর্থে যা সাধারণভাবে এর জন্য যথোপযুক্ত বা যা সাধারণত লোকেরা ব্যবহার করে থাকে, সেক্ষেত্রে বক্তার পক্ষে সেটি চেনা বা বুঝার জন্য কোন নির্দেশিকা উপস্থাপন করা মোটেও আবশ্যক নয়। কেননা এটি সে অর্থে প্রচলিত, পরিচিত ও অতি সহজেই অনুধাবন যোগ্য। কিন্তু কোন বক্তা যখন কোন একটি শব্দের অর্থ স্বীকৃত ও জানা বাস্তবতা থেকে সরিয়ে রূপকের দিকে নিয়ে যায় তখন সেখানে তাকে স্পষ্টত বা ইশারা ইঙ্গিতে অথবা অন্য কোন আকারে কোন নির্দেশিকামূলক শব্দ ব্যবহার করতে হয় যেন তা বুঝার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। কোন বক্তা একটি শব্দ স্বীকৃত অর্থে ব্যবহার করেছে, নাকি বিরল উপমা ও রূপকস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে, তারও স্পষ্ট চিহ্ন থেকে থাকে, অর্থাৎ সে স্বীকৃত সত্যকে একটি পরিচিত ও প্রচলিত এবং জানা শব্দ মনে করে কোন নির্দেশিকার মুখাপেক্ষী না হয়ে অনায়াসে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেয়। কিন্তু উপমা বা বিরল রূপকের ক্ষেত্রে এরকম সংক্ষেপ করা পছন্দনীয় নয়। বরং সেক্ষেত্রে বক্তার কর্তব্য হয়ে থাকে যাতে বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝতে পারে এমন কোন চিহ্নের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা, এ শব্দটি এর আসল অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।

অতএব এখন যেহেতু আক্ষরিক ও রূপকের পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে গেছে তাই যে-ব্যক্তি কুরআন করীম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে থাকবেন এবং যে যে স্থানে تَوَفّٰى শব্দটি বিদ্যমান সেটিতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করবেন তিনি অবশ্যই সততার সাথে আমাদের বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ:

(১) إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ [অর্থ: যে-সব প্রতিশ্রুতি আমরা তাদের দিয়েছি তার কিছুটা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাব অথবা (তার আগেই) তোমাকে মৃত্যু দেব' *(সূরা ইউনুস: ৪৭)* –অনুবাদক]।

(২) تَوَفَّنِي مُسْلِمًا [অর্থ: 'আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও *(সূরা ইউসুফ: ১০২)*]।

(৩) وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى [অর্থ: তোমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা (আগেই) মারা যায়' *(সূরা আল হাজ্জ: ৬)*– অনুবাদক]।

(৪) تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ [অর্থ: ফেরেশতাগণ তাদের মৃত্যু দেয়'*(সূরা আন নিসা: ৯৮)*– অনুবাদক]।

(৫) يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ [অর্থ: 'তোমাদের মাঝে যারা মারা যায়' *(সূরা আল বাকারা: ২৪১)*– অনুবাদক]।

(৬) تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا [অর্থ: আমাদের প্রেরিত (ফেরেশতা)গণ তাকে মৃত্যু দেয়' *(সূরা আল আনআম: ৬২)* –অনুবাদক]।

(৭) رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ [অর্থ: 'আমাদের প্রেরিত ফেরেশতাগণ তাদের মৃত্যু দেয়' *(সূরা আল আ'রাফ: ৩৮)*– অনুবাদক]।

(৮) تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ [অর্থ: 'মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যু দাও' *(সূরা আল আ'রাফ: ১২৭)*– অনুবাদক]।

(৯) وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ [অর্থ: এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও' *(সূরা আলে ইমরান: ১৯৪)*– অনুবাদক]।

(১০) ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ [অর্থ: 'এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন' *(সূরা আন নাহল: ৭১)*– অনুবাদক]।

(উল্লিখিত আয়াতসমূহে توفّى শব্দটি) কতস্পষ্টভাবে মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন করীমে কি এমন কোন আয়াতও আছে যেখানে উক্ত আয়াতগুলোর ন্যায় কেবল মাত্র توفّى শব্দটি থাকায় এর মৃত্যু অর্থ করা হয় নি বরং অন্য কোন অর্থ করা হয়েছে? নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে আদ্যোপান্ত কুরআনের বাগধারা থেকে এটাই প্রমাণিত যে, প্রত্যেক জায়গায় বস্তুতপক্ষে توفّى শব্দটি দ্বারা কেবল মৃত্যুই বুঝায়। কাজেই বিতর্কিত إِنِّي مُتَوَفِّيكَ এবং فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي– আয়াতদ্বয়ে মনগড়াভাবে কুরআনের বাগধারার বিরোধী কোন অর্থ করা ভ্রষ্টতা ও প্রক্ষেপণ নয় তো আর কী?

এ জায়গায় এ গূঢ় কথাটি উল্লেখ করা যায় যে, কুরআন করীমে সর্বত্র মৃত্যুর স্থলে تَوَفّٰى শব্দটি কেন ব্যবহৃত হয়েছে? ইমাত শব্দ কেন ব্যবহার করা হয় নি? এতে রহস্য ও তাৎপর্য এটাই নিহিত যে, 'মওত' শব্দটি এমন সব জিনিসের বিলুপ্তির ক্ষেত্রেও বলা হয় যেগুলো (দৈহিকভাবে) লয়প্রাপ্ত হওয়ার পর সেগুলোর কোন 'রূহ' বা আত্মা অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই উদ্ভিদ ও জড়বস্তুসমূহ যখন নিজেদের শ্রেণিগত রূপ ছেড়ে অন্য কোন আকারে রূপ ধারণ করে তখন সেগুলোর ক্ষেত্রে 'মওত' (মৃত্যু) শব্দটি প্রযোজ্য হয়। যেমন বলা হয়, 'এই লোহা মরে গেছে', অর্থাৎ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়, 'রূপার টুকরাটা মরে গেছে', অর্থাৎ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে সমস্ত জীব ও কীটপতঙ্গ যেগুলোর 'আত্মা' মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকে না এবং পুরস্কার ও শাস্তি পায় না সেগুলো মরলে তাদের ক্ষেত্রে تَوَفّٰى শব্দ বলা হয় না বরং কেবল এটাই বলা হয় যে, অমুক প্রাণী বা কীট মরে গেছে।

যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহা সম্মানিত কিতাব পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, মানুষ এমন এক প্রাণী যারা তাদের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না, বরং তাদের আত্মা অবশিষ্ট থেকে যায়। আত্মাকবজকারী একে নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়। মৃত্যু শব্দটি বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে تَوَفّٰى শব্দটি ব্যবহার করেছেন যাতে এ প্রমাণ বহন করে যে, তিনি একে মৃত্যু দিয়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন নি, বরং কেবল এর দেহের মৃত্যু ঘটিয়েছেন আর এর আত্মাকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। আর এ (تَوَفّٰى) শব্দটি অবলম্বন করার একটি উদ্দেশ্য হলো নাস্তিকদের দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন– যারা মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবিনশ্বর হওয়ায় বিশ্বাসী নয়।

জেনে রাখা উচিত, কুরআন করীমের আদ্যোপান্ত تَوَفّٰى শব্দটি মানবাত্মা 'কবজ' করা বা মৃত্যু দেয়া এবং তার দেহকে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় ছেড়ে দেয়ার অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর স্বরূপ কেবল এটুকুই যে, তাদের আত্মাকে খোদা তা'লা 'কবজ' করেন তথা নিজ আয়ত্তে নেন এবং দেহকে পৃথক করে অকেজো ছেড়ে দেন। আর যেহেতু নিদ্রাও কিছুটা এ বাস্তবতায় অংশীদারীত্ব রাখে তাই উল্লিখিত আয়াত দুটিতে নিদ্রাকেও রূপকার্থে تَوَفّٰى বলেই অবহিত করেছেন। কেননা নিঃসন্দেহে নিদ্রাতেও এক বিশেষ মাত্রায় আত্মাকে কবজ করা হয় এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় করা হয় কিন্তু تَوَفّٰى-এর পূর্ণ রূপ যাতে পূর্ণভাবে আত্মা বা প্রাণ কবজ করা হয় এবং দেহকে সম্পূর্ণ অকেজো করা হয় সেটি হচ্ছে মানুষের মৃত্যু। এ কারণেই تَوَفّٰى শব্দটি সাধারণভাবে কুরআন করীমে মানুষের মৃত্যুর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা কুরআন করীমে এ ব্যবহারের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর নিদ্রার ক্ষেত্রে تَوَفّٰى শব্দটি কেবল দুবারই এসেছে আর তাও নিদ্রা নির্দেশক শব্দসহ এসেছে এবং এ আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এস্থলেও تَوَفّٰى শব্দ দ্বারা বস্তুতপক্ষে নিদ্রা বুঝায় না বরং মৃত্যুই বুঝায়। লক্ষ হচ্ছে এ বিষয়টি প্রকাশ করা যে, নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু যাতে আত্মা বা প্রাণ কবজ করা হয় এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, নিদ্রা একটি আংশিক (বা লঘু) মৃত্যু আর সত্যিকার মৃত্যু হলো পূর্ণ মৃত্যুর নাম।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, تَوَفّٰى শব্দটি যে কুরআন করীমে ব্যবহার হয়েছে তা এর প্রকৃত ও মৌলিক অর্থে, অর্থাৎ মৃত্যু অর্থে হোক অথবা অমৌলিক তথা নিদ্রা অর্থে হোক– সর্বত্র এ শব্দটি কেবল আত্মা বা প্রাণ কবজ করা এবং মানবদেহ নিষ্ক্রিয় ও অকেজো ছেড়ে দেয়ার অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অতএব উল্লিখিত এ অর্থটি যখন একটি স্বীকৃত নিয়ম বা রীতি হিসেবে সাব্যস্ত যার অনুকূলে কুরআন করীমে تَوَفّٰى সংবলিত সকল আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন কথার কথা এক মুহূর্তের জন্য যদি এ ভ্রান্ত ধারণাটিও গ্রহণ করা হয় যে, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ বাক্যটির অর্থ হলো إِنِّي مُنِيمُكَ অর্থাৎ 'আমি তোমাকে ঘুম পাড়াব' তাহলেও দেহ আকাশে ওঠানোর কথা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়। কেননা এ জায়গায়, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ-এর পর খোদা তা'লা যে رَافِعُكَ إِلَيَّ বাক্যটি বলেছেন, অর্থাৎ 'আমি তোমার আত্মা বা প্রাণ কবজ বা মৃত্যু দেয়ার পরই নিজের দিকে উঠাব'– এই رَافِعُكَ বাক্যটি إِنِّي مُتَوَفِّيكَ বাক্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে এ অর্থটিই সাব্যস্ত হয় যে, খোদা তা'লা আত্মাকে কবজ করেছেন আর আত্মাকেই নিজের দিকে উঠিয়েছেন। কেননা যে জিনিসটি কবজ করা হয়েছে সেটিই ওঠানো হবে। দেহ কবজ করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। অতএব নিদ্রা সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতে খোদা তা'লা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, নিদ্রাতেও মৃত্যুর মতো আত্মা বা প্রাণই কবজ করা হয়, দেহ নয়। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারেন, যে জিনিসটি 'কবজ' করা হয় সেটিই ওঠানো হবে। এটাতো হতে পারে না যে, 'কবজ' করা হয় আত্মাকে আর ওঠানো হবে দেহ! এরকম অর্থ কুরআন করীমের সকল আয়াত এবং ঐশী ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কুরআন করীম নিদ্রা সংবলিত আয়াতগুলোতেও যে تَوَفّٰى শব্দটিকে রূপকভাবে ব্যবহার করে সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, আমরা আত্মা 'কবজ' করি এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে ছেড়ে দেই। মৃত্যু ও নিদ্রার মাঝে পার্থক্য কেবল এটুকু যে, মৃত্যুর অবস্থায় আমরা আত্মাকে কবজ করে তা আর ছাড়ি না,

বরং নিজের কাছে রেখে দেই এবং নিদ্রার অবস্থায় কিছুকাল পর্যন্ত আত্মাকে ধরে রেখে এরপর সেই আত্মা বা প্রাণকে ছেড়ে দেই আর সেটি আবার দেহের সাথে সম্পর্কবন্ধনে জড়িয়ে যায়।

এখন ভাবা উচিত, কুরআন করীমের উল্লিখিত বর্ণনাটি কি এ বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট নয় যে, মৃত্যু ও নিদ্রা উভয় অবস্থায় দেহকে কবজ করার এবং ওঠাবার সাথে খোদা তা'লার কোন সংস্রব নেই, বরং তিনি নিজেই যেমন বলেছেন, 'এ মানবদেহ মাটি থেকে সৃষ্ট এবং অবশেষে মাটিতেই প্রবেশ করে থাকে।' তাই খোদা তা'লা আবহমান কাল থেকে কেবল আত্মা বা প্রাণ কবজ করে এসেছেন এবং কেবল প্রাণকে নিজের দিকে উঠিয়ে থাকেন। এটিই যেখানে প্রকৃত বিষয় সেখানে আমরা যদি ধরেও নেই যে, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ বাক্যটির অর্থ হলো তোমার আত্মা সেভাবে 'কবজ' করব যেভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রাণ কবজ করা হয় তাহলেও এ কবজের সাথে দেহের কোন সম্পর্ক হবে না এবং এমন ব্যাখ্যা দ্বারা কিছু প্রমাণিত হলেও কেবল এই হবে যে, স্বপ্নে যেমন মানবাত্মাকে কবজ করা হয় সেভাবে হযরত মসীহ্‌র আত্মাকে ঘুমের অবস্থার ন্যায় কবজ করা হয়েছে আর তাঁর দেহ ভূপৃষ্ঠেই পড়ে ছিল তারপর কোন সময় আত্মা তাঁর দেহে প্রবেশ করেছে। তবে এরকম অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা কেবল কিছু সময়ের জন্য হযরত মসীহ্‌র নিদ্রা যাওয়া, অতঃপর জাগ্রত হওয়া আমাদের এ বিতর্কটির সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। কুরআন করীমের উল্লিখিত আয়াতটি স্পষ্টত উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মার ন্যায় হযরত মসীহ্‌র কবজকৃত আত্মাকে দেহের দিকে (ফিরে আসার জন্য) ছেড়ে দেয়া হয় নি, বরং খোদা তা'লা সেটি নিজের দিকে উঠিয়ে নেন।

যেমনটি إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)* আয়াতটি হতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ন্যায়ের চোখে দেখা উচিত, যেভাবে হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (অর্থ 'নিশ্চয় আমিই তোমাকে ওফাত দিব'), ঠিক সেভাবে আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন, وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ (অর্থ: 'আর আমরা তাদের যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি এর কিছুটা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাব অথবা (এর পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ও আমাদের মনিব উভয়ের জন্য توفّى শব্দটি বিদ্যমান তা সত্ত্বেও কত বড়ো অন্যায়

যে, আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত تَوَفّٰى শব্দের আমরা সবাই অর্থ করে থাকি মৃত্যু। কিন্তু হযরত ঈসার বেলায় এ শব্দের আসল ও জানা অর্থ বাদ দিয়ে অধিকন্তু কুরআনের সেসব সর্বসম্মত এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত অর্থকে পাশ কাটিয়ে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে এক মনগড়া অর্থ করা যদি 'ইলহাদ' না হয় তাহলে ইলহাদ তথা খোদ্রোহিতা ও প্রক্ষেপণ আর কাকে বলে?! যত বড়ো বড় তফসীর গ্রন্থ দুনিয়ায় বিদ্যমান যেমন– কাশ্‌শাফ, মাআলিম, তাফসীর রাযি, ইবনে কাসির, মাদারিক ও ফাত্‌হুল বায়না এসবগুলোতেও يا عيسىٰ إني متوفّيك আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে একথাই লেখা আছে যে, إني مميتُك حتف انفك অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব ক্রুশবিদ্ধ বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তুমি (অস্বাভাবিকভাবে) কখনো মারা যাবে না।'

কতিপয় তফসীরকারক নিজেদের অদূরদর্শিতার দরুন এ আয়াতটির ভিন্ন ধরনের কিছু তফসীর করেছে তবে তাঁরা ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে এগুলো উদ্ভাবন করেছেন কোন আয়াত বা সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতিমূলে এসব করা হয় নি। তাঁরা জীবিত থাকলে তাদের জিজ্ঞাসা করা যেতো, 'আপনারা কেন এবং কোন দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশালেন?' তবে তারা যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিভিন্ন উক্তির মাঝে একটি এ-ও রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম অবশ্য অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং কেবল তাঁর আত্মাকেই ঊর্ধ্বলোকে ওঠানো হয়েছিল, তাই তাঁদের অন্য সব ভুলত্রুটি মার্জনাযোগ্য। তাঁদের মাঝে কোন কোন তফসীরকারক, যেমন– 'তফসীর কাশ্‌শাফ'-এর প্রণেতা নিজ হাতে অন্যান্য সব উক্তিকে স্বীয় মন্তব্য 'কীলা' অর্থাৎ 'কথিত আছে' শব্দগুচ্ছ দ্বারা দুর্বল (তথা অগ্রহণযোগ্য) সাব্যস্ত করে গেছেন।

এখন যেহেতু تَوَفّٰى শব্দ সম্পর্কে গবেষণা সুসম্পন্ন হল এবং প্রমাণিত হল যে, সমগ্র কুরআন করীম জুড়ে এ শব্দটি কেবল আত্মা বা প্রাণ 'কবজ' করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এরপর رَافِعُكَ إِلَيَّ বাক্যটিতে رَفَعَ শব্দটি পবিত্র কুরআনে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখা দেখা বাকি রইল।

অতএব জানা থাকা উচিত যে, 'রাফাআ' শব্দটি কুরআন করীমে যেখানেই বিভিন্ন নবী, পুণ্যবান ও পবিত্র লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সাধারণত অর্থ হলো, এসব পুণ্যবান ও মনোনীত লোকদের জন্য খোদা তা'লার সন্নিধানে তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা যে মাকাম ও আত্মিক উৎকর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে যে মর্যাদা

নির্ধারিত রয়েছে সেটি প্রকাশ করে দেয়া এবং এ সুসংবাদ দেয়া যে, মৃত্যুর পর তাদের বিদেহী আত্মাকে সেই মার্গে ওঠানো হবে যা তাদের জন্য ঐশী নৈকট্যের মর্যাদা হিসেবে নির্ধারিত। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.)-এর নির্ধারিত উচ্চমর্যাদা প্রকাশার্থে কুরআন করীমে বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

(সূরা আল বাকারা: ২৫৪)

অর্থাৎ এ সকল রসূল তাঁদের মান ও মর্যাদায় সবাই সমান নন। তাঁদের কেউ কেউ এমন রয়েছেন যাদের তিনি সামনা সামনি কথোপকথনের সম্মান দান করেছেন এবং কেউ কেউ এমনও আছেন যাদের পদমর্যাদার উন্নতি সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে।

এ আয়াতের তফসীর মহানবী (সা.)-এর হাদীসে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর সকল নবীর আত্মা আকাশে (অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকে) উঠানো হয় এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই আত্মা আকাশসমূহের কোন আকাশে কোন অবস্থান বা মর্যাদা লাভ করে। এ সম্পর্কেই বলা হয় যে, অমুক মাকাম বা মার্গ পর্যন্ত সে আত্মাটির 'রাফা' সাধিত হয়েছে, যাতে করে অভ্যন্তরীণভাবে সে আত্মার যে পদমর্যাদা ছিল তা প্রকাশ্যভাবে বা বাহ্যিকভাবেও প্রমাণ করে দেখানো যায়। অতএব আকাশের দিকে যে রাফা হয় তা তার মার্গ বা মর্যাদা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত رفع بعضهم درجات বাক্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের رَفَعَ (বা আত্মিক উন্নতি) অবশ্যই সকল নবীর رَفَعَ-এর চেয়ে উচ্চতর আর তাঁর আত্মা হযরত মসীহ্র আত্মার মতো দ্বিতীয় আকাশে নয় এবং হযরত মূসার আত্মার ন্যায় ষষ্ঠ আকাশেও নয়, বরং সবচেয়ে উঁচুতে। মে'রাজের হাদীস স্পষ্টত এরই প্রমাণ বহন করে। বরং 'মাআ লিমুন্ নবুওয়াত' গ্রন্থের ৫১৭ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে যখন ষষ্ঠ আকাশ ছেড়ে এগিয়ে গেলেন তখন হযরত মূসা বললেন:

رَبِّ لَمْ اَظُنَّ اَنْ يُّرْفَعَ عَلَى اَحَدٌ অর্থাৎ হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমার ধারণা ছিল না যেকোনো নবীকে আমার চেয়েও ঊর্ধ্বে ওঠানো হবে এবং সে 'রাফাআ'-এর ক্ষেত্রে আমাকে অতিক্রম করে যাবে।' এখন লক্ষ করুন! رَفَعَ শব্দটি কেবল উন্নত মার্গ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটির অর্থ উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে, প্রত্যেকে নিজ মার্গ অনুযায়ী আকাশসমূহের দিকে উত্থিত হয়ে থাকে এবং নিজ নিজ ঐশী নৈকট্যের ধরন অনুযায়ী رَفَعَ (তথা আত্মিক উন্নতি) থেকে অংশ লাভ করে থাকে। নবী এবং ওলীদের আত্মা পার্থিব জীবনে ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেই আকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে যা তাদের

আত্মার জন্য رَفَعَ-এর সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মৃত্যুর পর সেসব আত্মা সে আকাশে উপনীত হয় যা তাদের জন্য রাফাআ বা আত্মিক উন্নতির সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং যে হাদীসে সাধারণভাবে মৃত্যুর পর আত্মাসমূহকে (ঊর্ধ্বলোকে) ওঠানোর উল্লেখ রয়েছে সে হাদীসটিও এ বর্ণনাকে সমর্থন করে। যেহেতু এ বিতর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং পূর্বেও আমি এ সম্পর্কে বর্ণনা করে এসেছি, কাজেই এটি আর দীর্ঘ করার কোন প্রয়োজন নেই।

এখানে এ বিষয়টিও বর্ণনা করা যেতে পারে যে, কোন কোন তফসীরকারক যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ বাক্যটিতে تَوَفِّي শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু দেওয়াই বটে এবং এরপর যে رَافِعُكَ إِلَيَّ বাক্যটি রয়েছে এটিও স্পষ্ট মৃত্যু নির্দেশক হিসেবে আত্মার رَفَعَ (বা ঊর্ধ্বারোহণ)-এর বিষয়টিই বুঝাচ্ছে, সেহেতু তারা মহাচিন্তায় পড়ে নিজেদেরকে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান আয়াত ও শব্দের ধারা-বিন্যাশের সংশোধনকারী সেজে নিজেই ওস্তাদের আসন দখল করে আয়াতটির সংশোধনী প্রস্তাব করে যে, এ জায়গায় رَافِعُكَ বাক্যাংশ পূর্বে আসবে এবং 'মুতাওয়াফ্ফিকা' مُتَوَفِّيكَ বাক্যটি পরে যাবে। কিন্তু দর্শকবৃন্দ জানেন যে, খোদা তা'লার সবচেয়ে বাক্যালংকারসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাণী সম্পর্কে এটা কতটা অযথা কথা এবং কতটা এ বাণীর সম্মানহানীর কারণ!

এ স্থলে এও জেনে রাখা ভালো যে, খোদা তা'লা যে হযরত মসীহ্ সম্পর্কে বলেছেন, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ [অর্থাৎ ইহুদীরা হযরত মসীহ্কে হত্যা করতে বা ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে পারে নি, বরং তাঁকে তাদের জন্য (ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি) সদৃশ করা হয়েছিল *(সূরা আন নিসা: ১৫৮)*– অনুবাদক]। এর অর্থ আদৌ এ টি নয় যে, হযরত মসীহ্ মারা যান নি। মারা যাওয়ার জন্য কি এটাই একমাত্র পথ যে, মানুষকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হবে?! বরং উল্লিখিত এই অস্বীকৃতির উদ্দেশ্য ও অর্থ হলো, তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক বা সূত্রে লেখা আছে, 'যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হয় সে খোদার অভিশপ্ত'। ইহুদীরা, যারা নিজেদের ধারণায় হযরত ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করেছিল, তারা তওরাতের উক্ত শ্লোক বা সূত্র অনুযায়ী মনে করতো যে ঈসা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আদৌ নবী ছিলেন না এবং খোদার কোন প্রিয় বান্দাও ছিলেন না। কেননা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হয়েছিল আর তওরাত বলছে যে, যাকে ফাঁসি দেয়া হয় সে অভিশপ্ত হয়ে থাকে। অতএব খোদা তা'লা প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে তাদের দাবিকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন, তাই তিনি বলেন, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম প্রকৃতপক্ষে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি এবং নিহিতও হন নি বরং তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

(২) প্রশ্ন: এটি কোথায় এবং কোন কিতাবে লেখা আছে যে, যে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তিনি সত্যি সত্যি মরিয়ম পুত্র মসীহ্ নন বরং তাঁর কোন সদৃশ বা প্রতিচ্ছবির কথা বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: এ কথাটি প্রধানত কুরআন শরীফেই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যখন পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেন নি যিনি মারা যান নি। যেমন– আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

[অর্থ: 'আর মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। নিশ্চয় তার পূর্বের সব রসূল গত হয়েছে। অতএব সে ও যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে কি তোমরা তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)*– অনুবাদক]।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ['আর আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন দান) করি নি' *(সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫)*– অনুবাদক]।

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ['আর আমরা তাদের এমন দেহবিশিষ্ট্য করে বানাই নি যারা খাবার খেত না আর তারা কখনো চিরকাল বেঁচেও থাকে নি।' *(সূরা আল আম্বিয়া: ৯)*– অনুবাদক]।

এ আয়াতগুলো ডংকার চোটে হযরত মসীহ্র মৃত্যুর সাক্ষ্য দিচ্ছে তা সত্ত্বেও তাঁকে জীবিত বলে ধারণা করা এবং وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ আয়াতটির স্পষ্ট অর্থের বিপরীতে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, হযরত মসীহ্ মাটির দেহসহ দ্বিতীয় আকাশে খাদ্যদ্রব্যের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই ফেরেশতাদের মতো জীবিত রয়েছেন– এটা প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার পবিত্র কালামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন বৈ কিছু নয়।

আবারও বলছি, হযরত মসীহ্ যদি মাটির এই দেহসহ (দ্বিতীয় আকাশে) জীবিত থাকেন তাহলে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে খোদা তা'লা কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুবরণের যুক্তি উপস্থাপন করাতে তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি আসতে পারে না, কেননা আবহমানকাল থেকে সকল নবীই মৃত্যুবরণ করে এসেছেন মর্মে যুক্তি উপস্থান একেবারেই অকেজো, অবান্তর ও সত্যের অপলাপ বলে সাব্যস্ত হবে। অথচ খোদা তা'লা কখনো মিথ্যা বা অবাস্তব কোন কথা বলতে পারেন না।

এখন জানা কথা যে, হযরত মসীহ্ যেহেতু মারা গেছেন তাই মৃত্যুর পর তিনি পৃথিবীতে আর আসতে পারেন না এবং কুরআন করীমে তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায়

জীবিত হওয়ারও কোন সংবাদ দেয়া হয় নি। কাজেই সন্দেহাতীতভাবে (এ উম্মতে) আগমনকারী মসীহ্ প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের কোন সদৃশ বা প্রতিচ্ছবি হবেন। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রয়াত মসীহ্র চেহারা এক রকম বর্ণনা করেছেন এবং আগমনকারী মসীহ্র হুলিয়া ভিন্ন রকম বলে প্রকাশ করেছেন। আর বিগত মসীহ্ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু আগমনকারীকে তাঁরই উম্মত বলে অভিহিত করেছেন, যেমন امامكم منكم (অর্থ: তিনি তোমাদেরই মধ্যহতে তোমাদের ইমাম হবেন)– হাদীসটি থেকে সুপ্রতিভাত। তাছাড়া علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل– হাদীসটিতেও মসীহ্র সদৃশ তাঁর প্রতিচ্ছবির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অতএব তদোনুযায়ী আগমনকারী মসীহ্ 'মুহাদ্দাস' (অর্থাৎ অজস্র ওহী প্রাপ্ত) হওয়ার কারণে রূপকভাবে নবীও বটে। সুতরাং এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট বর্ণনা আর কি হতে পারে?! তাছাড়া হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যার আত্মা উঠানো হয়েছ–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

অনুসারে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। তাই এখন কী করে পুনরায় এ কষ্টনিবাসে ফিরে আসবেন? যদিও একথা আমরা মানি যে, প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে বেহেশতে পুরোপুরি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়েছে তা থেকে খোদার নৈকট্য প্রাপ্তদের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় না।

(৩) প্রশ্ন: হযরত মসীহ্র পুনরাগমন সংক্রান্ত ধারণার খণ্ডনে মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত আর প্রত্যেক সত্যপরায়ণ মুমিন মারা যাওয়ার পরে পরে জান্নাতে প্রবেশ করে থাকে এবং وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ [অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশকারীদের সেখান থেকে আর কখনো বহিষ্কার করা হবে না' *(সূরা আল হিজর: ৪৯)*] আয়াত অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি চিরকাল বেহেশতে থাকার অধিকার রাখে মর্মে যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা সঠিক নয়, কেননা এটি যদি সঠিক হয় তাহলে উযাইর নবী সম্পর্কে কুরআন করীমে এ মর্মে বর্ণিত বৃত্তান্তটি সত্য নয় যে, তিনি একশ' বছর যাবৎ মৃতাবস্থায় থাকার পর খোদা তা'লা তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন। সত্য না হওয়ার কারণ হলো, উল্লিখিত কাল্পনিক নীতি অনুযায়ী উযাইর জীবিত হলে এটা মানতে হবে যে, তাঁকে বেহেশত থেকে বের করা হয়েছিল। একইভাবে মৃতদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়া এবং হিসাবনিকাশের তথা হাশরের ময়দানে বিশ্বপ্রতিপালকের সকাশে তাদের উপস্থিত হওয়া– এসবই উল্লিখিত আয়াতের এ

অর্থ করার দরুন অর্থাৎ সত্যপরায়ণ মু'মিনগণ মারা যাবার পরে পরেই জান্নাতে প্রবেশ করেন এবং এরপর তাদের আর কখনো বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হয় না– ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় এবং ইসলামের সর্বস্বীকৃত বিষয়াদির ক্ষেত্রে ভয়ংকর এক বিপর্যয় দেখা দেয়।

উত্তর: স্পষ্ট হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষেই এটা সত্য যে, বেহেশতে যাকে প্রবেশ করানো হয় তাকে কখনো আর বহিষ্কার করা হয় না। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু মু'মিনদের এ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন:

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশকারীরা সবরকম দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং তাদের কখনো আর বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হবে না *(সূরা আল হিজর: ৪৯)*। আরেক জায়গায় বলেন:

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

অর্থাৎ সৌভাগ্যবান লোক মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী বহাল থাকবে এবং এ আকাশ ও পৃথিবীকে যদি বদলেও দেয়া হয়– যেমনটি কিয়ামতের সময় হবে, সৌভাগ্যবান লোকদের বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হবে না এবং সবকিছু নষ্ট হয়ে গেলেও বেহেশত কখনো নষ্ট হতে পারে না। কেননা বেহেশত তাদের জন্যে এমন এক প্রতিদান যা থেকে তারা কখনো বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত হবে না।' *(সূরা হুদ: ১০৯)*

একইভাবে কুরআন করীমের অন্যত্রও বা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বেহেশবাসীদের সদাসর্বদা বেহেশতে বসবাস করার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *(সূরা আল বাকারা: ২৬)*

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *(সূরা আল বাকারা: ৮৩)* ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর এ-ও স্পষ্ট যে, অন্তর্ধানের পর মু'মিনের তৎক্ষণাৎ বেহেশতে স্থান লাভ হয়। যেমন, এ আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে:

(১) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ [অর্থ: তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, 'হায়' আমার জাতিও যদি জানতে পারত,

আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন' *(সূরা ইয়াসীন: ২৭-২৮)* –অনুবাদক]।

(২) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي-وَادْخُلِي جَنَّتِي *(সূরা আল ফাজর: ৩০-৩১)*

(৩) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ *(আলে ইমরান: ১৭০-১৭১)*

হাদীসে এতো ব্যাপকভাবে এ সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে, যা পুরোপুরি লেখা হলে বিষয়টি দীর্ঘায়িত হবে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেন: 'আমাকে দোযখ দেখানো হয়, সেখানে আমি বেশিরভাগ স্ত্রীলোকদের দেখতে পাই। এরপর আমাকে বেহেশত দেখানো হয়, সেখানে আমি যাদের দেখেছি তাদের বেশির ভাগ দরিদ্র শ্রেণির মানুষ।' আর ইঞ্জিল লুক, ১৬ অধ্যায়ে একটি কাহিনির আদলে বর্ণনা রয়েছে যে, 'লা'জর নামের এক গরিব ব্যক্তি মারা গেলে তাকে ইব্রাহীম (আ.)-এর কোলে তুলে দেয়া হয় অর্থাৎ নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে রাখা হয়। কিন্তু একজন ধনী ব্যক্তি সে-সময়ে মারা গেলে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সে লা'জরের কাছে ঠাণ্ডা পানি চাইলে তাকে তা দেয়া হয় নি।'

এছাড়া, এমন আয়াতসমূহও রয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, 'হাশর' বা 'পুনরুত্থান সমাবেশ' হবে এবং হিসাব-নিকাশের পর বেহেশতিদের বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দোযখীদের দোজখে ঢুকানো হবে; এ উভয় শ্রেণির আয়াতসমূহে আপাতদৃষ্টে স্ববিরোধ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু কুরআন করীমে ও হাদীসে মৃত্যুর পরে পরে পবিত্র আত্মাগুলোর বেহেশতে প্রবেশ করা স্বতঃস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে প্রমাণিত। এমন একটিও আয়াত বা হাদীস খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে প্রমাণিত হয় যে, 'হিসাবনিকাশ দিবসে' (তথা হাশরে) বেহেশতবাসীদের বেহেশত থেকে বের করা হবে। পক্ষান্তরে ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেহেশতবাসীদের চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করার কথা কুরআন করীম ও হাদীসে বহু জায়গায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে অন্য দিকে এ-ও প্রমাণিত যে, কবর থেকে মৃতদের পুনরুত্থান হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত শুনার জন্য খোদার সামনে দণ্ডায়মান হবে, আমল ও ঈমানের ঐশী-তুলাদণ্ডে পরিমাপ তার সামনে তুলে ধরা হবে। এরপর বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য লোকদের বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে আর যারা দোযখে জ্বলার যোগ্য তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এখন জানা আবশ্যক যে, পবিত্র আয়াত ও হাদীসসমূহে বিদ্যমান স্ববিরোধটির নিরসনের উদ্দেশ্যে, মৃত্যুর পর সমস্ত মানবাত্মা এক বিলুপ্তির অবস্থায় থাকে মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা আবশ্যক নয় যে, তারা কোন সুখ-শান্তিও লাভ করে না, আর কোন রকম শাস্তিও পায় না। জান্নাত থেকে আসা শীতল বায়ু তাদের প্রাণ জুড়ায় না, আর দোজখের উষ্ণবায়ু এসে তাদের দগ্ধ করে না! এমন বিশ্বাস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রাঞ্জল ভাষ্যসমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। পরলোকগত ব্যক্তির জন্যে যে দোয়া করা হয় বা সদকা-খয়রাত করা হয় এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে মিসকিন ও অভাবী লোকদের খাবার খাওয়ানো হয় বা কাপড় ইত্যাদি দান করা হয়– পুনরুত্থানের পূর্বের মধ্যবর্তী সময়কালে যদি পরলোকগত মানুষদের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের একেবারেই সম্পর্ক না থাকে, তাহলে (শরীয়ত নির্দেশিত) এসব সৎকাজ দীর্ঘকাল ব্যাপী বৃথা বলে বিবেচিত হবে এবং এটি মানতে হবে যে এই মধ্যবর্তী যুগে পরলোকগতদের সুখ-দুঃখ এবং শাস্তি-পুরস্কারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। অথচ এরূপ ধারণা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষামালার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

অতএব সেই প্রকৃত বিষয়টি যার মাধ্যমে উল্লিখিত উভয় প্রকার আয়াতের আপাতবিরোধ দূর হয় সে বিষয়টি হচ্ছে, জান্নাত ও জাহান্নাম তিনটি স্তর বা ধাপে বিভক্ত। প্রথম স্তরটি একটি নিম্নপর্যায়ের স্তর। এর সূচনা হয় তখন থেকে, যখন মানুষ এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তার কবরে শায়িত হয়। এই নাজুক স্তরটিকে রূপক ভাষায় হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যকার একটি হচ্ছে, একজন মৃত সৎ বান্দার জন্য কবরে জান্নাতমুখী একটি জানালা খোলা হয় যে পথ দিয়ে সে জান্নাতের সুদৃশ্য বাগান ও এর মনোমুগ্ধকর সমীরণ উপভোগ করে থাকে। সে-জানালাটির প্রশস্ততা মৃতব্যক্তির ঈমান-আমল তথা সৎকর্মের মান অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু একই সাথে এ-ও লেখা আছে যে, যাঁরা 'ফানা ফিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্তে বিলিন অবস্থায় ইহজগৎ ত্যাগ করে থাকেন অর্থাৎ তাঁরা তাদের প্রিয় জীবনকে প্রকৃত প্রেমাস্পদের পথে বিলিয়ে দেন যেমন, শহীদগণ বা সেই সিদ্দীকগণ যাঁরা শহীদের চেয়েও বহুগুণ অগ্রগামী হয়ে থাকেন। তাঁদের জন্য তাদের অন্তর্ধানের পর বেহেশতের দিকে কেবল জানালাই খোলা হয় না, বরং তাঁরা তাঁদের সমস্ত সত্তা ও সমস্ত বৃত্তিসহ বেহেশতে প্রবেশ করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিয়ামত দিবসের পূর্বে পূর্ণতম মাত্রায় জান্নাতের স্বাদ ও আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন না।

অনুরূপভাবে এ স্তরটিতে নোংরা মৃতব্যক্তির জন্য 'কবরে' একটি জানালা খোলা হয়, যে পথ দিয়ে দোজখের দাহকারী ভাপ আসতে থাকে এবং এর স্ফুলিঙ্গে সেই নোংরা আত্মা জ্বলতে থাকে। কিন্তু একই সাথে এ-ও নির্ধারিত রয়েছে যে, তারা তাদের সীমাহীন অবাধ্যতার দরুন শয়তানে আত্মবিলুপ্তির মাঝে পৃথিবী ছেড়ে যায় অর্থাৎ শয়তানের আনুগত্যের কারণে তারা তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের জন্য তাদের মৃত্যুর পর কেবল দোজখের দিকে জানালাই খোলা হয় না, বরং তারা তাদের সমস্ত সত্তা ও (শাস্তি অনুভবের) ইন্দ্রিয়সহ বিশেষ দোজখে নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' বলেন:

مِّمَّا خَطِيٓـَٔاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا [অর্থাৎ এদের পাপাচারের দরুন এদের ডুবিয়ে দেয়া হলো, এরপর আগুনে প্রবেশ করানো হলো' *(সূরা নূহ: ২৬)*– অনুবাদক]। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব লোক 'কিয়ামত দিবসের পূর্বে পুরোপুরি ও পূর্ণমাত্রায় জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করবে না।

দ্বিতীয় ধাপ: জান্নাতি ও দোজখিদের জন্য প্রথমে বর্ণিত ধাপটির ঊর্ধ্বে জান্নাত বা দোজখে প্রবেশের পূর্বে আরেকটি স্তর রয়েছে যেটিকে মধ্যবর্তী ধাপ বলা উচিত। এটি দেহ একত্রিত হওয়ার পর এবং (জান্নাতিদের) চূড়ান্ত 'জান্নাতে ও জাহান্নামীদের চূড়ান্ত জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে অর্জিত হয়ে থাকে। দেহের সাথে সম্পর্কের কারণে, উৎকর্ষ শক্তিবৃত্তিতে উচ্চতর মাত্রায় গতি সৃষ্টি হয়ে এবং ঐশী করুণা কিংবা ঐশী-ক্রোধের 'বিকাশ নিজের অবস্থানুসারে পূর্ণাকারে পরিদৃষ্ট হয়ে আর মহান জান্নাতকে অতি নিকটে পেয়ে কিংবা বড়ো জাহান্নামকে খুবই কাছে পেয়ে সেসব আনন্দ বা শাস্তি বর্ধনশীল হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' স্বয়ং বলেন:

(১) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ [অর্থাৎ 'আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপথগামীদের জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে।' *(সূরা আশ্ শুআরা: ৯১-৯২)*]

(২) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ . وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ . تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

[অর্থাৎ 'সেদিন কতগুলো চেহারা হবে উজ্জ্বল, হাস্যোজ্জ্বল (ও) আনন্দিত। আর সেদিন কতগুলো চেহারা হবে ধূলোমলিন। কালিমা সেগুলোকে ছেয়ে ফেলবে। এরাই

অস্বীকারকারী, পাপাচারী।' *(সূরা আবাস: ৩৯-৪৩)*] এ দ্বিতীয় ধাপটিতেও সব মানুষ সমান হয় না বরং উচ্চ পর্যায়েরও হয়ে থাকে, যারা বেহেশতবাসী হিসেবে জান্নাতী দ্যুতি ও জ্যোতিতে আলোকিত হয়। এঁদেরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ [অর্থাৎ 'তাদের নূর তাদের সামনেও ধাবিত হবে এবং ডান দিকেও *(সূরা আত তাহ্রীম: ৯)*।] অনুরূপভাবে দোজখী হিসেবে যারা চরম পর্যায়ের অস্বীকারকারী হয়ে থাকে তারা পুরোপুরি দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের হৃদয়ে দোজখের আগুন প্রজ্বলিত করা হয়। যেমন, আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' বলেন: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ [অর্থাৎ 'এটা আল্লাহ্র জ্বালানো আগুন যা হৃদয়সমূহে আঁছড়ে পড়বে *(সূরা আল হুমাযাহ্: ৭-৮)*।]

অতঃপর উল্লিখিত ধাপের ঊর্ধ্বে শেষ ধাপটিই হচ্ছে তৃতীয় ধাপ। এটিই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ধাপ যেখানে হিসাবনিকাশ দিবসের পর মানুষ প্রবেশ করে এবং পূর্ণ মাত্রায় সৌভাগ্যের কিংবা দুর্ভোগের স্বাদ গ্রহণ করবে। এখন মোদ্দাকথা এই যে, উল্লিখিত তিনটি ধাপেই মানুষ এক ধরনের বেহেশতে কিংবা এক প্রকার দোজখে অবস্থান করে। অবস্থা যখন এটাই, তখন স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, উল্লিখিত ধাপ ও স্তরগুলোর কোনোটিতেই অবস্থানকালে মানুষ বেহেশত কিংবা দোজখ থেকে বহিষ্কৃত হয় না। তবে কোনো এক ধাপ বা স্তর থেকে যখন কেউ উন্নতি করে, তখন সে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উঠে যায়।

উল্লিখিত উন্নতির একটি রূপ হলো, উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যখন ঈমান ও কর্মের তুচ্ছ মানে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তখন তার জন্য বেহেশতমুখী একটি ছোট্ট ছিদ্র করে দেয়া হয়। কেননা স্বর্গীয় জ্যোতির্বিকাশের কেবল সে পরিমাণেই তার মাঝে ধারণক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। এরপর, সে যদি পুণ্যবান সন্তান রেখে মারা গিয়ে থাকে– যারা চেষ্টাসাধনা বা কষ্ট করে তার মাগফিরাতের নিয়্যতে মিসকিনদের খয়রাত দান করে, অথবা এমন কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি যদি তার মাগফিরাত কামনা করে কাতরচিত্তে দোয়া করেন যাঁকে সে ভালোবাসতো অথবা পরলোকগত সে ব্যক্তি যদি ইহকালে কোনো জনহিতকর কাজ করে থাকে, যার দরুন আপামর জনতা উপকৃত হয়, এর বদৌলতে জান্নাত অভিমুখে তার জন্য খোলা জানালাটি প্রতিনিয়ত প্রশস্ততর হতে থাকবে এবং سبقت رحمتی علی غضبی সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ 'আমার করুণা আমার ক্রোধের চেয়ে এগিয়ে গেছে নীতি) সেটিকে আরো প্রশস্ততর করতে থাকবে। এমনকি, সে জানালা একটি সুপ্রশস্ত দরজায় পরিণত হয়ে অবশেষে এ বিষয়টি এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, শহীদ ও সিদ্দীকগণের মতো সে ব্যক্তি বেহেশতেই প্রবেশ লাভ করে। এ বিষয়টি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন যে, শরীয়ত

ও ন্যায় এবং বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক অহেতুক ধারণা যে, একজন পরলোকগত সৎ মুসলমানের জন্য তার অন্তর্ধানের পর এক প্রকার কল্যাণধারা প্রবহমান থাকা সত্ত্বেও এবং তার জন্য পুণ্য ও সৎকাজের সুফলসমূহ উন্মুক্ত থাকবে কিন্তু তা সত্ত্বেও বেহেশতের দিকে উন্মোচিত জানালাটির প্রশস্ততা চিরকাল কেবল সেটুকুই থাকবে যেটুকু তার মৃত্যুর অব্যবহিত পর প্রথম দিন খোলা হয়েছিল!

স্মরণ রাখা উচিত, খোদা তা'লা এ জানালাটি খোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে এত আয়োজন করে রেখেছেন যাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহানুভব ও পরম করুণাময় খোদার প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা হলো, এক কণা পরিমাণ ঈমান ও আমল নিয়েও যদি কেউ তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তাহলে সে কণাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যদি ঘটনাচক্রে সেইসব কল্যাণধারা যা মৃতব্যক্তি এ জগতের দিক থেকে পেয়ে থাকে তা সবই হারিয়ে যায় তাহলেও এসব উপকরণ কোনভাবে উধাও হতে পারে না। কেননা সকল মু'মিন পুণ্যবান এবং শহীদ ও সিদ্দীকদের জন্য তাগিদপূর্ণ এ নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সে সকল ভাইয়ের জন্য সর্বান্তঃকরণে মাগফিরাত কামনায় দোয়া করতে থাকেন যারা তাদের পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এ কথা স্পষ্ট যে, যাদের উদ্দেশ্যে মু'মিনদের একটি জামা'ত দোয়া করে থাকেন, সে দোয়া কখনো বৃথা যাবে না বরং এ সমস্ত দোয়া প্রতিনিয়ত কাজ করছে– পরলোকগত পাপী ও দুর্বল মু'মিনদের জন্য বেহেশত অভিমুখে উন্মুক্ত জানালাগুলোকে সতত সুপ্রশস্ত করে চলেছে। এসব দোয়া আজ পর্যন্ত অগণিত জানালাকে এতটা প্রশস্ত করে দিয়েছে যে, এমন অগণিত লোক জান্নাতে পৌঁছে গেছে অথচ তাদের প্রাথমিক দিনগুলোতে জান্নাত দেখার জন্য শুধু একটি ছোটো জানালা দেয়া হয়েছিল।

এ যুগের সে সব মুসলমান যারা একত্ববাদী হওয়ার দাবি করে তারা এ বিশ্বাসে ভ্রান্তির শিকার হয়ে আছেন যে, মৃত্যুর পরে পরে বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভকারী হবেন কেবল শহীদগণ। আর বাকি সমস্ত মু'মিন এমন কি নবী রসূলগণকে 'হিসাবনিকাশ দিবস' পর্যন্ত বেহেশতের বাইরে রাখা হবে। তাঁদের জন্য বেহেশতের দিকে কেবল একটি জানালা খোলা হবে। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত ভাবেন নি যে, নবী ও সিদ্দীকগণ কি আধ্যাত্মিকভাবে শহীদদের চেয়ে উন্নততর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নন? বেহেশত থেকে দূরে থাকা কি এক ধরনের শাস্তি নয় যা কখনো ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকদের ক্ষেত্রে ভাবাও যায় না! এমন ব্যক্তিবর্গ কি সৌভাগ্য ও সাফল্যের ক্ষেত্রে শহীদদের চেয়ে পিছিয়ে থাকতে পারে যাদের সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ [অর্থাৎ 'কতক আছেন যাদের তিনি মর্যাদায় উন্নীত

করেছেন' *(সূরা আল বাকারা: ২৫৪)*– অনুবাদক]! পরিতাপ এ লোকগুলো না বুঝে ইসলামের সমুজ্জ্বল শরীয়ত বিধানকে পাল্টে দিয়েছে! এদের ধারণায় সবার আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন শহীদগণ! আর হয়ত অগণিত বছর বা যুগের পর কোনো সময় নবী ও সিদ্দীকগণের পালাও আসবে!! মানহানির এ অভিযোগ উল্লিখিত এ লোকদের ওপর এতো গুরুতর যা অসার অজুহাত দেখিয়ে দূরীভূত হতে পারে না। নিঃসন্দেহে একথাটি অবশ্যই সবার জন্য বোধগম্য হওয়া সম্ভব যে, কর্ম ও বিশ্বাসে যাঁরা অগ্রগামী, তাঁদেরই জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য ও আগ্রগামী হওয়া উচিত। এমনটি হতে পারে না যে, তাঁদের জন্য দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকদের মতো কেবল জানালা খোলা হবে এবং শহীদরা দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ামাত্র বেহেশতের সব রকম ফল বেছে বেছে খেতে আরম্ভ করবেন! বেহেশতে প্রবেশ যদি পরিপূর্ণ ঈমান, পরিপূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ ও প্রাণপণ চেষ্টার ওপর নির্ভারশীল হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে নবী ও সিদ্দীকগণের চেয়ে অন্য কেউ এগিয়ে নেই– যাঁদের গোটা জীবন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়ে থাকে। খোদা তা'লার পথে তাঁরা এমন আত্মাবিলীন হয়ে থাকেন যে, তারা মৃতবৎ জীবন কাটিয়ে দেন আর তাঁরা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যাতে খোদা তা'লার পথে তাদের শহীদ করা হয়, এরপর জীবিত হন পুনরায় যেন শহীদ করা হয় আবার জীবিত হন আবার যেন তাদের শহীদ করা হয়।

এখন আমার এই পুরো বিবরণ হতে ভালোভাবে প্রমাণিত হল যে, বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য এমন সব জোরালো কারণ বিদ্যমান যাতে মু'মিনগণ প্রায় সবাই 'হিসাবনিকাশ দিবস'-এর পূর্বেই বেহেশতে পুরোপুরি প্রবেশ করবেন এবং 'হিসাবনিকাশ' তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করবে না বরং তখন বেহেশত তাঁদের আরও নিকটবর্তী হবে। জান্নাতকে কবরের নিকটবর্তী করার বিষয়টা জানালার উপমা দ্বারা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ব্যাপারটি কি এমন যে, কবর-সংলগ্ন ভূখণ্ডে জান্নাত এসে যায়? কক্ষনো এমনটি নয়। বরং আধ্যাত্মিকভাবে নিকটবর্তী করা হয়। তেমনই, আধ্যাত্মিকভাবে বেহেশতবাসী হিসাবনিকাশ বা হাশরের ময়দানেও অবস্থান করবেন, সেই সাথে বেহেশতেও অবস্থান করবেন। আমাদের মহানবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার কবরের নীচে বেহেশতের বাগান বা রওজা রয়েছে।' এ পবিত্র বাণীটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন, এটি কোন কথার দিকে ইঙ্গিত?

উযায়র (আ.)-এর মারা যাওয়া এবং একশ বছর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কিত উত্থাপিত যুক্তিটি বিরোধীদের কোনো কাজে আসবে না। কেননা, আদৌ বলা হয় নি যে, উযায়রকে জীবিত করার পর পুনরায় তাঁকে এ দুনিয়ার দুঃখ-নিবাসে পাঠানো হয়েছে যে কারণে আবশ্যকীয়ভাবে তাঁকে বেহেশতে থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল মর্মে বিপত্তি দেখা দিতে পারত। সত্য কথা হলো, সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা হলে কেবল এটাই প্রমাণিত হবে যে, খোদা তা'লার শক্তি নিদর্শনস্বরূপ এক মুহূর্তের জন্য উযায়রকে জীবিত করে দেখায় যাতে উযায়রকে তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তুলতে পারেন। কিন্তু দুনিয়ায় তার এই আসাটি ক্ষণস্থায়ী ছিল। সত্যিকার অর্থে উযায়র (আ.) বেহেশতেই ছিলেন। জেনে রাখা ভালো যে, সকল নবী ও সিদ্দীক মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হন এবং একটি জ্যোতির্ময় দেহ তাঁদের দান করা হয়। কখনো কখনো জাগ্রত অবস্থায় (পরলোকগত) সত্যপরায়ণ পুণ্যবানদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করে থাকেন– যেমন, এই ক্ষেত্রে এ অধম নিজে অভিজ্ঞতা রাখে। অতএব খোদা তা'লা যদি উয়ায়র (আ.)-কে পুনর্জীবিত করে থাকেন তাহলে এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? এ জীবনের এ অর্থ করা হয় যে, তিনি জীবিত হয়ে বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন– নিঃসন্দেহে এটি এক আশ্চর্য রকম অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। সত্যকথা হলো, উল্লিখিত পুনর্জীবনের দরুন জান্নাতি জীবনের বিষয়টি অধিক স্পষ্টতার সাথে প্রকাশ পায়।

(৪) নং প্রশ্ন: কুরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম জীবিত আছেন। আয়াতটি হলো: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ *(সূরা আন নিসা: ১৬০)* এর অর্থ হচ্ছে, 'মসীহ্র মৃত্যুর পূর্বে সকল 'আহলে কিতাব' তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।' অতএব এ আয়াতের মর্মমূলে প্রতীয়মান হয় যে, অবশ্য অবশ্যই তাঁর প্রতি সকল আহলে কিতাব (ইহুদী)-এর ঈমান আনা পর্যন্ত হযরত মসীহ্ জীবিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

উত্তর: স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলছি, প্রশ্নকারী ভ্রমবশত ধারণা করে বসেছেন যে, আয়াতটির মর্ম ও উদ্দেশ্য হলো, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আহলে কিতাবের তথা ইহুদীদের সকল ফির্কার তাঁর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক। কেননা আমরা যদি কথার কথা ধরে নেই যে উল্লিখিত আয়াতের অর্থ সেটিই যেমনটি প্রশ্নকারী মনে করেন, তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে মানতে হবে যে, হযরত

মসীহ্‌র ঊর্ধ্বগমনের যুগ থেকে তাঁর পুনরাগমনের যুগ পর্যন্ত দুনিয়া জুড়ে যত ইহুদী মারা গেছে বা এখন জীবিত আছে কিংবা ভবিষ্যতে আরও যারা জন্ম নেবে তারা সবাই অবশ্য অবশ্যই হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে। অথচ এ ধারণাটি স্পষ্টত ভ্রান্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালোভাবে জানে যে, এ যাবৎ গণনাতীত ইহুদী হযরত মসীহ্‌র নবুয়্যত অস্বীকার করে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কত ইহুদী তাঁর অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা যদি এটিই হতো যে, পরলোকগত সকল ইহুদী মসীহ্‌র আকাশ থেকে নেমে আসার সময় ঈমান আনবে তাহলে তিনি ততদিন পর্যন্ত তাদের জীবিত রাখতেন যতদিন পর্যন্ত মসীহ্ আকাশ থেকে নেমে না আসেন। কিন্তু মারা যাওয়ার পর আর তাদের পক্ষে ঈমান আনয়ন কি করে সম্ভব? কিছু লোক চরম কৃত্তিমতার আশ্রয় নিয়ে জবাব দিয়ে থাকেন, 'সম্ভবত হযরত মসীহ্‌র অবতরণকালে খোদা তা'লা সেইসব আহলে কিতাবকে পুনরায় জীবিত করবেন যারা মসীহ্‌র আবির্ভাবকাল থেকে তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত অবিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।' এর উত্তর হলো, এমনিতে কোনো কাজই খোদা তা'লার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু বিতর্কের বিষয় হলো, কুরআন করীম এবং সহীহ্ হাদীসে এসব ধ্যানধারণার কোন নামনিশানা খুঁজে পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে কেন তা উপস্থাপন করা হয় না?

কিছু লোক খানিকটা লজ্জিত হয়ে চাপাস্বরে এ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, 'আহলে কিতাব' বলতে সেসব ইহুদী লোকদের বুঝায়, যারা মসীহ্‌র পুনরাগমনকালে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে। তারা সবাই হযরত মসীহ্‌কে দেখামাত্র ঈমান আনবে। মারা যাওয়ার আগেই তারা সবাই মু'মিনদের দলভুক্ত হবে। কিন্তু এ ধারণাটিও এরূপ ভ্রান্ত যে, এ সম্পর্কে বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। প্রথমত উল্লিখিত আয়াতটি পরিষ্কারভাবে সাকুল্যের অর্থ দিচ্ছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, 'আহলে কিতাব' শব্দটি দ্বারা সার্বিকভাবে সেসকল আহলে কিতাব বুঝায় যারা ঈসার সময় এবং তাঁর পরে বরাবর জন্ম গ্রহণ করতে থাকবে। আয়াতটিতে এমন একটি শব্দও নেই যা আয়াতটিকে কোনো বিশেষ সীমিত সময়কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সীমাবদ্ধ করে। তাছাড়া, উপস্থাপিত ঐ অর্থটি স্পষ্টত ভ্রান্ত। কেননা সহীহ্ হাদীস উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে যে, মসীহ্‌র নিঃশ্বাসে তাঁর অস্বীকারকারী আহলে কিতাব হোক বা এর বাইরে কেউ হোক– তারা সবাই অবিশ্বাসের মাঝে মরবে।* আমার পক্ষ থেকে

** ত্রয়োদশ টীকা ২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

সংশ্লিষ্ট সেইসব হাদীস বারবার উদ্ধৃত করা মোটেও আবশ্যিক নয়। এ পুস্তকেই যথাস্থানে তা দেখে নেয়া উচিত। তাছাড়া, মুসলমানদের এটি স্বীকৃত বিশ্বাস যে, দাজ্জাল কিতাবধারীদের মধ্য থেকেই হবে এবং তারা এ-ও মানে যে, দাজ্জাল আগমনকারী মসীহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে না। অতএব উল্লিখিত হাদীসসমূহ পাঠ করে উক্ত ধারণার অনুসারীদের যে কত লজ্জায় পড়তে হয় তা আমার ধারণাতীত। এ বিষয়টিও স্বীকৃত– যা সহীহ্ মুসলিমে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত মসীহ্‌র বিদায়ের পর দুনিয়ায় কেবল দুষ্টলোক অবশিষ্ট থেকে যাবে যাদের ওপর কিয়ামত আপতিত হবে। কোনো কাফিরই যদি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে কিয়ামত কোথায় ও কেন ও কোত্থেকে আপতিত হবে?

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, (সূরা নিসার) উল্লিখিত আয়াতের তাঁরা যে অর্থ করেছেন এ অর্থ যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে এর সঠিক অর্থ কী? অতএব এর উত্তরে স্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সঠিক অর্থ সেটিই যা এ জায়গায় এ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো আয়াতে সার্বিক দৃষ্টিপাতে শিরোধার্য করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়– যা মেনে নেওয়ায় কোনো রকম বিপত্তি দেখা দেয় না। কাজেই প্রথমে উল্লিখিত আয়াতসমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি। এরপর এগুলোর আলোকে প্রমাণিত প্রকৃত অর্থ তুলে ধরবো।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۸﴾
بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۹﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿۱۶۰﴾

(সূরা আন নিসা: ১৫৮-১৬০)

অনুবাদ: ইহুদীরা যে খোদা তা'লার কৃপা ও ঈমান হতে বঞ্চিত হলো, এর কারণ হলো– তাদের কৃত সব মন্দ কার্যকলাপ। সেগুলোর একটি হলো তারা বলে, 'দেখ, আল্লাহ্‌র রসূল হওয়ার দাবিদার মরিয়মের পুত্র এই ঈসা মসীহ্‌কে আমরা হত্যা করেছি। (ইহুদীদের উক্তি 'আল্লাহ্‌র রসূল ঈসাকে হত্যা করেছি' এর অর্থ এ নয় যে তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে মানতো। কেননা তাই যদি তারা মানতো তা হলে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে কেনই বা তৎপর হতো? বরং তাদের এই উক্তি ছিল বিদ্রুপাত্মক। আর এই উপহাসের ভিত্তি তাওরাতে লেখা এ উক্তির ওপর ছিল যে, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়ে সে

অভিশপ্ত' অর্থাৎ খোদা তা'লার রহমত ও নৈকট্য হতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত। ইহুদীদের বক্তব্যটির উদ্দেশ্য ছিল, মরিয়ম পুত্র ঈসা সত্য রসূল হলে তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে কখনো সক্ষম হতো না। কারণ তাওরাত উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে যে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত ব্যক্তি অভিশপ্ত হয়ে থাকে।)

কুরআন করীম এর পরবর্তী আয়াতে বলে, সত্যিকার অর্থে ইহুদীরা মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌কে হত্যা করে নি এবং ক্রুশবিদ্ধ করেও মারতে সক্ষম হয় নি। বরং মেরে ফেলে অভিশপ্ত করেছে বলে যে ধারণা তারা তাদের অন্তরে পোষণ করে, এটি কেবল সন্দেহস্বরূপ; নিশ্চিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সামনে তাদের বোকামি ও নিজের সার্বিক সক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরার মানসে নিজেই তাদের সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে বলে যারা সন্দেহ-সংশয়ের ঘোরে পড়ে আছে তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত ও অকাট্য প্রমাণ নেই; তারা কেবল একটা ধারণার অনুসরণ করে চলেছে। বস্তুতপক্ষে তারা ভালোভাবেই জানে যে, মসীহ্‌র ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নেই। বরং সুনিশ্চিত কথা হলো, মসীহ্ পরলোকগমন করেছেন, স্বাভাবিক মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং খোদা তা'লা তাকে সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ বান্দাদের মতো সসম্মানে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। খোদা হলেন 'আযীয' তিনি তাদের সম্মানে ভূষিত করে থাকেন যারা সম্পূর্ণভাবে তাঁরই হয়ে যায়; এবং তিনি 'হাকীম' যিনি তাঁর অসীম ও অনন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞা দ্বারা সেসকল ব্যক্তিকে অনুগৃহীত করেন যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে।

এরপর আল্লাহ্ বলেন, 'আহলে কিতাব' তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে উল্লিখিত আমার সেই বর্ণনাটির– (যা আমি 'আহলে কিতাব' তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে প্রকাশ করেছি) প্রতি ঈমান রাখে না; মসীহ্ তাঁর স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে প্রকৃত ও বাস্তব সত্যের ওপর ঈমান আনার পূর্বে। অর্থাৎ আমাদের পূর্বের বর্ণনা যে, কোনো আহলে কিতাব তারা ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান একথায় আন্তরিক বিশ্বাস রাখে না যে, প্রকৃতপক্ষেই মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন, বরং মসীহ্ ক্রুশে নিহত হয়েছেন বলে তারা কেবল সন্দেহ ও ধারণায় নিপতিত। (আল্লাহ্ আরও বলেন,) আমাদের এ বর্ণনাটি সত্য, কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্য মসীহ্‌র মৃত্যুর সম্পর্কে তারা জানে না যে, সে কবে ও কখন মারা গেছে। কাজেই এর সংবাদ আমরা দিচ্ছি যে, সে মারা গেছে এবং তার আত্মাকে সসম্মানে আমাদের দিকে ওঠানো হয়েছে।'

এ স্থলে স্মর্তব্য, আল্লাহ্ তা'লার একথা বলা যে, 'এমন কোনো 'আহলে কিতাব' নেই, আমরা তাদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে যা বলেছি সেগুলোতে ঈমান রাখে না'– খোদা তা'লার এ কথাটি এক নিদর্শনমূলক বিবৃতি। এটি আয়াত ইহুদীর উদ্দেশ্যে খোদার কথা فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ [অর্থ: 'অতএব তোমরা সত্যবাদী হলে মৃত্যু কামনা কর' *(সূরা আল বাকারা: ৯৫)* – অনুবাদক]।

অতএব খোদা তা'লার এ ঘোষণাটির উদ্দেশ্য ছিল, ইহুদীদের দাবি হলো, তারা সত্যিই হযরত মীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছে, এর পেছনে তাদের কুমতলব ছিল এ ফলাফল নির্ণয় করা যে, হযরত মসীহ্ নাউযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত ছিলেন, সত্যবাদী নবী ছিলেন না। একইভাবে খ্রিষ্টানদের একথা বলা যে, হযরত মসীহ্ প্রকৃতপক্ষে ক্রুশে মারা গেছেন, এ বক্তব্যটি দ্বারা এ ফলাফল নির্ণয় করা ছিল তাদের অভীষ্ট যে, মসীহ্ খ্রিষ্টানদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উল্লিখিত উভয় ধারণা ভ্রান্ত ও অসত্য এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার কোনোটিরই উল্লিখিত ক্রুশীয় ঘটনার বিষয়ে আন্তরিক বিশ্বাস নেই, বরং তাদের অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাস কেবল এ বিষয়েই ছিল যে, মসীহ্ নিশ্চিতভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি। এ বিস্তৃত বর্ণনাটির পেছনে খোদা তা'লার এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের (খোদার চ্যালেঞ্জের মুখে) নিরবতা দেখে ন্যায় বিচার সম্পন্ন লোকেরা যাতে চূড়ান্তরূপে নিশ্চিত হয়ে যান যে, উল্লিখিত ব্যাপারটিতে সন্দেহ ছাড়া ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কাছে অন্য কিছুই নেই। ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা এ আয়াতটি শুনেও যে নির্বাক হয়ে রইল এবং অস্বীকার ব্যক্ত করার জন্য সৎসাহস নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো না এর এটাই কারণ ছিল যে, তারা ভালো করেই জানতো, তারা যদি মোকাবিলায় আসে এবং সে বিষয়ের দাবি করে যা তাদের হৃদয়ে অনুপস্থিত, তাহলে তারা ভীষণভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হবে যার ফলে তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হবে। এ কারণেই তারা মুখ খুলে নি আর চুপ থাকে। যদিও তারা ভালোভাবেই জানতো যে, তাদের নীরবতার মাধ্যমে তাদের মেনে নেওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যার মাধ্যমে এক দিকে সেই অস্বীকারকারীদের উক্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হবে এবং অন্য দিকে ইহুদীদের মনগড়া এই বিশ্বাস মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে যে, হযরত মসীহ্ খোদা তা'লার সত্যবাদী নবী এবং সত্যপরায়ণ নন এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত নন, খোদা তা'লার দিকে যাঁদের সসম্মানে 'রাফা' (তথা ঊর্ধ্বগতি) সাধিত হয়ে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্যুতিময় স্বর্গীয় তরবারি তাদের চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। অতএব কুরআন করীমে

তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে মৃত্যু কামনা (তথা মুবাহালা) কর।' কিন্তু ভয়ের কারণে কেউই মৃত্যু কামনা করেনি, অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও ভয়ের কারণে অস্বীকার করতে পারে নি অর্থাৎ এ দাবি করতে পারে নি যে তারা হযরত মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যুতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, কেন তাদের বিশ্বাসহীনদের মাঝে গণ্য করা হয়? কাজেই নবী (সা.)-এর যুগে তাদের নীরবতা চিরতরে একটি প্রমাণ হয়ে রইল এবং তাদের মনগড়া কথা ও সাজানো মিথ্যার প্রভাব তাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরদের ওপরও পড়েছে কেননা পূর্বসূরি-উত্তরসূরির জন্য উকিলস্বরূপ হয়ে থাকে এবং তাদের সাক্ষ্যসমূহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানতে হয়।

এখন দর্শকগণ অবশ্য বুঝতে পারছেন, হযরত মসীহ্ যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হন নি, বরং স্বাভাবিক ভাবে পরলোকগমন করেছেন–খোদা তা'লা যে এ বিতর্কটির সূত্রপাত করেছেন এর উদ্দেশ্য হলো, হযরত মসীহ্‌র ক্রুশীয় ঘটনা থেকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহুদী এবং খ্রিষ্টানগণ নিজেদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে ভিন্ন ভিন্ন দুটি ফলাফল বের করতো। ইহুদীরা বলতো যে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন এবং তাওরাত অনুযায়ী ক্রুশবিদ্ধ অভিশপ্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ ঐশী সান্নিধ্য হতে এবং 'রাফা' তথা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উন্নীত হওয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, অথচ নবুওয়্যতের মর্যাদা এরূপ লাঞ্ছনাজনক অবস্থার অনেক ঊর্ধ্বে।

আর খ্রিষ্টানগণ ইহুদীদের অভিসম্পাত ও নিন্দাবাদে অস্থির হয়ে তড়িৎ এ জবাব তৈরি করেছিল যে, মসীহ্‌র ক্রুশীয় ঘটনা তাঁর জন্য ক্ষতিকর নয়। বরং এ অভিশাপ তিনি বরণ করে নেন পাপীদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য। অতএব খোদা তা'লা এভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে, উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের উপরোক্ত বয়ান বিবৃতিকে এমর্মে বিলুপ্ত বা নস্যাৎ করে দিলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের কোনোটিরই হযরত মসীহ্‌র ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার সম্পর্কে দৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস নেই। যদি দৃঢ়বিশ্বাস থাকে তাহলে তারা সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হোক। কিন্তু তারা সবাই পলায়ন করল আর কেউ টুশব্দটি পর্যন্ত করার ধৃষ্টতা দেখায় নি। বস্তুত এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন করীমের একটি নিদর্শন যা এ যুগের নির্বোধ মৌলবীদের দৃষ্টির আড়ালে। আমি সেই পবিত্র ও মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ! এখনই এবং এই মুহূর্তে কাশফ বা দিব্যদর্শনে উল্লিখিত এ সত্যটি আমার প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেই প্রকৃত শিক্ষক প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেছি যা এইমাত্র লিখলাম। فالحمد لله على ذلك (অতএব এর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই– অনুবাদক)।

যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও সকল সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ বিবৃতির সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দেবে কেননা খোদা তা'লার কালাম (বাণী) বৃথা ও অহেতুক কথাবার্তার উর্ধ্বে হওয়াই যুক্তিযুক্ত আর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝবে যে, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের যদি এ মহান উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তাহলে এ পুরো বিবৃতিটি এতটা অন্তঃসারশূন্য বলে সাব্যস্ত হবে যার কোন অর্থ নেই কেননা এমতাবস্থায় কোনো নবীর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া বা স্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়ার বিতর্ক একেবারেই বৃথা বিতর্ক বলে প্রতীয়মান হয়, যার কোন সুফল প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব গভীর মনোনিবেশে লক্ষ করা উচিত যে, মসীহ্ (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ায় কোনো ইহুদী বা খ্রিস্টানের নিশ্চিত বিশ্বাস নেই যে, খোদা তা'লার এই জোরালো ও প্রতাপশালী ও দাপুটে বর্ণনাটির উদ্দেশ্য কি এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে যা প্রমাণ করার জন্য তিনি ইহুদী ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে নিশ্চুপ ও নির্বাক করে দেন? অতএব এ উদ্দেশ্য ও লক্ষটিই আল্লাহ্ তা'লা এ অধমের প্রতি নিজ দিব্যদর্শনে উন্মোচিত করেছেন যে, মৌলবীদের দৃষ্টিতে কাফির ও খোদাদ্রোহী!

اے خدا جانم بر اسرارت فدا　　اُمیاں را مے دہی فہم و ذکا
درجہانت ہمچومن اُمی کجا ست　　درجہالت ہا مرا نشو و نما ست
کرمکے بودم مرا کردی بشر　　من عجب تراز مسیحے بے پدر

(অর্থ: হে খোদা! তোমার রহস্যময় সূক্ষ্মতত্ত্বাবলির তরে প্রাণ মম উৎসর্গিত।
তুমি নিরক্ষরদের জ্ঞান এবং মেধাশক্তি দান করে থাক।

তোমার দুনিয়ায় আমার মতো নিরক্ষর আর কোথায়?
ঘোর অজ্ঞতার মাঝেই আমার প্রতিপালন ও বিকাশ॥

আমি ছিলাম এক নগণ্য কীট,
(হে খোদা!) তুমি আমায় (দীপ্তিমান) মানবে পরিণত করেছ।

আমি তো বিনা পিতায় জন্মলাভকারী মসীহ্র চেয়েও অধিক বিস্ময়কর॥– অনুবাদক)।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মসীহ্ (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রয়াত না হওয়ার বিষয়টি ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে কি, অর্থাৎ এটা প্রমাণিত হতে পারে কিনা যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধই করা হয়ে থাকবে কিন্তু হতে পারে যে এ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় নি অর্থাৎ মসীহ্ (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি?

অতএব এর উত্তর হলো, مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ (অর্থ: 'তাকে তারা হত্যাও করে নি এবং ক্রুশে দিয়েও তার মৃত্যু ঘটাতে পারে নি'– অনুবাদক) কুরআন করীমের এ ভাষ্য সম্পর্কে চারটি ইঞ্জিলই (সমর্থনসূচক) সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ مَا صَلَبُوْهُ বাক্যটি দ্বারা কুরআন করীমের কখনো এটি বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, মসীহ্ (আ.)-কে ক্রুশেই চড়ানো হয় নি। বরং এ বাক্যটির মর্ম হলো, ক্রুশে চড়াবার যে আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ ছিল অর্থাৎ হত্যা করা এর থেকে খোদা তা'লা মসীহ্ (আ.)-কে রক্ষা করেছেন। ইহুদীদের পক্ষ থেকে এ কাজ তথা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার পদক্ষেপ অবশ্যই নেয়া হয়, কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শনের সুবাদে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে নি। যেমন, ইঞ্জিলগুলোতে লেখা আছে, ঘটনা হলো, জেলে থাকা অবস্থায় ইহুদীরা যখন (রোমান শাসক) পিলাতের কাছে হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাদের হাতে হস্তান্তরের দাবি জানায়, তখন পিলাত অনেক চেষ্টা করলেন কোনোভাবে হযরত মসীহ্কে মুক্তি দেয়ার জন্য। কারণ তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, মসীহ্ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু ইহুদীরা চরম হঠকারিতা দেখিয়ে বলল, 'একে ক্রুশে দাও, ক্রুশবিদ্ধ কর।' আর ইহুদীদের সমস্ত আলেম, ফকীহ্ ও মুফতি সম্মিলিত হয়ে বলতে লাগল, 'সে (তথা মসীহ্) কাফির এবং মানুষকে সে তাওরাতের আদেশ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।' পিলাত ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সব আংশিক ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে একজন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করা কঠিন অপরাধ। তাই তিনি যেকোনো উপায়ে হযরত মসীহ্কে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু ইহুদী আলেম হুযূররা ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন না! তারা ঝটপট অন্য এক কথা বানিয়ে তুলে ধরেন, 'এ ব্যক্তি একথাও বলে যে সে ইহুদীদের রাজা। তাই ছদ্মবেশে সে রোমান সরকারের বিদ্রোহী। আপনি যদি একে মুক্ত করে দেন তাহলে মনে রাখবেন, একজন বিদ্রোহীকে আপনি আশ্রয় প্রশ্রয় দানকারী সাব্যস্ত হবেন।' তখন পিলাত ভয় পেলেন। কেননা তিনি রোমান সম্রাট সিজারের অধীনে ছিলেন। কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে তা সত্ত্বেও পিলাত এ অন্যায় রক্তপাতে ভীত ছিলেন। আর তার স্ত্রী ইতোমধ্যে স্বপ্নে দেখলেন যে, এ ব্যক্তি একজন সত্যপরায়ণ সিদ্ধ পুরুষ। পিলাত যদি তাকে হত্যা করে তাহলে এতেই বরং তা নিজের ধ্বংস অবধারিত। অতএব পিলাত এ স্বপ্নের বিষয়ে অবগত হয়ে আরও শিথিল হয়ে গেলেন। ইঞ্জিলে উল্লিখিত এ স্বপ্নটির সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিপাতে প্রত্যেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শক (বা পাঠক)

অনুধাবন করতে পারেন যে, হত্যা হতে মসীহ্‌কে রক্ষা করাই ছিল ঐশী অভিপ্রায়। অতএব এ স্বপ্ন থেকেই প্রথম ঐশী অভিপ্রায় সম্পর্কিত ইঙ্গিতটি প্রতীয়মান হয়। এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

এর পরের ঘটনা হলো যে, পিলাত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে বিচারিক ইজলাস করলেন এবং ইহুদী উলামা, ফকীহ্ ও মুফতী সাহেবদের নানাভাবে বুঝালেন তারা যেন মসীহ্ (আ.)-কে হত্যার চেষ্টা থেকে বিরত হয়। কিন্তু তারা বিরত হয় নি। বরং চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে, 'মসীহ্‌কে অবশ্য অবশ্যই ক্রুশে দেয়া হোক। সে মুর্তাদ হয়ে গেছে।' তখন পিলাত পানি আনিয়ে হাত ধুয়ে একথা বলেন, 'দেখ, আমি নিজে হাত ধুয়ে তার হত্যাকাণ্ড থেকে দায় মুক্ত হলাম'। তখন ইহুদী এবং তাদের মৌলবী ও মুফতিগণ সবাই বলল, 'এর খুনের দায়ভার আমাদের ওপর এবং আমাদের সন্তানসন্ততির ওপর বর্তাবে।

এরপর হযরত মসীহ্ তাদের হতে সমর্পিত হলেন। তাঁকে বেত্রাঘাত করা হলো। যত গালিগালাজ ও হাসিবিদ্রুপ তাঁর নিয়তিতে ছিল তা দিয়ে তারা তাঁকে জর্জরিত করলো। এরপর তারা তাঁকে ক্রুশে দিতে প্রস্তুতি নিলো। এটি ছিল শুক্রবার এবং আছরের সময়; আর ঘটনাচক্রে এই ইহুদীদের একটি ধর্মীয় পর্ব 'ঈদে ফাসাহ্'ও ছিল। এ কারণে তাদের হাতে সময় খুব কম ছিল। সামনে 'সাবত দিবস' আসন্ন ছিল যার সূচনা সূর্যাস্তের সময় থেকেই ধরা হতো। কেননা ইহুদীরা মুসলমানদের মতো পূর্ববর্তী রাতকে আগামীকালের দিনের সঙ্গে শামিল করতো। আর এটিও এক ধর্মীয় বিধানগত তাগিদ ছিল যে, 'সাবত' দিবসে কোনো মরদেহ ক্রুশে ঝুলানো থাকবে না। তাই ইহুদীরা তখন যথাশীঘ্র মসীহ্ (আ.)-কে এবং তার সঙ্গে দুজন চোরকেও ক্রুশ কাষ্ঠে চড়িয়ে দিল, যাতে সূর্যাস্তের আগেই ক্রুশবিদ্ধ সব লাশ নামানো যায়। কিন্তু হঠাৎ সে মুহূর্তেই এক তীব্র ও প্রচণ্ড ধুলোঝড় আরম্ভ হলে সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফলে ইহুদীরা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল, এখন ধুলোঝড়ের অন্ধকারেই যদি সন্ধ্যা হয়ে যায় তাহলে তারা সাবতের অবমাননার সেই অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে যার উল্লেখ ইতঃপূর্বেই করা হয়েছে। অতএব তারা এই দুশ্চিন্তার দরুন ক্রুশবিদ্ধ তিনজনকেই, ক্রুশকাষ্ঠ থেকে দ্রুত নামিয়ে দিল। স্মর্তব্য যে, সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত, সেকালের 'সলীব' বা ক্রুশ সে রকম ছিল না যেমন এ যুগে ফাঁসি দেয়া হয়, অর্থাৎ গলায় রশি পেঁচিয়ে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে জীবন সাঙ্গ করা হয়। এ ধরনের কোনো রশি গলায় পেঁচানো হতো না বরং দেহের মাত্র কয়েকটি অঙ্গে অর্থাৎ হাত ও পায়ে লোহা ঠুকে দেয়া হতো। তারপর

সাবধানতা স্বরূপ তিন দিন পর্যন্ত তাদের অনাহারে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা হতো। এরপর তাদের হাড়-গোড় ভাঙা হতো। তারপরে তারা নিশ্চিত হতো যে, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি এতক্ষণে নিশ্চিত মারা গেছে। কিন্তু খোদা তা'লার অসীম কুদরত প্রদর্শনের সুবাদে হযরত মসীহ্‌র সাথে উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোন কিছু ঘটে নি। সেদিন শুক্রবার 'ঈদে ফাসাহ্' এর ধর্মীয় পর্বের দরুন সময়ের অভাব ও বিকাল বেলার সামান্য সময় এবং এর পরেই সন্ধ্যা থেকে 'সাবত' দিবস শুরু হওয়ার আশঙ্কা আর ইতোমধ্যে প্রচণ্ড ধুলোঝড় ছেয়ে যাওয়া– এমন সব উপকরণের একসঙ্গে উদ্ভব হলো, যে কারণে কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজন চোরসহ হযরত মসীহ্‌কে দ্রুততম সময়ে ক্রুশ থেকে নামানো হলো। এরপর হাড়গোড় ভাঙার পালায় খোদা তা'লা তাঁর অসীম কুদরতের এক নিদর্শন দেখালেন, পিলাতের (অত্যন্ত বিশ্বস্ত এমন) কিছু সৈনিক তখন সেখানে উপস্থিত ছিল যাদেরকে পিলাতের স্ত্রীকে দেখানো স্বপ্নে পিলাতের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অদৃশ্যমূলকভাবে অনুধাবন করানো হয়েছিল যেন হযরত মসীহ্‌র ওপর থেকে কোন উপায়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার বিপদ কেটে যায়। যাতে এমন না হয় যে, মসীহ্‌র নিহত হওয়ার দরুন সেই স্বপ্ন ফলে যায় এবং যাতে এমন না হয় যে পিলাত কোন মারাত্মক বিপদে পড়ে যায়। তাই ঐ সৈনিকরা তৎক্ষণাৎ প্রথমে (ক্রুশকাষ্ঠ থেকে নামানো) দুই চোরের হাড় ভাঙ্গলো। তখন যেহেতু প্রচণ্ড ধূলিঝড় বইছিল আর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল তাই মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে বাড়ি ঘরের দিকে ছুটে যেতে আরম্ভ করেছিল। এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে সৈনিকরা চোরদের হাড়গোড় ভাঙার পর হযরত মসীহ্‌র পালা যখন আসলো তখন তাদের মধ্যে একজন তাঁর গায়ে হাত রেখে কথার ছলে বলে দিল, 'মসীহ্‌র তো মারা গেছেন। তাঁর হাড়গোড় ভাঙার প্রয়োজন নেই।' আরেকজন বলল, 'আমিই তার লাশ দাফন করে দেবো।' আর ধূলিঝড় আরও বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল রূপধারণ করলো আর সে ইহুদীদের ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বহিষ্কার করলো। অতএব এভাবে হযরত মসীহ্ জীবিতাবস্থায় রক্ষা পেলেন এবং নিরাপদে এক গোপন গুহায় থাকার পর তিনি হাওয়ারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কাছ থেকে নিয়ে এক সাথে বসে ভাজা মাছ খেলেন। কিন্তু ইহুদীরা যখন তাদের বাড়ি ঘরে পৌঁছলো এবং ঝড়েরও অবসান হলো তখন তারা তাদের অসমাপ্ত কার্যক্রমের দরুন সন্দেহের গহ্বরে নিপতত হলো আর সিপাহীদের সম্পর্কেও তাদের মনে সন্দেহ ঢুকলো।

আজ পর্যন্ত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অবস্থা তথৈবচ। তাদের কেউ কসম খেয়ে এবং কঠিন বিপদ ও শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলতে পারে না এবং কখনো পারবেও না যে, সে প্রকৃতপক্ষে এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সত্যি সত্যিই নিহত হয়েছেন। এসব সন্দেহ সে সময় থেকেই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। পৌল তার চাতুর্যের মাধ্যমে এগুলো মুছে ফেলার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু এসব সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব পৌলের লেখা কতক পত্র থেকে পরিষ্কার এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্কে যখন ক্রুশ থেকে নামানো হয় তখন তাঁর জীবিত থাকার সপক্ষে আরও একটি পাকাপোক্ত প্রমাণ যা বেরিয়ে আসে সেটি হলো: তাঁর পাঁজরে বর্শার ঘাই দেওয়ায় তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। ইহুদীরা তাদের তরাপরায়ণতা এবং খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিবরণের দিক দিয়ে এসব সন্দেহের অংশীদার হয়ে আছে। এমন কোনো খ্রিষ্টান নেই যে, ইঞ্জিলের বর্ণনায় গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তারপরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে, হযরত মসীহ্ সত্যি সত্যি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বরং তাদের হৃদয় আজও সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। যে প্রায়শ্চিত্যবাদ নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়, এর ভিত্তি এমন (চোরা) বালির ওপর স্থাপিত যে, স্বয়ং ইঞ্জিলের বর্ণনাই একে নস্যাৎ করে দিয়েছে। অতএব কুরআন করীমের উল্লিখিত আয়াত অর্থাৎ إِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ *(সূরা আন নিসা: ১৬০)*– এটি কখনো ভবিষ্যদ্বাণীরূপে নয়, যেমন কিনা গভীর জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবিদার আমাদের ভাই মৌলবী সাহেবান মনে করেন। বরং এটিতো সেসব ঘটনার বর্ণনা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধ্যানধারণার তখন যে চিত্র ছিল সেটি তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তিরূপে আল্লাহ্ পাক তাদের শোনাচ্ছেন এবং তাদের হৃদয়ের চিত্র তাদের সামনে প্রকাশ করছেন এবং তাদের অভিযুক্ত করে এটা বুঝাচ্ছেন যে, তাঁর এ বর্ণনা যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়ে তারা দাবি করুক যে, এগুলো ভুল তথ্য বা ভ্রান্ত সংবাদ দেয়া হচ্ছে এবং তারা নিজেরা কোনো সন্দেহ-সংশয়ের শিকার নয়, বরং সুনিশ্চিতভাবে বুঝে-শুনে বসে আছে যে, সত্যি সত্যি মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।

এস্থলে এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আয়াতটির শেষে قَبْلَ مَوْتِهِ (অর্থ: তার মৃত্যুর পূর্বে)-এ বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' এর প্রকৃত মর্ম এটিই বুঝিয়েছেন যে,

কেউ যেন مَاصَلَبُوْهُ অর্থাৎ 'মসীহ্‌কে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় নি'– কথাটি থেকে এ ফলাফল নির্ণয় না করে যে, মসীহ্ (আ.) যেহেতু ক্রুশে বিদ্ধকরণের মাধ্যমে নিহত হন নি, সেহেতু পরবর্তীতে তিনি আর মারা যান নি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টত বলে দিয়েছেন যে এসবই মসীহ্‌র স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বেকার অবস্থা। উল্লিখিত এ বাক্যটি দ্বারা কেউ যেন তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর অস্বীকার বুঝানো হয়েছে বলে ফলাফল নির্ণয় না করে। বরং এই স্বাভাবিক মৃত্যু ক্রুশীয় ঘটনার অনেক পরে সংঘটিত হয়। অন্য কথায়, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ইহুদী এবং খ্রিষ্টান উভয়ই আল্লাহ্‌র এ বর্ণনাটিতে সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে হযরত মসীহ্ নিশ্চিতভাবে ক্রুশীয় মৃত্যুতে মরেন নি; (মৃত্যু সম্বন্ধে তারা) নিছক সন্দেহে লিপ্ত। অতএব প্রকৃতপক্ষে মসীহ্‌র স্বাভাবিক মৃত্যুতে তাদের বিশ্বাস করার পূর্বে যা ঘটে গেছে, তারা মৃত্যুপূর্ববর্তী এর প্রাথমিক ঘটনাবলিতে ঈমান রাখে। মসীহ্ যেহেতু ক্রুশে মারা যান নি যে মৃত্যু দ্বারা ইহুদী ও খ্রিষ্টান উভয়ে তাদের বিশেষ উপসংহার টানতে চাইত কাজেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুতেও তাদের ঈমান তাদের জন্য আবশ্যক। কেননা জন্ম হলে মরণ অবধারিত, অনিবার্য। অতএব قَبْلَ مَوْتِهٖ-এর তফসীর হলো قبل ايمانه بموته (অর্থাৎ মসীহ্‌র স্বাভাবিক মৃত্যুতে সকল ইহুদী ও খ্রিস্টানের নিজের মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনার)– অনুবাদক।

আর দ্বিতীয়ত আয়াতটির এ অর্থও রয়েছে যে, হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়ার পূর্ব থেকেই এ সন্দেহ-সংশয়মূলক ধ্যানধারণা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাথায় চলে আসছে। অতএব এ অর্থ অনুযায়ীও কুরআন করীম 'ইশরাতুন্ নাসস্' তথা 'বাক্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত' স্বরূপ হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মোটকথা, কুরআন করীমে তিনটি জায়গায় হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়া সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবুও আক্ষেপ যে, আমাদের মৌলবী সাহেবান এ জায়গাগুলোতে দৃষ্টি দেন না এবং অত্যন্ত চালাকির সাথে বলেন, 'এটা তো আমরা মানলাম, কুরআন করীম এটাই বলে যে হযরত মসীহ্ মারা গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' কি পুনরায় তাঁকে জীবিত করে দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নন?' কিন্তু এ আলেমদের জ্ঞান-বুদ্ধির বহর দেখে কান্না পায়। হে উলামা মহোদয়গণ! আমরা এ-ও মানলাম ও মানি যে, খোদা তা'লা প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম, চাইলে তিনি (পরলোকগত) নবীদের সবাইকে জীবিত করে উপস্থিত করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন তো আপনাদের এমর্মে করা হয়েছিল যে, কুরআন করীম তো হযরত মসীহ্‌কে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিশ্চুপ রয়েছে। আপনাদের দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনে যদি এ মর্মে কোনো আয়াত থেকে থাকে যে, হযরত মসীহ্‌কে মৃত্যু দেওয়ার পর পুনরায় আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করেছেন, তাহলে সে আয়াতটি উপস্থাপন করুন। নচেৎ

এটা কুরআন করীমের বিরদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হওয়া বৈ কিছুই নয়– পবিত্র কুরআন তো হযরত মসীহ্ মারা গিয়েছেন বলে বর্ণনা করে, আর আপনারা এর বিপরীতে এ দাবি করেন যে, মসীহ্ (আ.) মারা যান নি বরং জীবিত আছেন!

কিছু উলামা অতি সরলতার কারণে এ আপত্তি উত্থাপন করেন: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ [অর্থ: 'আমি তোমাকে ওফাত তথা স্বাভাবিক মৃত্যু দেব' *(সূরা সূরা আলে ইমরান: ৫৬)*– অনুবাদক] আয়াতটির পরে যে رَافِعُكَ (অর্থ: 'আমি তোমাকে ওঠাবো' এবং بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [অর্থ: 'বরং আল্লাহ্ তাকে সসম্মানে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন' *(সূরা আন নিসা: ১৫৭)*– অনুবাদক] কুরআন করীমে এসেছে– এতে করে তাঁর জীবিত হওয়া প্রমাণিত হয়।' তারা বলেন, এ অর্থ যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে হযরত মসীহ্ ছাড়া অন্য কারো স্বপক্ষে رَافِعُكَ শব্দ আসে নি কেন?'

কিন্তু আমি এ 'ইযালায়ে আওহাম' পুস্তকেই এ যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ের সবিস্তারে উত্তর লিখে এসেছি যে, 'রাফা' শব্দের অর্থ সসম্মানে উঠানো ও উন্নীত হওয়াই বটে। যেমন, পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনের আত্মাকে সসম্মানে খোদা তা'লার দিকে ওঠানো হয়ে থাকে। আর হযরত মসীহ্র 'রাফা' হওয়ার কথা যে এ জায়গায় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এর কারণ হলো, হযরত মসীহ্কে সত্যের দাওয়াত বা প্রচার কাজে (পেলেস্টাইনে স্বল্পকালীন অবস্থানকালে) প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে হয়। ইহুদীরা মনে করেছিল, তিনি নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যেবাদী। কেননা (তাদের মতে তাওরাত অনুযায়ী) সত্য মসীহ্র পূর্বে এলিয়া নবীর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয়। অতএব, তারা অন্যান্য নবীর মতো হযরত মসীহ্র 'রাফা' তথা খোদা তা'লার দিকে সসম্মানে উত্থিত হওয়া সম্পর্কিত বিষয়টি অস্বীকার করলো। বরং তাঁকে তারা লা'নতী বা অভিশপ্ত বলে নির্ধারণ করলো। বস্তুত অভিশপ্ত সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে কিনা 'রাফা' তথা সসম্মানে উত্থিত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

অতএব এ কারণে খোদা তা'লা উক্ত অপবাদ থেকে হযরত মসীহ্কে মুক্ত ও পবিত্র সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। অতএব প্রথমে যে-ভিত্তিতে অথর্ব ও হতভাগা ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা হযরত মসীহ্কে নিজেদের অন্তরে অভিশপ্ত বলে নির্ধারণ করেছিল সে ভিত্তিটিকে আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। এরপর অতি স্পষ্টভাবে এ-ও বর্ণনা করেন যে, মসীহ্ নাউযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত নন, যে কারণে তাকে 'রাফা' (তথা সসম্মানে ঐশী সান্নিধ্যে) উন্নীত হওয়া থেকে বঞ্চিত রাখা যেতে পারে। বরং স্বাভাবিক ও সম্মানজনক মৃত্যুতে তাঁর 'রাফা' সাধিত হয়।

হযরত মসীহ্ যেহেতু একজন নিরীহ ও অসহায়ের মতো দুনিয়ায় কিছুদিন জীবনযাপন করে ইন্তেকাল করেন এবং ইহুদীরা তাঁকে লাঞ্ছিত করতে অতি মাত্রায় সীমালঙ্ঘন করে, তাঁর (পুতঃপবিত্র) মায়ের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে হযরত মসীহ্কে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করে এবং সত্যপরায়ণদের মতো তাঁর 'রাফা' সাধিত হওয়াকে অস্বীকার করে। কেবল ইহুদীরাই করে নি, বরং খ্রিষ্টানরাও উল্লিখিত দ্বিতীয় ধারণাটির বশবর্তী হয়ে পড়ে এবং অতি হীন ও জঘন্য ভাবে একজন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নিজেদের নাজাত বা পরিত্রাণের শঠতাপূর্ণ এই পথ বের করে। একটুও ভাবলনা যে, হযরত মসীহ্র অভিশপ্ত হওয়ার ওপরই কিনা নাজাত বা পরিত্রাণ নির্ভরশীল আর কেবল তখনই 'নাজাত' লাভ হয় যখন কিনা হযরত মসীহ্র মতো একজন সত্যপরায়ণ, সদাচারী ও খোদা তা'লার প্রিয় ব্যক্তিকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হয়! অতএব ধিক এরূপ মনগড়া পরিত্রাণের প্রতি! এর চেয়ে তো দোযখ হাজার গুণে শ্রেয়।

মোটকথা, হযরত মসীহ্র ক্ষেত্রে ইহুদী ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় যেহেতু ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বিবর্জিত নামসমূহের প্রয়োগ বৈধ করেছে, সেহেতু খোদা তা'লার আত্মাভিমানবোধ এই পবিত্র ও সদাচারী ব্যক্তির সম্মান সম্ভ্রম ও মর্যাদার স্বপক্ষে আবশ্যকীয়ভাবে সাক্ষ্য প্রদানে একটুও ছাড় দেয় নি। অতএব ইঞ্জিলে প্রদত্ত তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মনিব ও অভিভাবক খাতামুল মুরসালীন (সা.)-কে প্রেরণ করে কুরআন করীমে হযরত মসীহ্র সম্মান ও মর্যাদা ও 'রাফা'-এর সপক্ষে সাক্ষ্য দান করেন। [সূরা আলে ইমরান: ৫৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য– অনুবাদক]।

'রাফা' শব্দটি কুরআন করীমে কয়েক জায়গায় রয়েছে। এক জায়গায় 'বাল্আম' সম্পর্কিত বৃত্তান্তেও উল্লেখ রয়েছে: 'আমরা তার 'রাফা' চেয়েছিলাম, কিন্তু সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে,' *(সূরা আ'রাফ: ১৭৭)*। আর তেমনি (প্রচার কাজে বাধার দরুন) অক্ষম একজন নবীর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا [অর্থ 'আর আমরা তাকে এক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করি' *(সূরা মরিয়ম: ৫৮)*– অনুবাদক]। প্রকৃতপক্ষে তিনিও এমন একজন নবী ছিলেন যার 'রাফা'র কথা মানুষ অস্বীকার করেছিল। আর যেহেতু হযরত মসীহ্র মতো এ অধমকে অসম্মান করা হয়েছে, কেউ 'কাফির' আখ্যা দেয় আর কেউ 'মুলহিদ' এবং কেউ 'বেঈমান' বলে অভিহিত করে এবং মুফ্তি ও মৌলাবীগণ ক্রুশবিদ্ধ করতেও প্রস্তুত! যেমন, মিঞা আব্দুল হক (অমৃতসরী) তার প্রচারপত্রে লেখেন, 'এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের হাত

চালানো উচিত।' কিন্তু এ ব্রিটিশ সরকার রোমান শাসক পিলাতের চেয়েও অধিক নিরপরাধ ও নির্দোষদের তত্ত্বাবধান করে এবং পিলাতের মতো প্রজাদেরভীতির সামনে নতি স্বীকার করে না কিন্তু আমাদের এই জাতি লাঞ্ছিত করার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি, সত্যিকার অর্থে উভয় দিকে সাদৃশ্য দেখানোর জন্য এটি আবশ্যক ছিল। তাদের প্রতি কিনা এ মর্মে ইল্হামও অবতীর্ণ হয়েছে, যে 'এ ব্যক্তি (অর্থাৎ এ অধম) জাহান্নামী, অবশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদেরকে সসম্মানে খোদা তা'লার দিকে 'রাফা'দান করা হয় বা উঠানো হয়।' অতএব আজ আমি সেই ইল্হামের অর্থ উপলব্ধি করেছি, বেশ কয়েক বছর আগে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর তা হলো:

يٰعِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

মৌলবী সাহেবান– আব্দুর রহমান ও আব্দুল হক তো আমাকে এখন নিশ্চিত নরকবাসী বানাচ্ছেন কিন্তু তাদের এসব ঘোষণার দশ বছর পূর্বে খোদা তা'লা আমাকে জান্নাতি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর ইহুদীরা যেমন ও যেভাবে ধারণা করেছিল যে, ঈসা-মসীহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) অভিশপ্ত এবং কখনো সসম্মানে তার 'রাফা' হবে না এবং তাদের খণ্ডনে (কুরআন করীমে) এ আয়াত নাযেল হয়েছিল: رَافِعُكَ اِلَيَّ ও اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ অনুরূপভাবে খোদা তা'লা এ জায়গায়ও পূর্বোহ্নেই তাঁর আদি ও অনাদি জ্ঞানের ভিত্তিতে উল্লিখিত এলহামটি ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এ অধমের হৃদয় পটে 'এলকা' করেছেন বা হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন। যেহেতু তিনি জানতেন, কয়েক বছর পর মৌলবী আব্দুর রহমান ও মৌলবী আব্দুল হক সেভাবেই এ অধমকে অভিশপ্ত আখ্যা দেবে, যেভাবে ইহুদীরা হযরত মসীহ্ (আ.)-কে আখ্যা দিয়েছিল। এ কারণে তিনি ঘটনা ঘটার পূর্বেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি 'বারাহীন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তাঁর কুদরত ও হিকমত (প্রজ্ঞা) প্রকাশিত হয়। আর যাতে এ-ও প্রকাশ পায় যে, হযরত মসীহ্র যুগে (ইহুদী) মৌলবীরা যেমন তাঁকে অভিশপ্ত মনে করে ও তাঁর বেহেশতী হওয়াকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সসম্মানে খোদা তা'লার দিকে 'রাফা' (বা উন্নীত) হওয়া ও সত্যবাদীদের দলভুক্ত হয়ে তাঁদের সাথে মিলিত হওয়া মেনে নেয় নি; অনুরূপভাবে এ অধমের স্বধর্মীয় মৌলবীরা এ অধমকে খোদা তা'লার রহমত হতে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। কঠিন পাপাচারী মু'মিনরাও কিছু পরিমাণ সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু এ মৌলবীরা কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে সর্বসাধারণ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন, চিঠি লিখেন এবং বিজ্ঞাপন ছেপে প্রচার করেন। অতএব খোদা তা'লা উল্লিখিত সাদৃশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের হাতে একটি কাজ করিয়েছেন। তবে দোযখী ও

বেহেশতী প্রকৃতপক্ষে কে বা কারা, এর স্বরূপ সম্পর্কে মৃত্যুর পর সবাই জ্ঞাত হবে। তখন কতক লোক অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে দোযখে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় বলবে: مَالَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ [অর্থ: 'আমাদের কি হয়েছে, আমরা যে সেসব লোকদের দেখছি না যাদের আমরা অতি মন্দ বলে গণ্য করতাম?' *(সূরা সাদ: ৬৩)*– অনুবাদক]।

عیب رنداں مکن اے زاہد پاکیزہ سرشت تو چہ دانی کہ پس پردہ چہ خوب است و چہ زشت

অর্থ: অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না ওহে তথাকথিত পবিত্রচেতা ব্যক্তি!
কে ভালো, কে মন্দ তার তুমি কি জানো?

এখন মোদ্দাকথা হলো যে, 'রাফা' শব্দটি হযরত মসীহ্‌র জন্য কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে, সে শব্দই এলহাম হিসেবে খোদা তা'লা এ অধমের জন্যও বলেছেন।

কেউ যদি এই সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায় যে, হযরত মসীহ্ তো ইঞ্জিলে বলেন, অবশ্য অবশ্যই আমি মারা যাব, তবে তৃতীয় দিনেই আমি জীবিত হয়ে উঠবো।' অতএব আপনার উল্লিখিত বর্ণনা বা বক্তব্য কী করে এর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে? এর উত্তর হলো, হযরত মসীহ্‌র এই মারা যাওয়া বলতে প্রকৃত মৃত্যু বুঝায় না, বরং এটি রূপকার্থে মৃত্যু বুঝায়। এটি এক সাধারণভাবে প্রচলিত বাকভঙ্গি বা পরিভাষা। যে ব্যক্তি মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়েও বেঁচে যায় তার সম্পর্কেও বলা যায় যে, সে নতুনভাবে জীবন লাভ করেছে। হযরত মসীহ্‌র ওপর যে মহাবিপদ আপতিত হয়, এতে তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পেরেক ঠুকে দেয়া হয়। এর ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ বিপদ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম কিছু নয়। সচরাচর রীতি হলো, যে ব্যক্তি এমন বিপদে পড়ে রক্ষা পায় তার সম্পর্কে এটাই বলা হয় যে, সে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। সে যদি বলে, 'আমি তো নতুনভাবে জীবিত হয়েছি' তাহলে তার একথা কোনো মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলে মনে করা হয় না। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, হযরত মসীহ্‌র উক্ত বাক্যটিতে উল্লিখিত মৃত্যু দ্বারা প্রকৃত মৃত্যু বুঝায় না। এর উত্তর হল, এ ব্যতিক্রমটিও স্বয়ং হযরত মসীহ্ ব্যক্ত করেছেন। ইহুদীদের ফকীহ, ফরিসী ও তাদের মৌলবীরা সবাই একত্র হয়ে যখন তাঁর কাছে প্রশ্ন করলো, 'আপনি মসীহ্ হওয়ার দাবি তো করেছেন কিন্তু কোন মু'জিযা ছাড়া এ দাবি আমরা কী করে মেনে নেব?' তখন হযরত মসীহ্ সব ফকীহ ও মৌলবীদের এই উত্তর দেন, 'এ যুগের হারাম কার্যে লিপ্ত লোক আমার কাছে নিদর্শন চায়, কিন্তু ইউনুস নবীর নিদর্শন ছাড়া তাদের অন্য কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না।' অর্থাৎ এ নিদর্শন দেখানো হবে যে, ইউনুস নবী যেভাবে মাছের

পেটে জীবিত ছিলেন এবং মারা যান নি; সেভাবেই হযরত মসীহ্ও ঐশী ক্ষমতাবলে মাটিগর্ভে তিন দিন অবধি জীবিতাবস্থায় থাকবেন এবং মারা যাবেন না।

এখন লক্ষ করা আবশ্যক যে, হযরত মসীহ্র উল্লিখিত বাক্যটিকে যদি সত্যিকার মৃত্যুর অর্থে নেন তাহলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্যমূলক এই নিদর্শন মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। কেননা হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে জীবিত অবস্থায় ছিলেন। মৃতাবস্থায় ছিলেন না। কাজেই হযরত মসীহ্ যদি মারা গিয়ে থাকেন এবং মৃতাবস্থায় তাকে মাটিগর্ভে (গুহায়) রাখা হয়ে থাকে তাহলে ইউনুসের এ ঘটনার সাথে হযরত মসীহ্র ঘটনার কিবা সাদৃশ্য এবং মসীহ্র ঘটনার সাথে হযরত ইউনুসের ঘটনার কি-বা সম্পর্ক? জীবিতের সাথে মৃতের কী সাদৃশ্য হতে পারে!? অতএব হযরত মসীহ্ তিন দিন পর্যন্ত মারা যাবেন মর্মে বক্তব্যটি যে আক্ষরিক অর্থে ধর্তব্য নয় বরং এর দ্বারা রূপক অর্থে মৃত্যু বুঝায়, উল্লিখিত বর্ণনাটি এর যথেষ্ট কারণ হিসেবে সাব্যস্ত। আর রূপক অর্থে মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুটি ছিল তাঁর মূর্ছিত অবস্থায় উপনীত হওয়া।

আর যদি এ ওজর-আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় এ-ও বলেছিলেন, 'আজ আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো'; অতএব তাঁর এ বাক্যটি দ্বারা স্পষ্টত মারা যাওয়া প্রমাণিত হয়। কাজেই স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা উচিত, হযরত মসীহকে অবশ্যই বেহেশতে যাওয়ার এবং খোদা তা'লার সকাশে ও সান্নিধ্যে ওঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তা অন্য কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যা মসীহ্ (আ.)-এর প্রতি তখনও প্রকাশ করা হয় নি, যেমনটি কিনা কুরআন করীমে اِنِّیۡ مُتَوَفِّیۡکَ وَرَافِعُکَ – অবতীর্ণ হয়েছে। অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সময়ে হযরত মসীহ্ ভেবেছেন, সম্ভবত 'আজই' সেই প্রতিশ্রুতি পুরো হবে। মসীহ্ (আ.) যেহেতু মানুষ ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর মৃত্যুবরণের সব উপকরণ দৃশ্যত উপস্থিত। কাজেই তিনি বাহ্যিক পরিস্থিতি দৃষ্টে ধারণা করেন, সম্ভবত 'আজই' মারা যাবেন। অতএব প্রতাপান্বিত ঐশী জ্যোতির্বিকাশবশত বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁর ওপর মানবসুলভ দুর্বলতা ছেয়ে যায়। এ কারণেই তিনি হতাশ হয়ে বলেন, 'এলি! এলি লিমা সাবাক্তানি?' 'হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! কেন আমায় তুমি ছেড়ে দিলে? কেন সেই প্রতিশ্রুতি পুরো করলে না, যা তুমি পূর্বাহ্নে প্রদান করেছিলে?' অর্থাৎ বলা হয়েছিল যে, 'তুমি মারা যাবে না, বরং তোমার অবস্থা হবে ইউনুসের মতো।'

যদি বলা হয়, 'খোদা তা'লার সুরক্ষামূলক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ কেন সন্দেহ করলেন?' অতএব জানা আবশ্যক, উল্লিখিত সন্দেহ মানবসুলভ দুর্বলতাবশত। ঐশী প্রতাপান্বিত জ্যোতির্বিকাশের সম্মুখে মানবীয় সত্তা কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। প্রত্যেক নবীকে খোদা তা'লা এই দিন দেখান। প্রথমে তিনি তাঁর নবীকে সুসংবাদবহ কোনো প্রতিশ্রুতি দান করে থাকনে। এরপর যখন সে নবী সেই প্রতিশ্রুতিতে আনন্দে উৎফুল্ল হন, তখন পরীক্ষাস্বরূপ চতুর্দিকে এমন বাধা-বিঘ্ন দাঁড় করিয়ে দেন যা নৈরাশ্য ও অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক হয়ে থাকে বরং নিশ্চিত নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার বার্তা নিয়ে আসে। যেমন, খোদা তা'লা একদিকে তো আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বদরের যুদ্ধে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ দান করেন, আর অন্যদিকে যুদ্ধের সময় যখন উপস্থিত হলো তখন জানা গেল, বিরুদ্ধ পক্ষের এত বিপুল জনবল ও সমরশক্তি রয়েছে যে, দৃশ্যত সাফল্যের আশা নেই। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অতীব অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! এ জামা'তটিকে জয়যুক্ত কর। এদের যদি তুমি বিজয় দান না কর এবং এদের তুমি ধ্বংস হতে দাও, তাহলে কিয়ামত অবধি কেউ তোমার ইবাদতকারী হবে না।' অতএব এ শব্দাবলি প্রকৃতপক্ষে একথার প্রমাণ বহন করে না যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐশী ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বরং বর্তমান পরিস্থিতিকে আশার পরিপন্থি দেখে তার দৃষ্টি খোদা তা'লার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং ঐশী প্রতাপে প্রতাপান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন করীমের এমন প্রত্যেক জায়গায় যেখানে মহানবীকে বলা হয়েছে, 'তুমি আমার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সন্দিহান হবে না', সেগুলো এ রকমই, যেখানে দৃশ্যত ভীষণ অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং বিরূপ উপকরণ এমন ভীতিপ্রদ চেহারা দেখাচ্ছিল, যা দেখে প্রত্যেক মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে বিচলিত হয়ে ওঠে। অতএব এসব সঙ্কটময় সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনাস্বরূপ বলা হয়েছে, 'যদিও পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার দরুন সন্দেহ করো না' অর্থাৎ এ ধারণা করো না যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর অন্য কোনো অর্থ হবে। এ পুস্তক প্রণেতা এমন বিষয়ে নিজে অভিজ্ঞতা রাখে। প্রায় তিন বছর কাল অতিবাহিত হয়েছে, কতিপয় গুরুতর কারণবশত –যেগুলো সবিস্তারে ১০ জুলাই, ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ রয়েছে– খোদা তা'লা ভবিষ্যদ্‌বাণীস্বরূপ এ অধমের প্রতি প্রকাশ করেন যে, হুশিয়ারপুর নিবাসী মির্যা গামাঁ বেগ-এর মির্যা আহমদ

বেগ-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা অবশেষে তোমার বিবাহবন্ধনে আসবে। তারা অনেক শত্রুতা প্রদর্শন করবে। বহু চেষ্টা করবে যাতে এ বিবাহ না হয়। অনেক বাধা আসবে। কিন্তু পরিশেষে তেমনটিই হবে। আল্লাহ্ জ্ঞাত করেন, 'খোদা তা'লা তাকে কুমারী বা বিধবা সর্বাবস্থায় তোমার দিকে আনয়ন করবেন। সব প্রতিবন্ধকতা তুলে দেবেন এবং এ কাজ অবশ্যই পুরো করবেন। কেউ একে ঠেকাতে পারবে না।' সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তারিত বিবরণ– এর বিশেষ নির্ধারিত মেয়াদ ও সময় এবং এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলিসহ যা একে মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে পৌঁছে দিয়েছিল– ১০ জুলাই ১৮৮৮-এর বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ বিজ্ঞাপনটি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছে। এর সম্পর্কে আর্যসমাজী হিন্দুদের কতিপয় ন্যায়পরায়ণ লোকজনও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটি খোদা তা'লার কাজ ও ঐশীনিদর্শন বটে। আর এ ভবিষ্যদ্বাণীটি কঠিন এক বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী বা জাতির মোকাবিলায় উপস্থাপিত। তারা এমন যেন শত্রুতা ও বৈরিতার তরবারি উঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত প্রত্যেক ব্যক্তি এ ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করবে। আমি এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এ জায়গায় এজন্য সবিস্তারে লিখি নি যাতে বার বার এর পটভূমিও উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করার দরুন এ ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত কেউ মর্মাহত না হন! কিন্তু যে ব্যক্তিই এ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করবে সে যতই গোঁড়া ও বৈরী মনোভাবাপন্ন হোক না কেন, তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু (এবং পরবর্তীতে এর অলৌকিক প্রতিফলন) মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত এবং এ কথার পরিপূর্ণ ও নির্বাক করে দেয়ার মত উত্তরও পেয়ে যাবে যে, খোদা তা'লা কেন এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করলেন, এর মাঝে কী কল্যাণসমূহ নিহিত এবং কেন ও কোন যুক্তিপ্রমাণে এটি মানবীয় ক্ষমতাতীত এক ঐশীনিদর্শন।

এখন উল্লিখিত বিষয়টি লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমাকে জানানো হলো আর যা তখনও পুরো হয় নি (যেমন এখন, অর্থাৎ ১৮৯১ সনের ১৬ এপ্রিল পর্যন্তও পুরো হয় নি)। এরপর এ অধম কোন রোগে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়, বরং মৃত্যু সম্মুখে দেখে শেষ ওসীয়্যত-ও সম্পাদন করা হলো। তখন ভবিষ্যদ্বাণীটি যেন চোখের সামনে এসে গেল। আর মনে হচ্ছিল, অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত এবং আগামীকাল জানাযা বের হবে। সেই মুহূর্তে আমি উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটির সম্পর্কে খেয়াল করলাম যে, সম্ভবত এর অন্য কোনো অর্থ হবে, যা আমি বুঝতে পারি নি। তৎক্ষণাৎ সেই মৃত্যু সন্নিকটবর্তী অবস্থায় আমার প্রতি

এলহাম অবতীর্ণ হলো: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين অর্থাৎ 'একথাটি তোমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত ধ্রুব সত্য। তুমি কেন সন্দেহ করো?' কাজেই তখন আমার কাছে গোপন রহস্যমূলক তত্ত্ব উন্মোচিত হলো যে খোদা তা'লা তাঁর রসূলদের কেন একথা বলেন যে 'তুমি সন্দিহান হয়ো না'। অতএব আমি অনুধাবন করলাম যে প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি এরকম নাজুক সময়ের সাথেই সম্পৃক্ত, যেমনটি কিনা কষ্টের ও নৈরাশ্যের এ মুহূর্তটি আমার ওপর এসেছে। তখন খোদা তা'লা তাদের অবিচল বিশ্বাসে উজ্জীবিত করানোর উদ্দেশ্যে বলেন, 'তুমি কেন সন্দেহ করছ?। বিপদ তোমাকে নিরাশ করলেও তুমি নিরাশ হয়ো না।'

(৫) প্রশ্ন: 'ইবনে মরিয়ম'-এর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত যে বর্ণনা হাদীসে রয়েছে, পূর্বাপরের কেউ এ ব্যাখ্যা করেন নি যে, 'ইবনে মরিয়ম' শব্দটি দ্বারা আক্ষরিক ও বাহ্যিকভাবে যে স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-কেই বুঝায় তা সঠিক নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি দ্বারা তাঁর কোনো সদৃশ ও প্রতিচ্ছবিকে বুঝায় (যিনি এই উম্মতে আখেরী যুগে আবির্ভূত হবেন)। তাছাড়া, এ বিষয়ে 'ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাসমূহকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। শক্তিশালী প্রমাণ ও অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া এগুলোকে 'বাতিন' তথা রূপক অর্থের দিকে ঘোরানো যাবে না বা এসবের রূপক অর্থ করা যাবে না।

উত্তর: স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য ইবনে মরিয়মের অবতরণ সংবলিত ভবিষ্যদ্‌বাণীটি মোটের ওপর মানা, একটি বিশ্বাসসংক্রান্ত বিষয় ছিল। তাঁরা কখনো এ দাবি করেন নি যে, তারা এ ভবিষ্যদ্‌বাণীর গভীরে বা পাতাল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে 'ইবনে মরিয়ম' দ্বারা নিশ্চিতভাবে ঈসা (আ.)-কেই বুঝায়। তাদের পক্ষ থেকে যদি এরকম দাবিই হতো তাহলে তারা দাজ্জালের মৃত্যুতে বিশ্বাস করতেন না এবং কুরআন করীমের যে-সব জায়গায় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে সেগুলোকেও তারা আলোচনায় বা আমলে নেয়ার বহির্ভূত বিষয় মনে করে নীরব ভূমিকা পালন করতেন না। কথার কথা যদি এ-ও মেনে নেয়া হয় যে, সাহাবা কিরামের মাঝে কেউ এমনটি ভেবেছিলেন যে, 'ইবনে মরিয়ম' বলতে হযরত ঈসাকেই বুঝায় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা বাস্তবে পুরো হওয়ার আগে ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় নবীগণেরও ভুল হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীর যদি ভুল হয়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কী আছে? আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি-ক্ষমতা সমগ্র উম্মতের অন্তর্দৃষ্টির চেয়েও

নিঃসন্দেহে বেশি, বরং আমাদের ভাই (উলামা) যদি ত্বরিত উত্তেজিত না হয়ে ওঠেন তাহলে আমার ধর্ম ও বিশ্বাস হলো সকল নবীর সম্মিলিত অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধিক্ষমতা কখনো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি ক্ষমতার সমান নয় যা আমি যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে স্বীকার করেছেন যে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে তাঁর ভুল হয়েছে। ইতঃপূর্বে কয়েকবারই আমি লিখে এসেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীদের মাঝে প্রথমে আমার সাথে তিনি মিলিত হবেন, যাঁর হাত অন্য সবার চেয়ে লম্বা হবে।' সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনেই তখন পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণ পরস্পরের হাত মাপতে শুরু করেন। যেহেতু ভবিষ্যদ্‌বাণীটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেও অবহিত ছিলেন না, সেহেতু তিনি নিষেধ করেন নি যে তাঁদের এ ধারণাটি ভুল। অবশেষে তাঁদের ভুল ধরালো ভবিষ্যদ্‌বাণীর পুরো হওয়ার সময়টি। সময় যদি এ উম্মুল মু'মিননদের অবকাশ দিতো এবং তাঁরা সবাই আমাদের এ যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন তাহলে এটা স্পষ্ট যে সাহাবার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সারা উম্মত এ কথায় একমত হতো যে, সবচেয়ে লম্বা হাত যাঁর, তিনিই সবার আগে মারা যাবেন। এরপর ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তবে পুরো হওয়ার সময়ে অন্যদের তুলনায় কম লম্বা হাত যাঁর তিনি মারা গেলে সেই 'ইজমা' তথা ঐকমত্যের ধারণ তাকে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পোহাতে হতো। আর এর ফলশ্রুতিতে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কত মানহানির কারণ হতেন এবং নিজেদের ঈমানকে তারা সন্দেহের আবর্তে ফেলে দিতেন। এ মুহূর্তে আমার এক বন্ধুর কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। খোদা তা'লা তাঁকে নিজ রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন। এ প্রয়াত বন্ধুর নাম ছিল হাফেয হেদায়াত আলী। তিনি একসময় গুরুদাসপুর জেলার এক্সট্রা অ্যাসিসটেন্ট (সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) এবং সুদীর্ঘকাল বাটালা পরগনার 'তহসীলদার' (এস. ডি.ও) ছিলেন। তিনি এক সভায় বলেন, 'আখেরী যুগে যে কতগুলো বিষয় প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং (উলামা কর্তৃক) এগুলোর যে-সব অর্থ করা হয়েছে এগুলোর সম্পর্কে আমাদের এ বিশ্বাস রাখা উচিত নয় যে, এগুলো অবশ্য অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে ও বাহ্যিক আকারেই পুরো হবে। কারণ এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব যদি অন্য ভাবে প্রকাশিত হয় তাহলে আমরা যাতে এর দরুন হোঁচট না খাই ও পদস্খলিত না হই এবং যাতে আমাদের ঈমান নিরাপদ থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'যথাসম্ভব আমরা যেহেতু প্রতিশ্রুত সে যুগেই

জন্মলাভ করেছি যে-যুগটিকে আজ থেকে কিছু কম তেরো শ' বছর পূর্বে 'আখেরী যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেহেতু এ যুগ সম্পর্কিত কিছু সংখ্যক ভবিষ্যদ্‌বাণী যদি আমাদের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয় তাহলে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কাজেই মোটের ওপর ঈমান রাখার নীতি আমাদের অবলম্বন করা উচিত এবং কোনো অংশবিশেষের ওপর তেমন জোর দেয়া উচিত নয় যেমনটি কেবল সে অবস্থাতেই দেওয়া যায়, যখন এর বাস্তবতার গভীরে নিহিত প্রকৃত অর্থের গোড়া পর্যন্ত আমরা উপনীত হতে পারি। تم بالخير (অর্থাৎ 'তাঁর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হলো– অনুবাদক)।

বস্তুতপক্ষে এটি সত্য এবং একেবারেই সত্য যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিষয়াদির সাথে 'উম্মতের ইজমা'র কোনো সম্বন্ধ ও সংস্রব নেই। আমাদের বর্তমান কালের মৌলবী-মৌলানাদের কঠিন এই ধোঁকা লেগেছে যে ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের প্রকৃতস্বরূপ ও মূলতত্ত্ব এখনও অদৃশ্যের পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহকেও তাঁরা 'ইজমা'-এর জাঁতায় ফেলতে চান।

প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একজন গর্ভবতী নারীর সম্পর্কে এটা তো বলতে পারি যে কোনো শিশু অবশ্যই তার গর্ভে রয়েছে এবং নিশ্চয় শিশুটি নয় মাস দশদিনের মধ্যে জন্মলাভও করবে। কিন্তু এটা বলতে পারি না যে, তার অবয়ব কী, তার দৈহিক গঠন কেমন, তার মুখমণ্ডলের রূপ ও নকশা কীরূপ এবং নিশ্চিতভাবে সে কি পুত্র সন্তান নাকি কন্যা সন্তান? হতে পারে এ স্থলে কারো মনে এ আপত্তি মাথা চাড়া দিবে যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের অবস্থা যখন এমনই তখন এগুলো আস্থাযোগ্য নয় এবং কোন নবীর প্রেরিত হওয়ার সপক্ষে দলিল ও সবাক সাক্ষ্য বিবেচিত হওয়ার বা কোনো অস্বীকারকারী বিরুদ্ধবাদীর সামনে উপস্থাপনের উপযুক্ত নয়। এর উত্তর হলো, ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ কোন কোন সময় এগুলোর আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থেই পুরো হয় আবার কখনো এগুলো রূপক অর্থে পুরো হয়ে থাকে। এতে করে ঐশী ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে কোনো হানি ঘটে না। বরং সূক্ষ্মদর্শীদের দৃষ্টিতে অধিকতর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। যদি কোন মোটাবুদ্ধির মানুষ একজন দার্শনিকদের কোনো কথা উলটো অর্থে বোঝে থাকে, তার পর যদি এর অভীষ্ট যুক্তিসংগত অর্থ বলিষ্ঠ প্রমাণাদিসহ প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে এ ভুলের কারণে কি সেই প্রকৃত ও সঠিক অর্থের কোনো ক্ষতি সাধিত হতে পারে? না, কখনো হতে পারে না।

তাছাড়া ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের মাঝে অবশ্যই এমন এক অভিন্ন মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকে যে, তা সে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে বিবেচিত হোক কিংবা অবশেষে এগুলো কোনো রূপক অর্থে পুরো হোক, উল্লিখিত এক ও অভিন্ন মূল্যবোধটি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে।

তাছাড়া যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী বিরুদ্ধবাদীর সামনে দাবিস্বরূপ উপস্থাপন করা হয় সেগুলোতে বিশেষ আলো ও হেদায়াত অন্তর্নিহিত থাকে এবং এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র দরবারে প্রণত হয়ে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করার মাধ্যমে সেগুলোর অধিকতর বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ রীতি হিসেবে এগুলোতে অনেক প্রচ্ছন্ন দিক থাকে। ভবিষ্যদ্‌বাণী অনর্থক আক্ষরিক অর্থে নেয়া নির্বোধের হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বইপুস্তক দেখে থাকবে সে জানে যে, সেসব গ্রন্থে লেখা ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহে কতবেশি রূপকের ব্যবহার বিদ্যমান, এমনকি কতক জায়গায় দিন উল্লেখ করে এদ্বারা বছর বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ দিব্যদর্শন শ্রেণিভুক্ত এবং সেই উৎস থেকে প্রস্ফুটিত, যা উপমামূলক ও রূপকে পরিপূর্ণ। নিজেদের স্বপ্নগুলো লক্ষ করুন, স্বপ্নে কোনো কিছুও কি সোজা-সিধাভাবে পরিদৃষ্ট হয়? হলেও তা অতি বিরলভাবে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লা দিব্যদর্শনকে রূপকের পোশাকে সজ্জিত করে তাঁর নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত করেন। অতএব এ সত্যটি গ্রহণ ও বরণ করাকে 'এলহাদ' বা নাস্তিকতা বলে অভিহিত করাই বরং স্বয়ং 'এলহাদ'। কেননা একটি অর্থকে এর আসল ও মূল থেকে অন্যদিকে ঘোরানোকেই এলহাদ বলা হয়।

অতএব খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়ম যখন দিব্যদর্শন এবং সত্য স্বপ্নের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রূপকে পূর্ণ হওয়াকেই মূল নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তাই এই মূল থেকে অন্যদিকে অর্থ ঘোরানো এবং দাবি করা যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহ আবশ্যকীয় ভাবে সর্বদা আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থেই পূর্ণ হয়– এটা 'এলহাদ' নয় তো কী?! নামায ও রোযার মতো ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোকেও আক্ষরিক ও বাহ্যিকভাবে সুপ্রকাশিত বিষয় বলে মনে করা ও দাবি করা বড়ো ধরনের এক ভুল ও মারাত্মক ধোঁকা বই কিছুই নয়। এ সকল আহকাম বা নির্দেশসমূহ তো স্বয়ং মহানবী (সা.) কার্যত পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এগুলোর পর্দা সম্পূর্ণ উন্মোচন করেছেন কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কেও কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ কথাই বলেছেন যে, এগুলোর পর্দা সর্বতোভাবে অপসারিত এবং এগুলোতে এমন

কোনো প্রকৃত তত্ত্ব লুক্কায়িত নয় যা বাস্তবায়নকালে সঠিক অর্থে বুঝা যায়! এ মর্মে কোন সহীহ্ হাদীস মওজুদ থাকলে তা কেন উপস্থাপন করা হয় না? আপনারা অবশ্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক জ্ঞান ও অধিক অন্তর্দৃষ্টি রাখেন না। সহীহ বুখারী বর্ণিত এ হাদীসটি দেখুন! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে (স্বপ্নে) যখন একটি রেশমি বস্ত্রখণ্ডে আবৃত হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) ছবি দেখিয়ে বুঝানো হয় যে, ইনি তাঁর (সা.) স্ত্রী হবেন। তখন তিনি (সা.) কখনো এ দাবি করেন নি যে এ (স্বপ্নে দেখানো) আয়েশা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশাকেই (রা.) বুঝায়। বরং মহানবী (সা.) বলেন, 'এ ছবি দ্বারা যদি প্রকৃতপক্ষে আয়েশাকেই বুঝায় তাহলে অবশ্যই তিনি তাঁর (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ আসবেন, নতুবা এর অর্থ অন্য কোনো স্ত্রীলোকও হতে পারে।"

তিনি (সা.) আরও বলেন, (স্বপ্নে) আমাকে আবু জাহ্লের জন্য বেহেশতের একগুচ্ছ আঙুর দেয়া হয়। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয় (আবু জাহলের পুত্র) ইক্রামার সত্ত্বায়। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লা বিশেষভাবে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর সবদিক তাঁর (সা.) প্রতি স্পষ্টত উন্মোচিত করেন নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এর অংশ বিশেষ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোনো দাবি করেন নি।

আপনারা জানেন, (হযরত) আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের সাথে শর্ত ধরলেন এবং الٓمٓ - غُلِبَتِ ٱلرُّومُ - فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ - فِي بِضۡعِ سِنِينَ – কুরআন করীমের এ আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি সে শর্তের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেন। [আয়াতগুলোর অর্থ: আলিফ লাম মিম অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি। রোমানদের পরাজিত করা হয়েছে নিকটবর্তী দেশে। আর তাদের পরাজয়ের পর তারা বিজয়ী হবে কয়েক বছর (অর্থাৎ তিন থেকে নয়) বছরের মাঝে' (সূরা আর রূম ২-৫) –অনুবাদক]। তিনি (রা.) আয়াতটিতে ('বিয্য়ি' শব্দের অর্থ) তিন বছর নির্ধারণ করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণীটির স্বরূপ দেখে তৎক্ষণাৎ দূরদর্শিতা অবলম্বনে হযরত আবু বকরকে তাঁর উপস্থাপিত শর্তটির কিছুটা পরিবর্তনের আদেশ দেন। কেননা بِضۡعِ سِنِينَ শব্দটি 'তিন বছর' নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রায়শ 'নয় বছর' পর্যন্ত প্রযোজ্য হতে দেখা যায়।

অনুরূপভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মতকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবনে তাঁর নিজেরও ভুল-ভ্রম সংঘটিত হওয়ার

বিষয় ব্যক্ত করেন। কাজেই নবী করীম (সা.)-এর এ শিক্ষা কি যথেষ্ট নয়? আর এ শিক্ষা কি উচ্চস্বরে বলছে না যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীসমূহের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আন এবং এগুলোর মূল অর্থ ও মর্ম উন্মোচন খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দাও?

বন্ধুগণ! আপনারা একা একা নিজেদের গৃহে নিভৃতে বসে চিন্তা করুন। নিজেদের বিছানায় শায়িত অবস্থায় সরলচিত্তে আমার কথায় মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। কবরস্থানে যান নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ করে এক নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জন করুন এবং পরখ করে ভালোভাবে দেখুন, তাকওয়ার পথ কোনটি এবং সাবধানতা ও খোদাভীরুতার পথগুলো কী কী? আমার উপস্থাপিত বিষয় যদি আপনাদের দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে এতেও কি আপনাদের কোনো আপত্তি আছে যে, আপনারা সার্বিকভাবে ঈমান আনুন এবং এর অপ্রকাশিত খুটিনাটিতে অনর্থক অনধিকারচর্চা না করে আমাকে আমার খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিন?

আমি কারও প্রতি জোর খাটাই না। এ কেবল একটি 'তবলিগ' (তথা জরুরি বার্তা পৌঁছানোর কর্তব্য পালন বিশেষ), ইচ্ছা হয় কেউ তা শুনুক বা না শুনুক। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে যদি বিশ্বাসে ধন্য করেন এবং সে আমাকে শনাক্ত করে আমার বার্তা গ্রহণ করে, তাহলে সে বিশেষভাবে আমার ভাই। নিঃসন্দেহে সে তার ঈমানের জন্য পুরস্কৃত হবে। তবে আপনারা যদি এটুকুও করেন যে উল্লিখিত এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটিতে অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম বিষয়াবলি খোদা তা'লার হাতে ন্যস্ত করে ঈমানের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেন এবং অনর্থক পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী হওয়ার দাবি না করেন, তাহলে এতে আপনাদের কী-বা ক্ষতি আর খোদার দরবারে ধরা পড়ারই বা কি আশঙ্কা? আপনারা যদি তদ্রূপ করেন তাহলে কি আপনারা শাস্তি পাবেন? কিন্তু আপনারা যদি ঈমানের সীমানা অতিক্রম করেন এবং সে বিষয়ের দাবি করেন যে সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান দেয়া হয় নি তাহলে নিঃসন্দেহে এই অনধিকারচর্চার জন্য (আল্লাহ্‌র দরবারে) আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে। হে সম্মানিত মৌলবী সাহেবান! আপনারা কেন মানুষকে পরীক্ষায় ফেলেন? আর যতটা জানেন তার চেয়ে বড়ো দাবি কেন করেন? ইবনে মরিয়মের নযুল বা অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসে যদি কোনো বিরোধী অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না হতো, আর কেবল এলহামের মাধ্যমেই একজন মুসলমান এর অর্থ আপনাদের সামনে এ মর্মে উন্মোচিত করতো যে, (হাদীসে বর্ণিত) ইবনে মরিয়ম শব্দটি দ্বারা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কেই বুঝায় না, তাহলেও এর মোকাবেলায় আপনাদের এ দাবি করার অধিকার ছিল না যে, ইবনে মরিয়ম শব্দটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মরিয়ম

পুত্র হযরত ঈসা-কেই বুঝায়। কেননা কাশফ সম্পর্কিত বিষয়াবলিতে রূপকের প্রাধান্য থাকে; এবং আক্ষরিক অর্থ থেকে রূপকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করানোর জন্য 'ঐশী বাণী বা এলহাম জোরালো অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে আপনারা সুধারণা ও সুবিশ্বাস পোষণের জন্য আদিষ্ট।

কিন্তু এ জায়গায় তো কেবল এলহামই নয় বরং অন্যান্য জোরালো প্রমাণও বিদ্যমান। এ কি কোনো তুচ্ছ অনুষঙ্গ যে, খোদা তা'লা মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণ সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর জীবিত থাকা এবং জীবিতাবস্থায় তাঁকে (আকাশে) ওঠানো সম্পর্কে ইঙ্গিত ও ইশারা পর্যন্ত করেন নি একি কোনো সামান্য অনুষঙ্গ যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমনকারী এবং বিগত ঈসা ইবনে মরিয়মের একই অবয়ব ও হুলিয়া বর্ণনা করেন নি, বরং উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন হুলিয়া বর্ণনা করেছেন। আর এ-ও কি কোনো কম জোরালো প্রমাণ যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমনকারীকে একজন উম্মতি বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকে খানা-কা'বার তোয়াফ করতে দেখেছেন! আর এই অজুহাত উত্থাপন করা যে, 'নুসুস' অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের মুলভাষ্যসমূহ আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে বলে 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত, এটি এমন এক অজুহাত যার কারণে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদের (সত্যতার) প্রমাণাদি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য মূল ভাষ্যকে কোনো জোরালো প্রমাণ ছাড়াই বাহ্যিক অর্থ উপেক্ষা করে রূপক অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়ার 'অবৈধ পন্থা তারা নিজেরা অবলম্বন করেছেন। যেমন কুরআন করীম পঁচিশটি জায়গায় (তথা আয়াতে) 'তাওয়াফ্ফি শব্দটিকে 'রূহ্ কব্য' বা মৃত্যু অর্থে ব্যবহার করেছে এবং সবক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে যে 'তাওয়াফ্ফি' শব্দটির অর্থ হলো নিথর দেহকে বাদ দিয়ে কেবল আত্মাকে কব্য বা ধারণ করা। কিন্তু এ মহোদয়রা (খোদা তা'লা এঁদের হেদায়াত দিন) কুরআন করীমের তেইশটি জায়গায় তো উল্লিখিত অর্থই গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু সেই স্পর্শকাতর বিতর্কিত জায়গাগুলোতে যেখানে হযরত মসীহ্র ওফাত অর্থাৎ মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে সেসব জায়গায় নিজ পক্ষ থেকে (স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে) মনগড়া অর্থ দাঁড় করান। কাজেই লক্ষ করা উচিত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মূল শব্দকে তারা অবজ্ঞা করেছে, না আমরা? তবে হাদীসের বর্ণিত 'ইবনে মরিয়মে'র অবতরণ দ্বারা আমাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে 'ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর অবতরণ বুঝায়

না। এতে প্রতীয়মান হয় না যে, আমরা মূল আয়াতকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে ঘুরিয়েছি, বরং ঐশীবাণী ছাড়াই উল্লিখিত 'উপমা এ কারণে মানতে হয় যে, কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীস একে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণে বাধা দেয়। অতএব বার বার আমরা সংশ্লিষ্ট স্পষ্ট দলিলপ্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কতবার সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা যায়!

(৬) প্রশ্ন: 'প্রতিশ্রুত মসীহ্'র সাথে হাদীসে কোথাও 'মসীল' (বা 'সদৃশ' শব্দ) পরিদৃষ্ট হয় না অর্থাৎ এমনটি কোথাও লেখা নেই যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মসীল বা সদৃশ আসবেন, বরং লেখা আছে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আসবেন।

উত্তর: প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, খোদা তা'লা যখন আগমনকারী মসীহ্ সদৃশকে 'ইবনে মরিয়ম' নামে অভিহিত করেছেন তখন আবার তিনি তাকে ইবনে মরিয়ম সদৃশ' নামে কেনইবা উল্লেখ করবেন? উদাহরণস্বরূপ, আপনারা ভেবে দেখুন! যারা তাদের সন্তানদের নাম মূসা, দাউদ ও ঈসা ইত্যাদি রেখে থাকেন, যদিও তাদের উদ্দেশ্য এর পেছনে এটিই হয়ে থাকে, তারা যেন পুণ্যে এবং কল্যাণ ও আশিসে উল্লিখিত নবীদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়; কিন্তু তাই বলে তারা আবার তাঁদের সন্তানদের এমন করে ডাকেন না, 'হে মূসা সদৃশ! হে দাউদ সদৃশ! হে ঈসার সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি! বরং আশিস ও কল্যাণ কামনায় তাদের আসল নামেই ডাকা হয়। অতএব যে কাজটি মানুষ কেবল আশিস ও কল্যাণ কামনায় করতে পারে, সেটি কি সর্বশক্তিমান খোদা (কার্যত) করতে সক্ষম নন? তিনি কি একজনের আধ্যাত্মিক অবস্থা অন্য একজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে সে নামে তাকে অভিহিত করতে পারেন না? তিনি কি এরকম সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক অবস্থার কারণেই হযরত ইয়াহ্ইয়াকে এলিয়া নামে অভিহিত করেন নি? অনুরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থার মিলের কারণেই কি হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে তাওরাতের আদি পুস্তকের ৪৯তম অধ্যায়ে 'শীলা' নামে অভিহিত করা হয়নি? 'শীলা' ইয়াকুবের পুত্র ইহুদার পৌত্রের নাম ছিল। ইহুদাকে উল্লিখিত অধ্যায়ে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আগমনের এ ভাষায় সুসংবাদ দেয়া হয়: 'ইহুদা থেকে রাজত্বের যষ্টি 'শিলা' না আসা পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।' অর্থাৎ 'ইবনে মরিয়ম না আসা পর্যন্ত ছিন্ন করা হবে না'। একথা বলা হয়নি, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম সেই পরিবার বা বংশে জন্মলাভ করার কারণে ইহুদার পৌত্রই ছিলেন, সেহেতু তাঁকে 'শিলা'র নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই তাওরাতেরই ৪৮তম অধ্যায়ের ১৫তম শ্লোকে হযরত ইয়াকুবের (আ.) এ দোয়ার উল্লেখ রয়েছে: 'তিনি ইউসুফের জন্য কল্যাণ কামনা করেন এবং ইউসুফের পুত্রদের জন্য দোয়া চেয়ে বলেন, 'সেই খোদা যিনি আজ পর্যন্ত সারা জীবন জুড়ে আমার

তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করেছেন তিনি এই যুবকদের কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং আমার ও আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের নামে এদের অভিহিত করুন।" (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্যাদা এদের দান করুন– অনুবাদক)।

অতএব মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর এ চিরন্তন রীতি অনস্বীকার্য যে তিনি রূহানী সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের কারণে একজনের নামে আরেকজনকে অভিহিত করে থাকেন। ইব্রাহীমের স্বভাবচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে ইব্রাহীম ও মূসাসুলভ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে মূসা এবং ঈসাসুলভ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে ঈসা বটে। আর যিনি উল্লিখিত সকলের 'আধ্যাত্মিক গুণ ও স্বভাবচরিত্রে অংশীদার, তিনি (আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে) এই সকল নামের সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল এবং এ সকল নামে অভিহিত। হ্যাঁ, বিতর্কের বিষয় থাকলে সেটি এই যে, 'ইবনে মরিয়ম' শব্দটিকে এর বাহ্যিক ও তাৎক্ষণিক অর্থ থেকে সরিয়ে কেন অন্য অর্থে গ্রহণ করা হবে! এর উত্তর হলো জোরালো যুক্তিপ্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে। কেননা কুরআন করীম ও মহানবীর পবিত্র হাদীস সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত হয়েছেন এবং তাঁর পরলোকগত ভাইদের সাথে মিলিত হয়েছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর মহতী মি'রাজের রাতে শহীদ নবী ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর সাথে তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে দেখেছেন। কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীস বরাবর এ সুসংবাদ দিচ্ছে যে, ইবনে মরিয়মের প্রতিচ্ছবি এবং অন্যদের মসীলরাও আবির্ভূত হবেন। কিন্তু কোনো জায়গায় এটা লেখা নেই যে, কোনো বিগত ও পরলোকগত নবীও দুনিয়ায় পুনরায় আসবেন। কাজেই একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, ইবনে মরিয়ম দ্বারা আল্লাহ্‌র নবী ইবনে মরিয়মকে বুঝায় না যিনি মারা গেছেন এবং পরলোকগতদের দলভুক্ত হয়েছেন।

খোদা তা'লার এ বিস্ময়কর প্রজ্ঞার বিষয়টির দিকেও লক্ষ করুন, আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে তিনি আমার নাম 'ঈসা' রাখেন এবং তাঁর অভাবনীয় পরম অনুগ্রহে এটিকে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে ছাপিয়ে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে উল্লিখিত নামটিকে প্রসার ও প্রসিদ্ধি দান করলেন। দীর্ঘকাল পর তিনি তাঁর বিশেষ এলহামে প্রকাশ করলেন যে, এ ব্যক্তি সেই ঈসা, কুরআন ও হাদীসে যার আগমনের প্রতিশ্রুতি ছিল। দশ বছর কালব্যাপী মানুষ এ নামটি বারাহীন গ্রন্থে পড়তে থাকে। আর দশ বছরকাল যাবৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রথম এলহামের ব্যাখ্যা স্বরূপ অবতীর্ণ এ দ্বিতীয় এলহামটি গোপন রাখলেন, যাতে করে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যাবলি এক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে কৃত্রিমতামুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কেননা কৃত্রিমতার ধারা

কখনো এতোটা দীর্ঘ হতে পারে না যার ভিত্তি এক দীর্ঘকাল পূর্বে রাখা গিয়ে থাকবে! فتدبروا يا اولوا الابصار (অর্থাৎ হে চক্ষুষ্মান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন– অনুবাদক)।

(৭) প্রশ্ন: আপনার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে আরও মসীহ্ (বা সদৃশ) আসবেন। তাদের মাঝে কি প্রতিশ্রুত কেবল আপনি একজনই? না কি আগমনকারী সবাই প্রতিশ্রুত হবেন এবং কাদেরকে আমরা সত্য প্রতিশ্রুত হিসেবে মানবো?

উত্তর: অতএব জানা আবশ্যক, ইঞ্জিল ও সহীহ্ হাদীসাবলি অনুযায়ী 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' হিসেবে আবশ্যকীয় ভাবে যার আগমন নির্ধারিত ছিল তিনি তো তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর চিহ্নাবলিসহ এসে গেছেন আর আজ সেই ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছে যা খোদা তা'লার পবিত্র এ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে পূর্ব থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কারও মনে যদি এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে এ সমাগত মসীহ্র অবস্থার সাথে কতক হাদীসে বর্ণিত বিষয় বাহ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয় না, যেমন দামেস্ক সম্পর্কিত হাদীসটিতে সে রকম কিছু বিষয় রয়েছে। তাহলে এর উত্তর এটিই যে, প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত এসব বিষয়ই 'ইস্তি'আরা' বা রূপকাশ্রিত বর্ণনা। কেননা কাশফ বা দিব্যদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে উল্লিখিত রূপকের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ এগুলোতে বলা হয় এক বিষয় আর বুঝায় অন্য কিছু। কাজেই উল্লিখিত এসব বিষয়কে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থের মিলানোর চেষ্টা করা বা উল্লিখিত চিহ্নগুলো বাহ্যিক ও আক্ষরিকভাবে কেন পুরো হলো না এ অজুহাতে নিজেকে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার আবর্তে নিক্ষেপ করা এক বড়ো ধরনের ভ্রম। অথচ এ কি সত্য নয় যে উল্লিখিত এসব হাদীসের ব্যাখ্যা করার সময় আমাদের বিপক্ষকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বশত জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। অতএব তাঁরা অতি কষ্টে ও লৌকিকতার সাথে সে ব্যাখ্যাগুলো করেছেন। যেমন, আগমনকারী হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের এ 'উত্তম কাজ'টির কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ায় এসে শূকর বধ করবেন। লক্ষ করা আবশ্যক, এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলেমগণ হাদীসের শব্দাবলিকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে অভ্যন্তরীণ ও রূপক অর্থের দিকে ঘোরানোর যে কত প্রয়াস পেয়েছেন! অনুরূপভাবে দাজ্জাল কর্তৃক কা'বা শরীফের তোয়াফ করার বিষয়ে কতই না বাস্তবতা পরিপন্থি ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন। কাজেই অপর পক্ষ যদি হাদীস বর্ণিত এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকতেন তাহলে অবশ্যই আমাকেও তারা তদ্রূপ ব্যাখ্যাকারী আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও নির্দোষ বলেই সাব্যস্ত হতেন। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই এ পথে পদচারণা করে আমাকে কোন মুখে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করেন?

প্রকৃত সত্য হলো, দিব্যদর্শনমূলক বর্ণনাসমূহ যেহেতু প্রকৃতপক্ষেই রূপকে পূর্ণ থাকে, সেহেতু পক্ষ বা বিপক্ষ কারো পক্ষেই এগুলোকে সর্বত্র বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 'লম্বা হাত' সম্পর্কিত হাদীসটি বাহ্যিকভাবে দীর্ঘ হাত প্রসারিত করে বলছে এ সব দিব্যদর্শনের ক্ষেত্রে 'বাহ্যিক অর্থের ওপর জোর দেবে না, অন্যথায় ধোঁকা খাবে।' কিন্তু তাঁদের কেউই এ নির্দেশনাটি গ্রহণ করছেন না। যেমন কবরের শাস্তি সম্পর্কিত হাদীসসমূহে বেশির ভাগ এই বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় যে, কবরগুলোতে সমাহিত ব্যক্তি গুনাহগার হলে সেখানে সাপ, বিচ্ছু ও আগুন থাকবে। উল্লিখিত এসব হাদীস যদি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এরকম কয়েকটি কবর খুঁড়ে সেগুলোতে সাপ-বিচ্ছু দেখিয়ে দিন।

এরপর আমি এ-ও বলি, ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি হাদীস যা আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে এখনও সংগতি বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলোকে যদি আক্ষরিক অর্থেও গ্রহণ করা হয় তবুও কোনো ক্ষতি বা অসুবিধে নেই। কেননা হতে পারে যে, খোদা তা'লা এ অধমের এমন একজন পূর্ণ অনুগত অনুসারীর মাধ্যমে কোনো সময়ে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলোর পুরো বাস্তবায়ন করাবেন যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মনোনীত মসীহ্ সদৃশের মর্যাদা রাখবেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারেন যে, অনুসারীদের মাধ্যমে কোনো কোনো দায়িত্ব পালিত হওয়া প্রকৃতপক্ষে এমনই যে, যেন আমি নিজ হাতে সেকাজগুলো সম্পন্ন করেছি, বিশেষত যখন কতিপয় অনুসারী 'ফানা ফিশ্ শাইখ' (গুরুতে আত্মোৎসর্গিত) অবস্থা অবলম্বনে আমারই রং ধারণ করবে, আমারই রঙে রঙিন হবে আর খোদা তা'লার কৃপা আমাকে যেমন দান করেছে সে রকম আশিসপূর্ণ আত্মিক মর্যাদায় প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ তাদেরও ভূষিত করে থাকবেন। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে তাদের কৃতকর্ম বা অবদান আমার নিজের বলেই গণ্য হবে। কেননা যে আমার পথে চলে সে আমার থেকে পৃথক নয়। যে ব্যক্তি আমারই উদ্দেশ্যাবলি আমাতে আত্মবিলীন হয়ে সম্পন্ন ও সফল করে সে আমারই অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই অঙ্গ বা শাখা স্বরূপ হওয়ার দরুন 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্‌বাণীর অংশ। কেননা সে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়। প্রতিবিম্বস্বরূপ সেও যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মসীহ্‌র প্রতিচ্ছবি হওয়ার নাম পায় এবং প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' যদিও একজনই, কিন্তু এই একজনের মাঝে একীভূত হয়ে সকলে প্রতিশ্রুতই বটে। কেননা তাঁরা একই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তির লক্ষ ও উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ঐকতানের নিরিখে (পরস্পর) সম্পূরক হয়ে থাকেন। তোমরা তাদের পরিচয় তাদের ফলের মাধ্যমে পাবে।

স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার রসূল, নবী বা মুহাদ্দাসদের সপক্ষে তাঁর যে-সব প্রতিশ্রুতি থাকে সেগুলো কখনো প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণ হয় আর কখনো পরোক্ষভাবে। হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকেও সাহায্য ও বিজয় লাভের যে-সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ হয় নি। বরং অন্য একজন নবীর মাধ্যমে পূর্ণ হয় তিনি হলেন সকল নবীগণের সরদার ও শীর্ষনেতা, অর্থাৎ আমাদের মনিব ও অভিভাবক 'খাতামুর রুসুল (সা.)'। তেমনি হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্কে কিনান বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বরং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিল, 'তুমি তোমার জাতিকে কিনানে নিয়ে যাবে এবং কিনান দেশের হরিত ক্ষেত্রের তুমি তাদেরকে আধিপত্য দান করবে।" এ প্রতিশ্রুতি হযরত মূসার জীবদ্দশায় পুরো হতে পারে নি। যাত্রা পথেই তিনি মারা যান। কিন্তু বলা যাবে না যে, এখনও তাওরাতে লিপিবদ্ধ এ ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা হযরত মূসার মৃত্যুর পর মূসাসুলভ শক্তি ও আত্মিক ক্ষমতা তাঁর অনুসারী 'ইউশা'-কে দান করা হয়, আর সে খোদা তা'লার আদেশে এবং তাঁরই আত্মিক প্রণোদনায় মূসার মাঝে বিলীন হয়ে এবং মূসাসুলভ রূপধারণ করে সেই কর্মসাধিত করে যা মূসার কাজ ছিল।

অতএব খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে মূসা ছিল। কেননা সে মূসার মাঝে হয়ে ও মূসার অনুবর্তিতায় ও আনুগত্যে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গিত হয়ে এবং খোদা তা'লার থেকে মূসাসুলভ প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে সে কাজটি সমাধা করেছিল। অনুরূপভাবে আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাওরাতে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে পুরো হতে পারে নি, বরং সেগুলো মহিমান্বিত সেই খলীফাগণের মাধ্যমে পুরো করা হয় যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ও অনুবর্তিতায় আত্মোৎসর্গিত ছিলেন। কাজেই আল্লাহ্ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে যে-সব বিজয় ও অন্যান্য মহতী বিষয় ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে সংরক্ষিত থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে এমনটি কখনো অপরিহার্য বলে মনে করা যায় না যে, সেসবগুলো সামগ্রিকভাবে তাঁরই মাধ্যম বাস্তবায়িত হবে। বরং তাঁর পরম নিষ্ঠাবান অনুসারীগণ তাঁর হাত পা স্বরূপ বিবেচিত হয়ে থাকে এবং তাদের সমস্ত চেষ্টাপ্রয়াস ও কর্মকাণ্ড সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির দিকেই আরোপিত হয়ে থাকে যেমন, একজন সেনাপতি যদি ভালো-ভালো সৈনিক এবং সুদক্ষ গবেষকদের সহায়তায় কোনো শত্রুকে গ্রেফতার বা হত্যা করতে সমর্থ ও সফল হয় তাহলে সেই সার্বিক কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড তার (তথা

সেনাপতির) দিকেই আরোপ করা হয়। আর নির্দ্বিধায় বলা হয় যে, ওই সেনাপতি শত্রুকে গ্রেফতার করেছেন বা বধ করেছেন। এ রকম বলায় কেবা আপত্তি করতে পারে? অতএব এ বাগধারা যখন প্রচলিত ও সুবিদিত বিষয়, তখন এ ক্ষেত্রে এটি স্বীকার করতে কীসে দ্বিধা বা বাধা থাকতে পারে? ধরুন, যদি মেনেও নেয়া হয় যে, কতক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে সেগুলোর বাহ্যিক আকারেও বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যকীয়, তাহলে একই সাথে এ-ও মেনে নেয়া উচিত, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ আবশ্য-অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এবং এমন লোকদের হাত দিয়ে সেগুলোর পূর্ণতা সাধিত হবে যাঁরা পরিপূর্ণভাবে অনুবর্তিতা ও আনুগত্যের সব স্তরে আত্মোৎসর্গিত হওয়ার কারণে এবং 'ঊর্ধ্বলোকের প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়ার দরুন তাঁরা এ অধমের সত্তাস্বরূপই হবে। আর বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি ভবিষ্যদ্বাণীও উল্লিখিত বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত বহন করছে। সে এলহামটি হচ্ছে:

يٰعِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

(অর্থ: হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে 'ওফাত' তথা মৃত্যু দেবো এবং আমার দিকে উঠাবো আর যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামতকাল অবধি প্রাধান্য দান করবো'– অনুবাদক)। ওই মসীহ্-কেও স্মরণ রাখ, যে এই অধমের ঔরষজাত বংশধরদের মধ্য থেকে হবে– যার নাম 'ইবনে মরিয়ম'ও বটে। কেননা এ অধমকে (উল্লিখিত) বারাহীন গ্রন্থে 'মরিয়ম' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

(৮) প্রশ্ন: হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে খ্রিষ্টানদের এ বিশ্বাসই ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে মসীহ্ ইবনে মরিয়মই পৃথিবীতে পুনরায় আসবেন। অতএব এ বিশ্বাসটি যদি সত্য না হতো, তাহলে কেন খোদা তা'লা কুরআন করীমে এটি মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেন নি? বরং বিভিন্ন হাদীসে 'ইবনে মরিয়ম-এর আগমন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উত্তর: ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত, খোদা তা'লা তো কুরআন করীমে এ বিশ্বাসটিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন তিনি পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন; এরপর কোথাও উল্লেখ করেন নি যে, মসীহ্ (আ.) পুনরায় জীবিত হয়েছেন; অধিকন্তু পবিত্র হাদীসগুলোতে এতদুদ্দেশ্যে কোথাও কুরআন করীমের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় নি। এমন একটি হাদীসও দেখতে পাওয়া যায় না যা হযরত মসীহ্কে জীবিতাবস্থায় ভৌতিক দেহসহ ওঠানোর কথা

বর্ণনা বলে। মোটকথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও উল্লিখিত আকিদা-বিশ্বাসটিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে কোনো ত্রুটি করেন নি। আগমনকারী মসীহ্কে উম্মতি বলে নির্ধারণ করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় মসীহ্র হুলিয়া বা অবয়বের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুবরণ করার কথাও বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন। অতএব এই পরিমাণ বর্ণনা যথেষ্ট ছিল। আর যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের ক্ষেত্রে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র বিধানে এও অভিপ্রেত যে, এগুলোর মাঝে কিছু বিষয় প্রচ্ছন্নও রাখা হয়, যাতে করে যথাসময়ে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের পরীক্ষা হয়ে যায়।

একথাটিও সত্য নয় যে খ্রিষ্টানদের সর্বসম্মত আকিদা বা বিশ্বাস এটাই যে, হযরত মসীহ্ দুনিয়ায় আসবেন। কেননা তাদের মাঝে কিছু ফির্কা হযরত মসীহ্ মারা গিয়েছেন বলে বিশ্বাসী। তা ছাড়া তাঁর হাওয়ারী বা শিষ্যদের প্রণীত ইঞ্জিল দুটি অর্থাৎ মথি ও যোহণ হযরত মসীহ্কে আকাশে উঠানো হয়েছে বলে বর্ণনাটির কখনো সত্যায়ন করেনি। তবে মার্ক ও লুক লিখিত ইঞ্জিলে উল্লিখিত বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু পরবর্তী দুজন হযরত মসীহ্র হাওয়ারী (শিষ্য) নন এবং তারা কোনো হাওয়ারী বর্ণিত রিওয়ায়াত মূলেও লেখেন নি।

(৯) প্রশ্ন: লাইলাতুল কদর-এর ভিন্ন অর্থ করে 'নেচারিয়্যত' ও 'বাতেনিয়্যত'-এর দরজা খুলে দিয়েছেন।

উত্তর: আপত্তিকারী মহোদয় এ আপত্তি দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন। এ জায়গাটিতে প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, খোদা তা'লা এ অধমের কাছে উন্মোচিত করেছেন যে, লাইলাতুল কদর-এর প্রথম অর্থ যা উলামা করে আসছেন সেটিও স্বীকৃত ও সঠিক এবং এরই সাথে নব উন্মোচিত এ অর্থও যথার্থ। এতদুভয়ের মাঝে কোনো স্ববিরোধ নেই। কুরআন করীমে 'যাহ্র' (বাহ্যিক) ও 'বাতুন' (অভ্যন্তরীণ) উভয় বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। অর্থ এর মাঝে শতশত তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। এ অধম যদি 'খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে লাইলাতুল কদরের উল্লিখিত অর্থ লিখে থাকে, তাহলে কোথা থেকে ও কী করে বুঝা গেল যে, প্রথম অর্থকে আমি অস্বীকার করেছি? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগটি কি 'খাইরুল কুরুন' তথা 'সর্বোত্তম যুগ' বলে অভিহিত নয়? সে যুগের ইবাদতসমূহ কি পুণ্য ও প্রতিদানের পাল্লায় অধিক ভারি ছিল না? সে যুগে কি ধর্মের সাহায্য ও সহায়তার উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হতেন না? রূহুল আমীন বা জিব্রাঈল কি অবতীর্ণ হতেন না? অতএব এটি স্পষ্ট যে, লাইলাতুল কদরের সকল লক্ষণ

ও জ্যোতি এবং আশিস ও কল্যাণ ওই যুগে বিদ্যমান ছিল। সেই সাথে এক অমানিশাও ছিল যা দূরীভূত করার জন্য এ সকল জ্যোতি, ফেরেশতাকুল ও রুহুল আমিন জিব্রাঈল এবং বিভিন্ন রকম আলোক অবতীর্ণ হচ্ছিল। তাই মহানবী (সা.) এর পবিত্র যুগটির নামও ঐশীবাণীতে যদি 'লাইলাতুল কদর' বলে প্রকাশ ও ব্যক্ত করা হয় তাতে কী-বা দোষ বর্তালো? যেব্যক্তি কুরআন করীমের একটি অর্থকে যথাযথ বজায় রেখে আরও একটি সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব তুলে ধরে, তার নাম কি 'মুলহিদ' রাখা উচিত? এহেন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ নিঃসন্দেহে কুরআন করীমের শত্রু এবং এর নিদর্শনমূলক গুণের অস্বীকারকারী।

(১০) প্রশ্ন: ফেরেশতাগণ এবং জিব্রাঈল (আ.)-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন এবং তৌযিহুল মারাম' পুস্তকে এদেরকে কেবল তারকারাজির শক্তিস্বরূপ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

উত্তর: এটা আপনার প্রতারণা মাত্র। নচেৎ আসল বিষয় এই যে এ অধম ফেরেশতা কূল ও জিব্রাঈল (আ.)-এর অস্তিত্বকে সেভাবেই মান্য করে যেভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে এবং কুর্আন করীম ও সহীহ্ হাদীসাবলির বর্ণনা অনুযায়ী নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্ররাজির সাথে ফেরেশতাদের সেবকসুলভ সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সাব্যস্ত বা যে যে কাজ তাদের ওপর সোপর্দ হয়ে থাকে সেগুলোরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 'তৌযিহে মারাম' পুস্তকটিতে রয়েছে।

چو بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطاست سخن شناس نۂ دلبرا خطا اینجاست

অর্থ: তুমি যখন হৃদয়বান লোকদের কথা শোনো, একথা বলো না যে, এটি ভ্রান্ত কথা। হে প্রিয়! তুমি কথা বুঝ না, এটিই হলো আসল সমস্যা।

(১১) প্রশ্ন: 'ফতেহ ইসলাম' পুস্তিকায় নবুওয়্যতের দাবি করেছেন।

উত্তর: নবুওয়্যতের দাবি নয়, বরং 'মুহাদ্দাস' (তথা বহুল ঐশী বাক্যালাপে সম্মানিত) হওয়ার দাবি রয়েছে, যা খোদা তা'লার আদেশে করা হয়েছে। আর এতে কী-বা সন্দেহ আছে যে, 'মুহাদ্দাস' (বহুল ঐশী বাক্যালাপে ভূষিত) হওয়া-ও নবুওয়্যতের অন্তর্নিহিত একটি শক্তিশালী দিক নিজের মাঝে রাখে। যেমন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়্যতের ছিচল্লিশটি অংশের মধ্যকার একটি অংশ বটে। এই 'মুহাদ্দাসিয়াত'কে পবিত্র কুরআনে নবুওয়্যতের সাথে জড়িত ও রিসালাতের পাশাপাশি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সহীহ্ বুখারী শরীফে হাদীসও বিদ্যমান। এটিকে যদি 'মাজাযী' বা রূপক নবুওয়্যত বলে অভিহিত করা হয় তাহলে এতে করে (কি স্বাধীন-স্বতন্ত্র) নবওয়তের দাবি সাব্যস্ত হয়? হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক গৃহীত (বুখারী শরীফে

লিপিবদ্ধ) কুরআন করীমের কিরআতটি স্মরণ করুন যা হযরত ইব্নে আব্বাস হতে বর্ণিত। এটি নিম্নরূপ:

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث الا اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله اٰيته

[(অর্থ: তোমার পূর্বে যখনই আমরা কোনো রসূল, নবী বা মুহাদ্দেস প্রেরণ করেছি আর সে কোনো ইচ্ছা পোষণ করেছে তখনই শয়তান তাতে ব্যঘাত ঘটানোর করেছে। কিন্তু শয়তানের প্রচেষ্টাকে আলাহ্ ব্যর্থ করে দেন। এরপর স্বীয় নিদর্শনাবলিকে আলাহ্ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।– অনুবাদক]। কামিল নবুওয়্যত (তথা স্বাধীন স্বতন্ত্র ও বিধানমূলক পরিপূর্ণ নবুওয়্যত) ছাড়া ওহীর ওপর মোহর করে দেয়া হয়েছে– এ কথা কোথায় আছে? যদি এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে এ আয়াতটিরই-বা কী অর্থ?

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا [(অর্থ: 'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার ফলে উপত্যকাসমূহ স্ব স্ব পরিমাপ অনুযায়ী প্লাবিত হয়।' (সূরা রা'দ: ১৮)– অনুবাদক]।

হে উদাসীনগণ! এই সম্মানিত উম্মতে ঐশীবাণীর ধারা কিয়ামতকাল অবধি প্রবহমান রয়েছে, তবে পদমর্যাদা অনুযায়ী।

(১২) প্রশ্ন: সূরাহ্ যুখ্রফে এ আয়াতটি রয়েছে: وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا *(পারা নম্বর ২৫ ও সূরা যুখরুফ: ৬২)*। অর্থাৎ 'সে কিয়ামতের অস্তিত্বের নিদর্শন। অতএব তোমরা চিহ্ন বা নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করো না।' এই চিহ্ন বা নিদর্শন বলতে হযরত ঈসাকে বুঝায়, যিনি কিয়ামতের পূর্বে নাযেল হবেন। আর এ আয়াত সূত্রে তাঁর অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়।

উত্তর: খোদা তা'লা স্পষ্টত এ আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের এ মর্মে অভিযুক্ত করতে চান যে তারা এ নিদর্শনটি দেখেও মৃতদের পুনরুত্থিত হওয়ার সম্পর্কে কেন সন্দিহান? অতএব এ আয়াতটিতে প্রণিধানে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন যে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের সাথে এ আয়াতটির কোনো সম্পর্ক নেই। আয়াতটি অবশ্য ব্যক্ত করছে যে, মৃতদের পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার নিদর্শন এখনো বিরাজমান রয়েছে এবং অস্বীকারকারীদের এই বলে অভিযুক্ত করছে, 'এখনো তোমরা কেন সন্দেহ পোষণ করো?' কাজেই এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন, এ আয়াতটিতে যদি খোদা তা'লার এই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, হযরত মসীহ্ যখন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন তখন আকাশ থেকে তাঁর অবতীর্ণ হওয়া মৃতদের পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার জন্য নিদর্শন স্বরূপ হবে! তাহলে

প্রশ্ন দাঁড়ায় যে নিদর্শনটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেকার লোকদের খোদা তা'লা কীভাবে অভিযুক্ত করতে পারেন? এটি কি কোন নিখুঁত যুক্তি উপস্থাপনের উপায়? অর্থাৎ যুক্তি বা নিদর্শন তো এখনও প্রকাশিত হয় নি এবং এর কোনো নামচিহ্নও সামনে আসে নি অথচ তার পূর্বেই অস্বীকারকারীদের বলা হচ্ছে: 'এখনও তোমরা কেন বিশ্বাস কর না'? এতে করে কি তাদের পক্ষ থেকে এমর্মে যুক্তিযুক্ত ওজর আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ থেকে যায় না যে, হে খোদা! কিয়ামতের দলিল বা নিদর্শন তো এখনও যার দরুন فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ (অর্থাৎ তোমরা কখনো সন্দেহ করো না') বলে আমাদের ধমক দেয়া হচ্ছে?' এটি হুজ্জতপূর্ণ করার কোনো রীতি হলো যে দলিল-প্রমাণ তো এখনও অদৃশ্যের পর্দায় প্রচ্ছন্ন আর মনে করা হয় যে অভিযোগ সাব্যস্ত হয়েছে! এ ধরনের অর্থ কুরআন করীমের দিকে আরোপ করা তো প্রকারান্তরে এর বাগ্মিতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনার ওপর কালিমা লেপনের নামান্তর। কিছু লোক উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থই করেছেন, কিন্তু এতে করে প্রকৃতপক্ষে তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বরং প্রকৃত সত্য হলো. আয়াতটিতে 'ইন্নাহু' সর্বনামটি কুরআন করীমের দিকে যায়। অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে, কুরআন করীম পুনরুত্থান বা মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার জন্য নিদর্শন বটে। কেননা এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মৃতরা জীবিত হচ্ছে। গলে-পচে যাওয়া লোক কবর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং শুষ্ক হাড়গোড়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। অতএব স্বয়ং কুরআন করীম নিজেকে কিয়ামতের নমুনা বা দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করে। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন: وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا لِّنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا *(সূরা আল ফুরকান: ৪৯-৫০, পারা ১৯)* অর্থাৎ 'আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ কুরআন) যাতে, আমরা এর মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবিত করতে পারি। তিনি আরো বলেন: وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ *(সূরা কাফ: ১২)*

(অর্থাৎ 'কুরআন করীম দ্বারা আমরা মৃত ভূমি বা পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেছি আর পুনরত্থানও একইভাবে হবে'- অনুবাদক)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত



--- টীকাসমূহ ---

ইযালায়ে আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)



প্রথম টীকা

এক্ষেত্রে হযরত মসীহ্র শিষ্টাচার ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে এক কঠিন আপত্তি দেখা দেয়। কেননা মথি ২৩ অধ্যায় ৩ পদে তিনি বলেন, ফকীহ্ ও ফরিসিরা মূসার মসনদে বসে আছে অর্থাৎ তারা বড়ো বুযুর্গ! তিনি এ-ও জানতেন, এসব লোক ইহুদীদের আনুগত্যভাজন নেতা বলে আখ্যায়িত হতো এবং সীজারের দরবারে বিশেষ সম্মানের সাথে প্রধানদের মাঝে তাদের বসানো হতো। এসব কিছু সত্ত্বেও এ ফকীহ্ ও ফরিসিদেরকেই সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ অতি অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন। বরং আশ্চর্যের কথা হলো, ইহুদীদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও বুযুর্গরা নম্র ও শালীন ভাষায় সর্বত বিনয় বেশে হযরত মসীহ্র সমীপে এভাবে নিবেদন জানালেন, 'হে ওস্তাদ আমরা আপনার একটি নিদর্শন দেখতে চাই।' এর প্রত্যুত্তরে হযরত মসীহ্ তাদের সম্বোধন করে এ শব্দগুলো ব্যবহার করেন: এ যুগের পাপাচারী ও হারাম কর্মে লিপ্ত লোকেরা নিদর্শন সন্ধান করে....।' আর এতেই ক্ষান্ত হন নি। বরং তিনি সম্মানিত লোকদের প্রতি সর্বদা কটূক্তি করতেন। কখনো তাদেরকে বলেন: "হে সাপের দল ও সাপের বাচ্চারা!" দেখুন মথি: ২৩ অধ্যায় ৩৩ পদ। কখনো তাদের অন্ধ আখ্যায়িত করেন, দেখুন মথি ১৫ পদ ১৪ কখনো বলেন, 'হে ভণ্ড-কপট আলেম ও ফরিসিরা!' দেখুন মথি: ২৩ অধ্যায় ১৩ পদ। কখনো তাদের অতি অশ্লীল ভাষায় বলেন, 'বেশ্যারা তোমাদের পূর্বে আল্লাহ্র রাজ্যে ঢুকবে।' কখনো তাদের নাম শূকর ও কুকুর রাখেন, দেখুন মথি: ২১ অধ্যায় ৩১ শ্লোক। কখনো তাদের 'মূঢ়-আহাম্মক' আখ্যা দেন। দেখুন মথি: ২৩ অধ্যায় ১৭ পদ। কখনো তাদের বলেন, 'তোমরা জাহান্নামী।' দেখুন মথি: ৩২ অধ্যায় ১৬ পদ; অথচ নিজেই সহিষ্ণুতা ও সদাচারের উপদেশ দেন। বরং বলেন, 'যে কেউ নিজের ভাইকে আহাম্মক বলে সে জাহান্নামের

প্রথম টীকা ৭ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

আগুনে জ্বলবে ও আগুনের শাস্তিযোগ্য হবে।' সে আপত্তি খণ্ডন করা হবে সে সব সমালোচনার উত্তরে যা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে কতিপয় আত্মপ্রসাদে লিপ্ত ব্যক্তি এঅধম সম্পর্কে করেছে।

দ্বিতীয় টীকা

আবু তালিব সংক্রান্ত বৃত্তান্তের বিস্তারিত বিবরণ যদিও বিভিন্ন বইপুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে কিন্তু এখানে বর্ণিত এ বাক্যগুলোর সবটুকুই এলহামী যা খোদা তা'লা এই অধমের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ করেছেন। কেবল কোন কোন বাক্য ব্যাখ্যাস্বরূপ এ অধমের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে। এই এলহামী বাক্যাবলি থেকে আবু তালিবের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সুপ্রতিভাত। কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, ওই সহানুভূতির উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তীতে নবুওয়্যতের জ্যোতি ও অবিচল দৃঢ়তার চিহ্নাবলি অবলোকনের ফলাফলস্বরূপ।

আমাদের মনিব ও অভিভাবক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জীবনের এক বৃহদাংশ তথা চল্লিশ বছরকাল অসহায়, অনিশ্চয়তা ও এতিম অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন। দূরের ও নিকটের কোন আত্মীয়ই এই নিঃসঙ্গ জীবনে নিকটাত্মীয়সুলভ যথাযথ কোন কর্তব্য পালন করেন নি। পরিশেষে সেই আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ্ (সা.) তাঁর শৈশবকালে দুনিয়াতে যাদের কেউ নেই এমন লা-ওয়ারিস শিশুদের ন্যায় মরুচারী জাজাবর কোনো কোনো মহিলার নিকট সমর্পিত হলেন এবং সেই অসহায়ত্ব ও ও দারিদ্র্যের মাঝে সেই শ্রেষ্ঠ মানব (সা.) দুগ্ধপানের দিনগুলো পূরণ করেন। আর যখন কিছুটা জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে উপনীত হন, তখন দুনিয়াতে যাদের কেউই নেই এমন এতিম ও অসহায় শিশুদের ন্যায় সেই মরুবাসীরা মেষ চরাবার কাজ বিশ্বজগতের মহান সেবার পাত্র (সা.)-এর ওপর সোপর্দ করে। আর সেই অভাব অনটনের দিনগুলোতে নিম্নমানের শস্যদানা বা ছাগদুগ্ধ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কোন খাবার ছিল না। পরিপক্ক বয়সে যখন উপনীত হলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পরম সুদর্শন হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের জন্য কোনো চাচা প্রমুখরা একটু চিন্তাভাবনা করেন নি। বরং পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর আকস্মিক ভাবে একান্ত আল্লাহর কৃপায় মক্কার একজন অভিজাত বংশীয় ধনাঢ্য মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পছন্দ করে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যেখানে আবু তালেব, হামযা ও আব্বাসের মতো আপন চাচা মওজুদ ছিলেন, বিশেষত আবু তালেব মক্কার নেতৃস্থানীয় লোক

দ্বিতীয় টীকা **১১** *পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক*

এবং নিজ জাতির সরদারও ছিলেন এবং জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদের অনেক কিছুর অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তাদের এমন বিত্তবৈভব সত্ত্বেও মহানবীর (সা.) সেদিনগুলো অতিকষ্টে, অনাহারে-অর্ধাহারে ও নিরুপায় অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। অবশেষে তাঁকে বাধ্য হয়ে মরুবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরানোর কাজ করতে হয়। কিন্তু এ হৃদয়বিদারক অবস্থ দেখে কারো চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় নি। আর মহানবী (সা.)-এর যুবকালে উপনীত হওয়ার পরও কোনো চাচার মনে এ চিন্তা রেখাপাতও করে নি যে, তারাও পিতৃতুল্য এবং বিয়েশাদী ইত্যাদি বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। অথচ তাদের ঘরে এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের পরিবারেও বিবাহযোগ্য মেয়েরা ছিল। কাজেই এস্থলে স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, এতো অবজ্ঞা অনীহা তাদের পক্ষ থেকে কেন সংঘটিত হলো? এর প্রকৃত উত্তর এটাই যে, তারা দেখতে পাচ্ছিল, আমাদের সায়্যেদ ও মাওলা (সা.) এমন একজন এতিম বালক যার পিতামাতা কেউ নেই আর তাঁর কোন দল এবং জনবলও নেই। নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত এমন বিপদগ্রস্তের সাহায্য সহানুভূতি করে লাভ কী? তাঁকে জামা'তা বানানোর মানে নিজের কন্যাকে ধ্বংসের গহ্বরে ফেলে দেয়া। কিন্তু একথা (তাদের) জানা ছিল না যে, তিনি একজন যুবরাজ এবং আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ্দের শিরোমণি, যার হাতে দুনিয়ার যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তুলে দেয়া হবে। কুরআন করীম যত পরিষ্কারভাবে কঠোর ভাষা প্রয়োগের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে একজন চরম নির্বোধ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অনবহিত থাকতে পারে না। যেমন অধুনা নব্য সভ্য সুশীলদের মতে কাউকে অভিসম্পাত করা একটা কঠিন গালি বলে গণ্য হয় কিন্তু কুরআন করীম কাফিরদের প্রকাশ্যে অভিসম্পাত করে। যথা বলে:

أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا

(২য় পারা, সূরা আল বাকারা: ১৬২-১৬৩)

أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ *(দ্বিতীয় পারা, সূরা আল বাকারা: ১৬০)*

জানা কথা, যেকোন মানুষকে পশু বলাটাও এক ধরনের গালি। কিন্তু কুরআন করীম কাফির তথা অস্বীকারকারীদের কেবল পশুই বলে নি বরং দুনিয়ার সব পশুর চেয়ে নিকৃষ্টতর আখ্যায়িত করে। যেমন বলে: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا *(সূরা আন আনফাল: ৫৬)*। আর তেমনি এটা স্পষ্ট যে, নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির নাম নিয়ে বা ইঙ্গিতে তাকে লক্ষ করে গালি দেয়া অধুনা কালের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিরোধী। কিন্তু খোদা তা'লা কুরআন শরীফে কারো নাম আবু লাহ্ব কারো নাম কুকুর ও শূকর রেখেছেন আর আবু জাহল নাম নিজেই কুখ্যাত, তেমনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে

চরম পর্যায়ের কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে, তা আপাত দৃষ্টিতেই নোংরা গালিগালাজ বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন বলে:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ. أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

(সূরা আল কলম: ৯-১৭, পারা ২৯)

অর্থাৎ তুমি এসব প্রত্যাখানকারীদের কথায় চলো না যারা মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তুমি যেন তাদের উপাস্যদের মন্দ না বল এবং তাদের ধর্মের কুৎসা না কর। তবেই কিনা তারাও তোমার ধর্মের সাথে সহমত পোষণ করবে এবং সমর্থন করতে থাকবে! তুমি এদের তোষামোদি ও চাটুকারিতায় কর্ণপাতই করো না। এ ব্যক্তি যে নমনীয়তা বা চাটুকারিতা প্রত্যাশী সে মিথ্যা শপথকারী, দুর্বল ধ্যানধারণার অধিকারী, নীচ, হীন, ছিদ্রান্বেষী, পরনিন্দাকারী ও কথার মাধ্যমে মানুষের ভেতর বিভেদ সৃষ্টিকারী, পুণ্যের পথে বাধা দানকারী ব্যভিচারী, এসবের পাশাপাশি সে চরম পর্যায়ের দুশ্চরিত্র– এসব দোষ তো আছেই অধিকন্তু সে জারজও বটে। অচিরেই আমরা তার সে নাকে দাগ দেবো যা শূকরের নাকের মতো অনেক লম্বা হয়ে গেছে অর্থাৎ এমন নাক বলতে সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং মিথ্যা সম্মানসম্ভ্রমের পিছে চলা বুঝায় যা সত্য গ্রহণে বাধা দেয় (হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমাদের জাতির মাঝে উঁচু নাকধারীদের লাঞ্ছিত করো)। এখন হে সম্মানিত মৌলবী সাহেব! আপনার দৃষ্টিতে উক্ত উৎকর্ষ শব্দাবলির ব্যাপক আওতার বাইরেও কি কোনো গালমন্দ অবশিষ্ট রয়ে গেছে? এ স্থলে খুবই মজার একটি বিষয় হলো, ওয়ালীদ বিন মুগিরা নমনীয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রত্যাশা রাখত যে, তাদের সাথেও যেন (সত্য গোপনের মাধ্যমে) নমনীয় ব্যবহার করা হয়। এর উত্তরে তার সব পর্দা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত যে মুসলিমদের কাছে সত্য গোপনে নমনীয় হওয়ার প্রত্যাশা কোরো না।– *(গ্রন্থকার)*

তৃতীয় টীকা

এস্থলে কেউ যদি আপত্তি তোলে, জড়দেহসহ আকাশে যাওয়া অসম্ভব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এ দেহসহ মে'রাজের ঘটনা কী করে বৈধ (বা সম্ভব) হবে? এর উত্তর হলো, মে'রাজের ভ্রমণটি এ স্থূল দেহসহ ছিল না। বরং সেটি ছিল অতি উচ্চস্তরের কাশফ (বা দিব্যস্বপ্ন)। একে প্রকৃতপক্ষে জাগ্রতাবস্থা বলা উচিত। এমন দিব্যদর্শনে মানুষ এক 'নূরী'

তৃতীয় টীকা ১২ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

তথা জ্যোতির্ময় দেহসহকারে তার আত্মিক ক্ষমতার মানানুযায়ী (নফসে নাতেকা) ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করতে পারে। অতএব, যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মিক অবস্থান ছিল, সেহেতু তিনি (সা.) তাঁর মে'রাজের ভ্রমণে মহাবিশ্বের 'আরশে আযীম' বলে অভিহিত পরম স্তর পর্যন্ত উপনীত হন। অতএব, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল দিব্যদর্শনমূলক ভ্রমণ, যা জাগ্রত অবস্থার সাথে পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বরং এক প্রকার জাগ্রত অবস্থাই বটে। আমি একে স্বপ্ন নামে কখনো অভিহিত করি না এবং একে কাশফ বা দিব্যস্বপ্নের সাধারণ নিম্ন স্তরভুক্ত বলেও মনে করি না। বরং এটি হচ্ছে কাশফের সর্বমহত ও শ্রেষ্ঠতম মাকাম যা সত্যিকার অর্থে জাগ্রত অবস্থা বৈকি বরং এই স্থূল জাগ্রত অবস্থা থেকেও (উক্ত অবস্থাটি) অধিকতর স্বচ্ছ ও উজ্জ্বলতর হয়ে থাকে। এ প্রকারের দিব্যদর্শনে এ গ্রন্থকার নিজে অভিজ্ঞতা রাখে। এস্থলে আর অধিক লেখার সুযোগ নেই। ইনশাআল্লাহ্ অন্য কোনো উপলক্ষ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে।– *(গ্রন্থকার)*

চতুর্থ টীকা

আমি দাবির সাথে বলতে পারি যে সমগ্র বিশ্বে ব্রিটিশ সরকারের মতো এমন অন্য কোনো সরকার নেই যারা পৃথিবীতে এ রকম শান্তি স্থাপন করেছে। আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা যত স্বাধীনভাবে এ সরকারের অধীনে সত্যের প্রচার ও প্রসার করতে পারি সেভাবে এ ধর্মের কাজ আমরা মক্কা মুয়াযযামা বা মদীনা মুনাওয়ারায় বসেও কখনো করতে পারব না। এই শান্তি, এই স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে তৎকালীন আরবে থাকত, তাহলে তাদেরকে আদৌ তরবারির মাধ্যমে হত্যা করা হতো না। আর এই শান্তি, এই স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যদি সমসাময়িক রোম ও পারস্যের সরকারগুলোতে বিদ্যমান থাকত তাহলে রাজত্বগুলো অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত ও চলমান থাকত।– *(গ্রন্থকার)*

পঞ্চম টীকা

মহানবী (সা.)-এর দিব্যদর্শন ও স্বপ্নে যে-সব রূপকের ব্যবহার দেখা যায় তা হাদীস অধ্যয়নকারীদের দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। কখনো দিব্যদর্শনে নবী করীম (সা.)-কে দেখানো হয় যে, তিনি তাঁর হাতে দুটি সোনার কাঁকন পরে আছেন। এর মাধ্যমে সেই দুজন চরম মিথ্যাবাদীকে বুঝায় যারা নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবি

চতুর্থ টীকা ২১ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

পঞ্চম টীকা ২৭ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

করেছিল। আবার কখনো মহানবী দিব্যদর্শনে গাভি জবাই হতে দেখেছেন। এর দ্বারা সেসব সাহাবীদের বুঝায় যাঁরা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর এক কাশফে দেখেন যে, তাঁকে বেহেশতের একগুচ্ছ আঙুর আবু জাহলের জন্য দেয়া হয়েছে; এর অর্থ অবশেষে প্রকাশ পেলো ইকরামাহ্। একবার মহানবী দিব্যদর্শনে দেখেন যে, তিনি যেন এমন এক অঞ্চলের দিকে হিজরত করেছেন যা তার ধারণানুসারে ইয়েমেন ছিল কিন্তু বাস্তবে এর তা'বির ছিল মদিনা মুনাওয়ারা। অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত অন্যান্য নবীদের দিব্যদর্শনে বিদ্যমান অর্থাৎ বাহ্যত তাদের সামনে একটি বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ ছিল ভিন্ন। অতএব নবীদের কথায় রূপকের ভূমিকা থাকা কোনো বিরল বিষয় নয় এবং এমন বিষয়ও নয় যা বানোয়াট হবে ও কৃত্রিমভাবে সাজাতে হবে। বরং নবীদের এই রীতি জানা ও পরিচিত বিষয় যে, তাঁরা 'রূহুল কুদস' বা পবিত্রাত্মায় পূর্ণ হয়ে উপমা ও রূপকভাষায় কথা বলেন। আর ঐশীবাণীর পছন্দনীয় পদ্ধতি এটাই যে, বস্তুজগতে ঊর্ধ্বলোক থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা অধিকাংশক্ষেত্রে রূপকে পরিপূর্ণ থাকে। সাধারণত প্রত্যেক মানুষেই কোন না কোন সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে যা নবুওয়্যতের ছিচল্লিশতম অংশ বলে (পবিত্র হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর শাখা প্রশাখায়ও যদি প্রণিধান কর তাহলে বিরলই এমন কোনো স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে যাতে রূপকের ব্যবহার নেই।

এখন এটিও জানা থাকা উচিত যে, মুসলিম শরীফের 'দামেস্ক' শব্দটি, অর্থাৎ সহীহ্ মুসলিমে যে লেখা আছে, হযরত মসীহ্ দামেস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত সাদা মিনারের কাছে অবতীর্ণ হবেন, এতে দামেস্ক শব্দটি সূচনাকাল থেকে গবেষকদের বিস্ময়াবাক করে আসছে। কেননা বাহ্যত কিছুই জানা যায় না যে, দামেস্কের সঙ্গে মসীহ্র কী সামঞ্জস্য এবং মসীহ্র সাথেই-বা দামেস্কের কী বিশেষত্ব! তবে যদি একথা লেখা থাকত যে, মসীহ্ মক্কা মুয়ায্যামায় নাযেল হবেন অথবা মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হবেন তাহলে এ নামগুলোকে বাহ্যিক অর্থে নেয়া সঠিক হতো। কেননা মক্কা মুয়ায্যমায় খোদার গৃহ অবস্থিত এবং মদীনা মুনাওয়ারা রসূল (সা.)-এর রাজধানী। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, যে কারণে সকল পবিত্র স্থান ছেড়ে নাযিল হওয়ার জন্য কেবল দামেস্ককেই বেছে নিতে হবে। কাজেই এ জায়গায় নিঃসন্দেহে রূপকের আবরণে কোনো তাৎপর্যমূলক অর্থ রয়েছে যা প্রকাশ করা হয় নি।

এর সত্যিকার অর্থ অনুসন্ধানের প্রতি এ অধমের মনোযোগ নিবদ্ধ করার পূর্বেই আমার একজন আন্তরিক বন্ধু মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব এখানে, অর্থাৎ কাদিয়ান আসেন। তিনি সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত হাদীসটিতে দামেস্কসহ অনুরূপ যে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রূপক শব্দ রয়েছে, এগুলোর প্রকৃত অর্থ উন্মোচনের

উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সবিশেষ মনোসংযোগে দোয়ার অনুরোধ করলেন। কিন্তু ওই সময় যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম এবং আমার মস্তিষ্ক কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় অপারগ ছিল সেহেতু উল্লিখিত যাবতীয় লক্ষণীয় বিষয়ে আমি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে অপারগ ছিলাম। কেবল সামান্য কিছু মনোনিবেশে একটি শব্দের ব্যাখ্যা, অর্থাৎ দামেস্ক শব্দটির প্রকৃত রহস্য আমার প্রতি উন্মোচিত হলো। আর সেই সাথে একটি অতি পরিষ্কার ও স্পষ্ট দিব্যদর্শনে আমার কাছে প্রকাশ করা হলো যে, আবু দাউদে একজন হারেস, অর্থাৎ হুররাস আসার সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে তা সঠিক। এ ভবিষ্যদ্বাণী এবং মসীহ্র আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে উভয়ের সত্যায়নস্থল ও সত্যায়নকারী এক-অভিন্ন অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী দুটি একই ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্ণ হবে। আর সে ব্যক্তি হলো এ অধম।

অতএব, দামেস্ক শব্দটির তাৎপর্য যা এলহামের মাধ্যমে আমার নিকট প্রকাশ করা হয়েছে সেটি আমি প্রথমে উপস্থাপন করবো। এরপর আবু দাউদ বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে আমাকে বোঝানো হয়েছে সেটিও আমি বর্ণনা করবো।

অতএব স্পষ্ট করার জন্য বলছি, দামেস্ক শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার নিকট ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এস্থলে এমন একটি জনবসতির নাম দামেস্ক রাখা হয়েছে, যেখানে এমন লোক বাস করে যারা এজিদ স্বভাবসম্পন্ন ও নোংরা এজিদের স্বভাবচরিত্র এবং ধ্যানধারণার অনুসারী। যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি আদৌ ভালোবাসা নেই এবং আল্লাহ্র শিক্ষা ও নির্দেশাবলির প্রতিও মাহাত্মবোধ নেই। যারা তাদের প্রবৃত্তির কামনাবাসনাকে নিজেদের উপাস্যের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে এবং তারা তাদের নফসে আম্মারা বা অবাধ্য প্রবৃত্তির এমনভাবে দাসত্ব করে যে, অতি পাকপবিত্র মহাপুরুষদের হত্যা করাও তাদের দৃষ্টিতে অতি সামান্য বিষয় এবং পরকালে তারা অবিশ্বাসী। খোদা তা'লার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা তাদের দৃষ্টিতে একটা জটিল বিষয় যা তাদের জন্য দুর্বোধ্য। যেহেতু চিকিৎসকের রোগীদের কাছেই আসা উচিত, সেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ্র পক্ষেও তাদের মাঝেই অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। মোটকথা, আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, দামেস্ক শব্দটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সেই স্থানকে বোঝায় যেখানে দামেস্কের সেই প্রসিদ্ধ বিশেষত্বটি দৃশ্যমান। খোদা তা'লা মসীহ্র অবতীর্ণ হওয়ার স্থানটিকে যে দামেস্ক বলে বর্ণনা করেছেন, এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ দ্বারা সেই আসল মসীহ্কে বুঝায় না, যার প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, বরং মুসলমানদের মধ্যকার কোন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থানের দিক থেকে হযরত মসীহ্ (আ.) এবং হযরত ইমাম হুসায়ন (আ.)-এরও সদৃশ হবেন। কেননা দামেস্ক (ঐতিহাসিকভাবে) এজিদের রাজধানী

হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে এবং এজিদি লোকদের সেই দুরভিসন্ধির কেন্দ্রস্থল। যেখান থেকে সহস্র সহস্র অন্যায় অত্যাচারপূর্ণ আদেশ জারি হয়েছে সে স্থানটি দামেস্কই বটে। এজিদীরা সেইসব ইহুদীদের সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখে, যারা হযরত মসীহ্‌র জীবদ্দশায় (জিরুযালেমে) ছিল। অতএব দামেস্কে হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়া দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মসীহ্ সদৃশ ব্যক্তি হযরত ইমাম হুসায়নের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উক্ত উভয় পুণ্যাত্মার সাথে সামঞ্জস্য রাখবেন আর ইহুদী সদৃস এজিদদের সতর্ক ও অভিযুক্ত করার জন্য আসবেন। আর এটা স্পষ্ট যে, এজিদের স্বভাবসম্পন্ন লোকগুলো ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, এমন নয় যে তারা প্রকৃতপক্ষেই ইহুদী। কাজেই দামেস্ক শব্দটি স্পষ্টত ব্যক্ত করছে যে, অবতরণকারী মসীহ্ও প্রকৃতপক্ষে মসীহ নন বরং এজিদীরা যেমন ইহুদীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে ঠিক সেভাবে অবতরণকারী মসীহ্ও মসীহ্ সদৃশ এবং হুসায়নী প্রকৃতির বটে। এটি অতি সূক্ষ একটি গুঢ় বিষয়। এতে গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, দামেস্ক শব্দটি কেবলমাত্র রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু হযরত ইমাম হুসায়নের নির্যাতিত জীবনের ঘটনা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অনেক মাহাত্ম্য ও মূল্য রাখে এবং এ ঘটনা হযরত মসীহ্‌র ঘটনার সাথে এতো সাদৃশ্যপূর্ণ যে, খ্রিষ্টানদেরও এ বিষয়ে অমত থাকতে পারে না। এ কারণে খোদা তা'লা অনাগত যুগের লোকদেরও এ ঘটনার মাহাত্ম্য এবং হযরত মসীহ্‌র সাথে এর সাদৃশ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করতে চেয়েছেন। এ কারণেই দামেস্ক শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের চোখের সামনে সে যুগটি এসে যায় যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরম প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসায়ন হযরত মসীহ্‌র মতো চরম অন্যায় ও নির্যাতনের শিকার হয়ে দামেস্কের হতভাগাদের অবরোধে আটকা পড়ে নিহত হন। অতএব যেখান থেকে এ রকম অন্যায় আদেশনির্দেশ জারি হত এবং যেখানে এ ধরনের পাষাণ ও তমাসাচ্ছন্ন হৃদয়ের লোক জন্মেছিল সেই দামেস্ককেই চিহ্নিত করে আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করলেন যে, এখন দামেস্ক সদৃশ এ স্থানটি (তথা কাদিয়ান) ন্যায়নীতি ও ঈমান বিস্তারে কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে কেননা অধিকাংশ নবীই অত্যাচারীদের আবাসস্থলে আবির্ভূত হয়ে এসেছেন এবং খোদা তা'লা অভিশাপের জায়গাগুলোকেই আশিসযুক্ত স্থানে রূপান্তরিত করে এসেছেন। রূপক এ বর্ণনাটি আল্লাহ্ তা'লা এজন্য অবলম্বন করেছেন যাতে পাঠকের দুটো উপকার হয়। প্রথমত নির্যাতিত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেদনাবিধূর শাহাদতের ঘটনাটির মাহাত্ম্য ও মর্যাদা যেন মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়, যে বেদনাত্মক ঘটনাটির সংবাদ হাদীসে দামেস্ক শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিতে ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ যাতে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, দামেস্কের

আধিবাসীরা যেমন প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ছিল না, কিন্তু ইহুদীদের মতো কাজ করেছিল, তেমনি যে মসীহ্ অবতীর্ণ হবেন তিনিও আক্ষরিক অর্থে (পূর্বের) মসীহ্ নন। বরং তিনি মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি বটে। এ স্থলে যার অন্তরে হযরত ইমাম হুসায়ন সংক্রান্ত ঘটনার যথাযথ মর্যাদাবোধ নেই, এমন ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই আমার বর্ণনাকৃত দামেস্কের বিশেষত্বটি স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে নেবেন। কেবল গ্রহণই করবেন না, বরং এ বিষয়বস্তুটিতে গভীর মনোনিবেশ করায় বস্তুত 'হাক্কুল একীন' তথা অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাসের মাত্রায় উন্নীত হবেন। ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যে হযরত মসীহ্র সাথে তুলনা করা হয়েছে, এটি খুবই সূক্ষ্ম একটি রূপক বিষয়, যা আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব। এখন প্রথমে আমি বর্ণনা করতে চাই যে, খোদা তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, এ কাদিয়ান জনপদটি দামেস্কের সাথে এ কারণে এক প্রকার সাদৃশ্য রাখে যে, এখানে বেশির ভাগই এজিদী স্বভাবচরিত্রের মানুষ বসবাস করে। এটা স্পষ্ট যে, সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সামঞ্জস্য আবশ্যিক নয়। বরং প্রায়শ একটি সামান্য মিলের কারণে, বরং কেবল কোন একটি আংশিক বিষয়ে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের কারণে কোন একটি জিনিসের নাম অন্যটিকে দেয়া হয়। যেমন একজন বীরপুরুষকে বাঘ বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয়, সে একটি বাঘ। এটি আবশ্যিক মনে করা হয় না যে বাঘের ন্যায় তার থাবাও থাকবে। আর তেমনি শরীরে পশম এবং তার একটি লেজও থাকতে হবে। বরং কেবলমাত্র বীরত্বের দিক থেকে এরকম একটি নাম প্রয়োগ করা হয়। বস্তুত সাধারণভাবে সবরকম রূপকের ক্ষেত্রে এ নিয়মবিধিই (কার্যকর) রয়েছে। খোদা তা'লা এ সাধারণ নিয়ম অনুসারেই এ কাদিয়ান পল্লীকে দামেস্কের সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কাদিয়ান সম্পর্কে আমার প্রতি এ এলহামও অবতীর্ণ হয়েছে: أخرج منه اليزيديون অর্থাৎ এখানে এজিদী (স্বভাবসম্পন্ন) লোকদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও এটি আমার দাবি নয় এবং খোদা তা'লাও স্পষ্টভাবে আমার নিকট প্রকাশ করেন নি যে, দামেস্কে 'মসীহ্ সদৃশ' কেউ সৃষ্টি হবেন না। বরং আমার মতে ভবিষ্যতে কোন সময়ে বিশেষভাবে দামেস্কেও কোন 'মসীহ্ সদৃশ' ব্যক্তি আবির্ভূত হতে পারেন। কিন্তু খোদা তা'লা ভালো জানেন এবং তিনি এ ব্যাপারে সরাসরি সাক্ষী যে, তিনি কাদিয়ানকে দামেস্কের সাথে তুলনা করেছেন এবং এ লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা এজিদী স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ এখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশ স্বভাবচরিত্রে এজিদী লোকদের মতো। বহুকাল আগে এই এলহামও অবতীর্ণ হয়েছে: إنا أنزلناه قريبا من القاديان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وكان وعد الله مفعولا অর্থাৎ 'আমরা তাকে কাদিয়ানের কাছে অবতীর্ণ করেছি। সত্যের সাথে অবতীর্ণ করেছি

আর সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবধারিতই ছিল।' এ 'এলহাম'টিতে গভীর দৃষ্টিপাতে প্রতিভাত হয় যে, খোদা তা'লা কর্তৃক কাদিয়ানে এ অধমের আবির্ভাব ঐশী গ্রন্থাবলিতে পূর্বকাল থেকে লিপিবদ্ধ ছিল। এখন যেহেতু বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে কাদিয়ানকে দামেস্কের সাথে সাদৃশপূর্ণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই স্পষ্টত কাদিয়ানের নাম পূর্ববর্তী ঐশী লিপিসমূহে রূপকভাবে দামেস্ক রেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা 'সিহাহ্ সিত্তার' কোন হাদীস গ্রন্থে অথবা কুরআন করীমে কাদিয়ানের নাম লেখা পাওয়া যায় না। আর 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত উক্ত এলহামটি অতি স্পষ্ট ভাষায় ও উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করছে যে, কাদিয়ানের নাম কুরআন করীমে অথবা নবী করীম (সা.)-এর হাদীসে ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে। তবে যেহেতু দেখা যায় না সেহেতু এছাড়া আর কোন দিকে মনেযোগ নিবদ্ধ হতে পারে যে, খোদা তা'লা কাদিয়ানের নাম কুরআন করীমে অথবা পবিত্র হাদীসে ভিন্ন কোন আকারে অবশ্যই উল্লেখ করে থাকবেন। আর এখন সদ্য অবতীর্ণ এলহাম দ্বারা এ বিষয়টি যেহেতু প্রমাণ হয়ে গেল যে, কাদিয়ান খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দামেস্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; তাই পূর্বে অবতীর্ণ এলহামের অর্থও স্পষ্ট হয়ে গেল। অন্য কথায়, এ অধমের অন্তরে এলহামী তথা ঐশীবাণীরূপে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ إنا أنزلناه قريبا من القاديان– বাক্যটির তফসীর (ব্যাখ্যা) হলো নিম্নরূপ:

إنا أنزلناه قريبا من دمشق بطرف شرقي عند المنارة البيضاء (অর্থ: নিশ্চয় আমরা তাকে দামেস্কের নিকটে পূর্ব দিকে শুভ্র মিনারার কাছে 'অবতীর্ণ করেছি।'– অনুবাদক)। কেননা অধমের বাস ভবনটি কাদিয়ানের পূর্ব কিনারায় মিনারের কাছে অবস্থিত। কাজেই كان وعد الله مفعولا (অর্থ: এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবধারিতই ছিল।– অনুবাদক) এলহামের এ বাক্যটির উল্লিখিত ব্যাখ্যার সাথে সমন্বয় সাধিত হয়ে এ ভবিষ্যদ্‌বাণীটি বস্তুতঃপক্ষে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এ বাক্যটিতে উপনীত হলে এ অধমের প্রতি নিম্নরূপ এলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয়:

قل لو كان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرًا. قل لو اتبع الله أهواءكم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ولبطلت حكمته وكان الله عزيزًا حكيمًا. قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكان الله غفورا رحيما

(অর্থ: এ বিষয়টি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে এসে থাকত তাহলে এর মধ্যে তারা অনেক স্ববিরোধ ও অসংগতি দেখতে পেতো। বলো, আল্লাহ্ যদি তোমাদের কামনাবাসনার অনুসরণ করতেন তাহলে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু এ দুয়ের মাঝে রয়েছে তা সবই বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো হয়ে পড়ত এবং তাঁর হিক্মত (প্রজ্ঞা) বৃথা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হত। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাবান। বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যেতো, তাহলে আমার প্রভুর বাণীসমূহ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র ফুরিয়ে যেতো। যদি আমরা অনুরূপ আরও কালি উপস্থিত করতাম তবুও। বল, আল্লাহ্কে যদি তোমরা ভালোবাসো তাহলে আমার অনুবর্তিতা কর। (তাহলে) আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় ও বার বার কৃপাকারী।– অনুবাদক)

এরপর আরও 'এলহাম' হয়:

ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں میری پرستش کی جگہ میں اُن کے پیالے اور ٹھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں

(অর্থ: এই আলেম উলামা আমার ঘরকে বদলে ফেলেছে। আমার উপাসনালয়ে রয়েছে তাদের চুলো। আমার ইবাদত করার জায়গাতে (তারা) তাদের বাটি খুরি রেখে দিয়েছে এবং ইঁদুরের মতো আমার নবীর হাদীসসমূহকে কেটে টুকরো টুকরো করছে।– অনুবাদক)। (এলহামের ভাষ্যটিতে উল্লিখিত) 'ঠুঠিয়াঁ' হলো সেই সব ছোটো পেয়ালা যেগুলোকে ভারতবর্ষে 'সকুরিয়া' বলা হয়। 'ইবাদতগাহ্' দ্বারা উক্ত এলহামে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মৌলবীদের অন্তর বুঝায়, যা অত্যন্ত সংসারাসক্ত।

এ স্থলে আমার স্মরণ হলো, যেদিন 'কাদিয়ানে নাযেল হওয়া' সংক্রান্ত এলহামটি অবতীর্ণ হয়েছিল সেদিন দিব্যদর্শনে আমি দেখি যে, আমার ভাই সাহেব মরহুম মির্যা গোলাম কাদের আমার কাছে বসে উঁচু আওয়াজে পবিত্র কুরআন পাঠ করছেন এবং এ ধারাবাহিকতায় তিনি এ বাক্যগুলো পাঠ করলেন: إنا أنزلناه قريبا من القاديان তা শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম, কাদিয়ানের নাম কি কুরআন করীমেও লেখা আছে! তখন তিনি বললেন, 'এই দেখো লেখা আছে।' তখনই আমি তাকিয়ে দেখলাম। জানতে পারলাম, কুরআন করীমের ডান দিকের একটি

পাতায় এর প্রায় অর্ধভাগে এলহামযোগে অবতীর্ণ এ বাক্যটি লেখা রয়েছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ সত্যিই কাদিয়ানের নাম কুরআন শরীফে লেখা আছে। আর আমি বললাম, 'তিনটি শহরের নাম সম্মানের সাথে কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মক্কা, মদীনা এবং কাদিয়ান'। এ (বৃত্তান্তটি) ছিল কাশ্‌ফ তথা দিব্যদর্শন যা কয়েক বছর পূর্বে আমাকে দেখানো হয়েছিল। কয়েক বছর আগে পরলোকগত আমার ভাইকে এ দিব্যদর্শনে আমি কুরআন শরীফ পড়তে দেখলাম এবং (আমার প্রতি অবতীর্ণ) এ এলহামী বাক্যটি তাঁর মুখে কুরআন তিলাওয়াতের সময় পাঠ করতে শুনলাম। এতে যে গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে সেটি খোদা তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করলেন যে, তাঁর নামের সাথে এ কাশ্‌ফের ব্যাখ্যার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ তার নামটিতে যে 'কাদের' শব্দ রয়েছে এ শব্দটি কাশ্‌ফীভাবে উপস্থাপন করে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ হচ্ছে 'কাদের মুতলাক'– সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার কাজ। এতে মোটেও বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর শক্তির বিস্ময়কর বিষয়াদি এমনি ধারায় সবসময় প্রকাশিত হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনি দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেন এবং বড়ো বড়ো সম্মানিত ও মর্যাদাবান লোকদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বড়ো বড়ো উলামা ও অতি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তাঁর কল্যাণ প্রবাহের উৎস থেকে সম্পূর্ণ হতভাগা ও বঞ্চিত থেকে যায়। আর একজন অত্যন্ত তুচ্ছ নিরক্ষর, অজ্ঞ অযোগ্য ব্যক্তি ঐশী মনোনয়নে সম্মানিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীতদের দলভুক্ত হয়ে থাকেন; এটিই তাঁর চিরন্তন রীতি আর আবহমান কাল থেকে তিনি এমনটিই করে এসেছেন। وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এতে ধন্য করেন।– অনুবাদক)

এখন আমি 'সহীহ্ আবু দাউদ'-এ উল্লিখিত হাদীসটি উপস্থাপন করব এবং এর পূর্ণতা বা সত্যায়নস্থল ও সত্যায়নকারী ব্যক্তির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। অতএব স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা উচিত, 'সহীহ্ আবু দাউদে' এ ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, 'হারেস' নামে এক ব্যক্তি 'হাররাস' অর্থাৎ একজন নামকরা জমিদার 'মা ওয়ারায়িন্ নাহ্‌র' (অঞ্চল) থেকে অর্থাৎ সমরকন্দের দিক থেকে বের হবেন। তিনি 'আলে রসূল'-কে শক্তি যোগাবেন। এ ব্যক্তির সাহায্য সহায়তা করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। '

এলহাম যোগে আমার প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং সেই (প্রতিশ্রুত) মসীহ্‌র মুসলমানদের মধ্য থেকে আসা এবং তাঁর মুসলমানদের ইমাম ও নেতা হওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্‌বাণী– দুটোই প্রকৃতপক্ষে এক-অভিন্ন বিষয়বস্তু

সম্বলিত এবং এ উভয়টির সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল এ অধমই বটে। বস্তুত মসীহ্‌র নামে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে, এর বিশেষ দুইটি লক্ষণ বা চিহ্ন রয়েছে:

এক, মসীহ্ যখন আসবেন তখন মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা চরমভাবে বিশৃঙ্খল ও বিকারগ্রস্থ হবে। সে অবস্থাকে তিনি তাঁর সঠিক শিক্ষা দ্বারা সংশোধন করবেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক নিঃস্বতা ও অভ্যন্তরীণ দৈন্যতাকে সম্পূর্ণ দূর করে জ্ঞানসত্য ও তত্ত্বের অফুরন্ত মনিমুক্তা তাদের সম্মুখে তুলে ধরবেন। এমনকি তারা এ অগাধ ধনসম্পদ গ্রহণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যকার কোন সত্যান্বেষী অধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নিঃস্ব ও রিক্ত থাকবে না। আর যারা সত্যের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত– তাদের সবাইকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সত্যিকার, সুস্বাদু ও পবিত্র খাদ্য দান করবেন এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের সুপেয় শরবত পান করানো হবে। প্রকৃত ও যথার্থ জ্ঞানের মোতি দ্বারা তাদের ঝুলি ভরে দেয়া হবে এবং কুরআন করীমের সারকথা ও মূলতত্ত্বে ভরা আতরের শিশি তাদের দান করা হবে।

দ্বিতীয় বিশেষ চিহ্ন হচ্ছে– সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন আসবেন তখন ক্রুশভঙ্গ করবেন ও শূকর বধ করবেন আর এক চক্ষুবিশিষ্ট দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং যে কাফির পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাসবায়ু পৌঁছবে, সে সাথে সাথেই মারা যাবে। অতএব এসব লক্ষণের প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থ হলো (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ দুনিয়ায় এসে ক্রুশীয় ধর্মমতের জাঁকজমক ও মহিমাকে পদপিষ্ট করবেন আর যেসব লোকের মধ্যে শূকরসুলভ নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও মলভক্ষণের স্বভাব রয়েছে– অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের অস্ত্র প্রয়োগে তাদের সংহার করবেন। যারা কেবল পার্থিবতার চোখ ধারণ করে থাকবে ও ধার্মিকতায় যারা দৃষ্টিহীন হবে, বরং এক বিশ্রী ফোলা আঁচিলবিশেষ তাদের চোখে বেরিয়ে থাকবে, অতি উজ্জ্বল যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে অভিযুক্ত করে তাদের অবিশ্বাসসুলভ অস্তিত্বের অবসান ঘটাবেন। আর শুধু এরকম এক চক্ষুবিশিষ্ট লোকগুলোই নয় বরং মুহাম্মদীয় দ্বীন ও ধর্মকে যে হেয় দৃষ্টিতে দেখে, এমন প্রত্যেক অস্বীকারকারী ব্যক্তি 'মসীহী' যুক্তিপ্রমাণের শক্তিশালী নিঃশ্বাস প্রবাহে আধ্যাত্মিকভাবে নির্মূল হয়ে যাবে।

মোটকথা, (হাদীসে বর্ণিত) এসব বাক্য রূপকভাবে বর্ণিত। এসবই এ অধমের ওপর সুস্পষ্টাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এখন কেউ তা বুঝুক বা না বুঝুক, পরিশেষে কিছুকাল অপেক্ষা করে নিজেদের অলীক প্রত্যাশা থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে একদিন সবাই এদিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

এ মহূর্তে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কিত চিহ্নাবলি লিখতে গিয়ে একটি সত্য স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল যা এখানে রুচিশীল লোকদের উপভোগের জন্য আমি লিপিবদ্ধ করছি। অতি উচ্চ মার্গের পরমপুণ্যবান একব্যক্তি যিনি খোদার সিদ্ধ পুরুষদের একজন ছিলেন, যিনি ঐশী বাক্যালাপের সম্মানেও ভূষিত ছিলেন, পরিপূর্ণ মাত্রায় নবী (সা.)-এর 'সুন্নত' তথা জীবনাদর্শের অনুসরণকারী, তাক্ওয়া ও পবিত্রতার সকল মার্গ ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান এবং সেসব সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের, খোদা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন এবং খোদার দিকে সর্বতোভাবে আকৃষ্ট সত্যবাদী ও নিষ্ঠাপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ধর্মকর্মে সারাক্ষণ পুরোদমে তৎপর এবং আল্লাহ্র স্মরণে আত্মমগ্ন, আর এ পথেই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন; তাঁর মহামর্যাদাপূর্ণ নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ গজনবী। একবার আমি এই পুত-পবিত্র বুযুর্গকে তাঁর অন্তর্ধানের পর স্বপ্নে দেখি, সৈনিক বেশে পরম মহিমা ও প্রতাপের সাথে বিরাট পাহলোয়ানের মতো সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান রয়েছেন। তখন আমি আমার (প্রতি অবতীর্ণ) কিছু এলহাম তথা ঐশী বাণীর উল্লেখ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি- এর ব্যখ্যা করুন। স্বপ্নটিতে আমি দেখেছি, আমার হাতে একটি তরবারি রয়েছে যার হাতল বা বাঁট আমার মুঠোয় এবং এর তীক্ষ্ণপ্রান্ত আকাশ স্পর্শ করছে। আমি কখনো এটি ডান দিকে চালাই (বা ঘুরাই), তখন সহস্র সহস্র বিরুদ্ধবাদী এটি দ্বারা নিহত হয়। আর যখন বাঁ দিকে ঘুরাই তখন হাজার হাজার দুশমন মারা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ সাহেব রাযিয়াল্লাহু তা'লা আন্হু আমার এ স্বপ্নটি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। উৎফুল্ল, প্রফুল্লচিত্ত ও স্বতস্ফূর্ততার লক্ষণ ও ছাপ তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়। তিনি বলেন, 'এর তা'বির হলো, খোদা তা'লা আপনাকে দিয়ে বড়ো বড়ো কাজ করাবেন। আর আপনি যে ডান দিকে তরবারি চালিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের নিহত হতে দেখেছেন তার অর্থ হলো, সেই অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের কাজ আলো ও আশিষের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে সাধিত হবে। আর বামে তরবারি চালনার ফলে সহস্র সহস্র শত্রু নিপাত হওয়ার অর্থ হলো, আপনার যুক্তিপ্রমাণের বলে খোদা তা'লা প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত ও নিরুত্তর করবেন আর জগদ্বাসীর সামনে উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করবেন। এরপর তিনি বললেন, "আমি যখন পৃথিবীতে ছিলাম তখন আমি আশান্বিত ছিলাম যে, খোদা তা'লা নিশ্চয় অনুরূপ কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন।" এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ রাহেমাহুল্লাহ্ আমাকে একটি সুপ্রশস্ত গৃহের দিকে নিয়ে যান। সেখানে দেখি, খোদাভীরু ও সিদ্ধপুরুষদের একটি জামা'ত সমবেত রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সশস্ত্র সৈনিকের বেশে এমনভাবে তৎপর মনে হচ্ছিল যেন যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন আদেশের অপেক্ষায় আছেন এবং আশু এ আদেশ তাঁদের দেয়া হবে। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়।

এ সত্যস্বপ্নটি প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার 'কাশ্‌ফ' বা দিব্যদর্শন যা রূপকভাবে সেইসব চিহ্নাবলির দিকে নির্দেশ করছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সম্পর্কে একটু আগে আমরা যা বর্ণনা করে এসেছি। অর্থাৎ শূকরদের বধ করা এবং সাধারণভাবে কাফিরদের হত্যা করা– এ সবই এ অর্থেই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঐশী যুক্তিপ্রমাণ চূড়ান্তভাবে তুলে ধরবেন এবং 'বাইয়্যেনা' তথা উজ্জ্বল নিদর্শন-এর তরবারি দিয়ে তাদের নির্মূল করবেন। وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصواب (অর্থাৎ সঠিক বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী– অনুবাদক)।

'হারিস' নাম সংবলিত যে ভবিষ্যদ্‌বাণীটি রয়েছে, এতে তার বিশেষ পাঁচটি চিহ্ন বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ সে তরবারি ও বর্শা ছাড়া কেবল তার বিশ্বাসের জোরে, তার তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি ও রচনাবলির কল্যাণে সত্যান্বেষী ও সত্য-পিপাসুদের শক্তি যোগাবে। অবস্থানকে দৃঢ় করবেন কুরায়শ বংশীয় মু'মিনগণ মক্কা মুয়ায্‌যামায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতাকে গ্রহণ করে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য, নিষ্ঠা ও উৎকর্ষ ঈমানের লক্ষণসমূহ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রচার কাজের হাতকে শক্তিশালী করেছেন এবং মক্কা মুয়ায্‌যামায় ইসলামের অবস্থানকে দৃঢ় করেছেন সে তার একনিষ্ঠ বীরত্ব ও মু'মিনসুলভ সাক্ষ্যসমূহের।

দ্বিতীয়তঃ চিহ্নটি হচ্ছে, সেই 'হারিস' 'ওয়ারায়িন নহর' অঞ্চলের (বাসিন্দা) হবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, সে সমরকন্দ বা বুখারাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তৃতীয়তঃ সে বিশিষ্ট জমিদার বংশের সদস্য হবে এবং কৃষিজীবী হবে।

চতুর্থতঃ সে এমন সময়ে আবির্ভূত হবে, যখন 'আলে-মুহাম্মদ' অর্থাৎ মুত্তাকী মুসলমানগণ যাঁরা জাতি ও উম্মতের ভদ্র শ্রেণি তারা ধর্মের কোন সাহায্যকারী এবং তাদের পক্ষ থেকে শত্রুর কোন মোকাবিলাকারীর মুখাপেক্ষী হবেন। 'আলে মুহাম্মদ' শব্দে একটি শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র শ্রেণির উল্লেখ করে যারা পবিত্রতায় তাদের সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রাখে, তাদের সে অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যেমন কিনা 'মুতাকাল্লিমীন' তথা পণ্ডিত দর্শনবিদর এটি এক সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি যে, অনেক সময় কোন কিছুর অংশবিশেষের উল্লেখ করে সেটির পুরোটাকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

সেই হারিসের পঞ্চম চিহ্ন হলো, তিনি শাসক বা বাদশাহ্ বা কোন দল নিয়ে আবির্ভূত হবেন না বরং (তার ওপর ন্যস্ত) এ উত্তম ও উচ্চপর্যায়ের কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁর জাতির সাহায্য সহায়তার মুখাপেক্ষী হবেন।

এখন প্রথমে আমরা সহীহ আবু দাউদে বর্ণিত হাদীসটি হুবহু উপস্থাপন করব। এরপর আমার ক্ষেত্রে এর পূর্ণতার ততটা প্রমাণ তুলে ধরব যতটা পর্যাপ্ত ও সমীচীন হবে। অতএব হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن علی قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النھر یقال لہ الحارث حراث علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور یُوطن أو یمکن لآل محمد کما مکّنت قریش لرسول اللّٰہ صلعم وجب علی کل مؤمن نصرہ أو قال إجابتہ

অর্থাৎ আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু হতে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি 'ওরায়িননাহ্র'– নদীর ওপার থেকে আবির্ভূত হবে, অর্থাৎ বোখারা বা সমরকন্দ তার আসল জন্মভূমি হবে। সে হারিস নামে অভিহিত হবে, অর্থাৎ তার পিতৃপুরুষের পেশার ক্ষেত্রে জনশ্রুতি অনুসারে কিংবা এই ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে জমিদার বলে অভিহিত হবে। এরপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, কেন সে 'হারিস' (জমিদার) বলে অভিহিত হবে? এ কারণে যে, সে 'হাররাস' অর্থাৎ স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন জমিদার হবে। কৃষিকাজের সাথে জড়িত একটি সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হবে। এর পর তিনি (সা.) বলেন, তার বাহিনী তথা তার জামা'তের শীর্ষনেতা ও প্রধান হবে একজন ঐশী সমর্থন প্রাপ্ত ও মদদপুষ্ট ব্যক্তি। উর্ধ্বলোকে তাকে 'মনসুর' (সাহায্য প্রাপ্ত) নামে ডাকা হবে। কেননা খোদা তা'লা স্বয়ং তার সেবক সুলভ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পসমূহের বাস্তবায়নে সাহায্যকারী হবেন। এ স্থলে এই 'মনসুর'কে যদিও সেনাপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক বা তীরতরবারীর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বোঝায় না। বরং এটি এক রূহানী বাহিনী হবে যা সেই 'হারিস'কে দান করা হবে। যেমন কিনা দিব্যদর্শনে এ অধম প্রত্যক্ষ করেছে, মানুষের আকৃতিতে দুব্যক্তি একটি গৃহে বসে রয়েছে। একজন মাটিতে, অপরজন ছাদের কাছে বসে আছে। তখন আমি মাটিতে বসা ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললাম, 'আমার এক লাখ সৈন্যের প্রয়োজন।' কিন্তু সে নীরব রইল। কোন উত্তর দিল না। তখন আমি অপরজনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। সে ছাদের কাছে উপরের(অর্থাৎ আকাশের) দিকে বসা ছিল। তাকে আমি সম্বোধন করে বললাম, 'আমার এক লাখ সংখ্যক সৈন্যদল আবশ্যক।' সে আমার কথা শুনে বললো, 'এক লাখ পাবে না, তবে পাঁচ হাজার সংখ্যক সৈনিক দেয়া হবে।" তখন আমি মনে মনে বললাম,

যদিও পাঁচ হাজার সংখ্যায় স্বল্প, কিন্তু খোদা তা'লা চাইলে অল্প সংখ্যক লোকও বহু সংখ্যক লোকের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। তখন আমি এ আয়াত পাঠ করি, كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ['এমন কত ছোটো ছোটো দল রয়েছে যারা আল্লাহর আদেশে বড়ো বড়ো দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে]

অতঃপর এ কাশ্‌ফে আমায় সেই 'মনসুর'-কে দেখানো হয় এবং বলা হয়: "খুশহাল হ্যায়, খুশহাল হ্যায়।" (সুখী বটে, সুখী।– অনুবাদক)। কিন্তু খোদা তা'লার কোনো গোপন প্রজ্ঞা তাকে চিনতে আমার দৃষ্টিকে অপারগ রাখে। তবে আশা রাখি, অন্য কোনো সময় হয়ত দেখানো হবে। হাদীসটির অবশিষ্টাংশের অনুবাদ হল: "সে হারিস যখন আবির্ভূত হবেন 'আলে রসূল'-কে (এ শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা আগেই বর্ণিত হয়েছে) শক্তি যোগাবেন এবং তাদের সহায় ও আশ্রয়স্বরূপ হবেন অর্থাৎ এমন সময়ে, যখন মু'মিন চরম অসহায় অবস্থায় থাকবে আর ইসলাম ধর্ম অসহায় ব্যক্তির ন্যায় পরিত্যক্ত হবে এবং চতুর্দিক থেকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ শুরু হবে, তখন সে হারিস সর্বশক্তি নিয়ে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে দণ্ডায়মান হবেন। মূর্খদের বাক্যবাণ থেকে মু'মিনদের রক্ষার্থে স্বীয় ঈমানের উদ্দীপনায় ওঠে দাঁড়াবেন, তত্ত্বজ্ঞানের আলো থেকে শক্তি লাভ করে বিরুদ্ধবাদীদের সব আক্রমণ হতে তাদের রক্ষা করবেন ও মু'মিনদের নিজ হেফাজতে গ্রহণ করবেন। তাদের সেরূপ নিরাপত্তা দিবেন, যেরূপ কুরায়শ বংশীয় সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সা.)-কে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ (ইসলাম বিরোধী) শত্রুর সকল অপবাদ, প্রশ্ন ও প্রমাণাদি তলবের সময়ে সকল মু'মিনের জন্য ঢালস্বরূপ হয়ে যাবেন। নবী করীম (সা.)-এর অনুবর্তিতার সুবাদে তিনি তার শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক ও আলী হায়দার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ধারায় ইসলামী কল্যাণধারা ও অবিচলতা প্রদর্শনের সুবাদে মু'মিনদের নিরাপদ অবস্থানে এসে যাওয়ার কারণ হবেন। "প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্যকর্তব্য হবে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা বা তার ডাকে সাড়া দেওয়া ও তাকে মেনে নেওয়া"– হাদীসের এ বাক্যটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, এমন এক মহামর্যাদাপূর্ণ ঐশী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই হারিসের ওপর ন্যস্ত করা হবে, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা জাতির জন্য আবশ্যক হবে। যেমন আমরা 'ফতেহ্ ইসলাম' গ্রন্থে উক্ত ধারার পাঁচটি শাখা সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি।

এস্থলে ইঙ্গিতে একথা বোঝানো হয়েছে, এ 'হারিস' রাজাবাদশাহ ও আমির-ওমারাদের মধ্যকার হবে না, যে নিজে একাই এ ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হবেন। হাদীসটিতে এ রকম জোরালো তাগিদে এ বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই হারিসের আবির্ভাবের সময় যে 'মসীলে মসীহ্' বা মসীহ সদৃশ হওয়ার

দাবিদার হবে মানুষ পরীক্ষায় পড়ে যাবে। তাদের মধ্যে অনেকে বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠবে। তারা সাহায্য সহযোগিতা দিতেও বাধা দেবে বরং চেষ্টা করবে, তার জামা'ত যেন বিভেদের শিকার হয়। একারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পূর্ব থেকে তাগিদ করেন, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য এই হারিসের (যথাযথ) সাহায্য করা বাধ্যতামূলক। এমন যেন না হয় যে তোমরা কারো বিভ্রান্তিতে পড়ে এ মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।"

এক্ষেত্রে খোদা তা'লার মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব সংবাদ প্রদান করেছেন তা একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, তিনি (সা.) বলেছেন, এই হারিসের আবির্ভাবে মু'মিনদের শক্তি লাভ হবে। তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হবে। ময়দানে এসে তার দণ্ডায়মান হওয়ার ফলে বিভক্তির শিকার মুসলিম উম্মতে দৃঢ়তা ফিরে আসবে। সে তাদের জন্য ঢালস্বরূপ হয়ে যাবে তাদের দৃঢ়তা লাভের কারণ হবে যেভাবে সাহাবীরা মক্কায় ইসলামের দৃঢ়তার কারণ হয়েছেন। এটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত দেয় যে, সে তরবারি-কুঠার তথা যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের সুরক্ষায় তৎপর হবে না, আর একাজের জন্য সে প্রেরিতও হবে না। কেননা মক্কায় বসে কুরায়শ বংশীয় মু'মিনগণ মহানবী (সা.)-এর যে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল তাতে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কোন জাতির মানুষ তাদের অংশীদার ছিল না। সেই সাহায্য সহযোগিতা কেবল ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের শক্তি দিয়ে সাধিত সাহায্য সহযোগিতা ছিল। কোনও তরবারি খাপ থেকে বের করা হয় নি আর কোন বর্শাও হাতে নেওয়া হয় নি। বরং দৈহিকভাবে মোকাবিলা করতে তাদের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কেবল ঈমানের শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিতে উজ্জল হাতিয়ার এবং সেসব হাতিয়ারের ঔজ্জ্বল্য যা ধৈর্য, অবিচলতা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ঐশী তত্ত্বোপলব্ধি এবং সুমহান ধর্মীয় নিগূঢ় সত্য তাদের হাতে মওজুদ ছিল। গালিগালাজ শুনতেন। প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হত এবং অন্যান্য সবরকম কষ্ট ও নির্যাতনেরও শিকার হতেন। কিন্তু এমন এক প্রেমের নেশায় তারা বিভোর ও মাতোয়ারা ছিলেন যে, কোন ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কোন কষ্টে ভয় পেতেন না। জাগতিক জীবনোপকরণের দিক দিয়ে সেসময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে কী-বা ছিল। যার আশায় তাঁরা তাদের প্রাণ ও সম্মান কঠিন ঝুঁকি ও সংকটাবলির মুখে ঠেলে দিতেন আর স্বজাতির সঙ্গে বহুদিনের লাভজনক সম্পর্কাবলি ছিন্ন করে ফেলতেন? সেসময় তো হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অভাব অনটন ও কষ্টকাঠিন্যের সম্মুখীন ছিলেন। তাঁর খবরাখবর নেয়ার ও দেখাশেনার কেউ ছিল না এবং ভবিষ্যতের বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখার কোন কারণ ও লক্ষণ ছিল না। কিন্তু তারা সেই নিঃস্ব দরবেশের, [যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন মহামর্যাদাবান

প্রতাপান্বিত সম্রাট (সা.)] এরূপ নাজুক সময়ে পরম বিশ্বস্ততার সাথে, ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর আঁচল ধরেছেন যখন ভবিষ্যতে সম্মান ও মর্যাদা লাভের আশা ছিল সুদূর পরাহত, বরং স্বয়ং এই সংস্কারক মহাপুরুষের কয়েক দিনের মধ্যে প্রাণ যায় যায় অবস্থা ছিল। এমন আশঙ্কাজনক অবস্থা প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওই বিশ্বস্ততার অটুট সম্পর্ক শুধুমাত্র ঈমানী শক্তির উদ্দীপনাবশত ছিল, যে নেশায় তাঁরা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে যান যেভাবে চরম পিপাসার্ত ব্যক্তি অবলীলায় এক স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট প্রস্রবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, অনুরূপভাবে সেই 'হারিস' যখন আসবেন তখন তিনি তরবারি তথা যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা মু'মিনদের সাহায্য প্রদান করবেন না বরং কুরায়শ বংশীয় মু'মিনদের সেই বিশেষ অবস্থা আর সেই বিশেষ ঘটনার ন্যায় যা মক্কায় তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল যখন তাদের সাথে অপরাপর জাতির কেউ ছিল না আর তখন কোন অস্ত্রও ব্যবহার করা হতো না বরং কেবল ঈমানের শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি তাদের কাজে ও কথায় প্রদর্শন করতেন আর এর মাধ্যমেই তারা বিরুদ্ধবাদীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। অনুরূপভাবে, মু'মিনদের নিজ আশ্রয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত পন্থা ও পদ্ধতিটিই সেই 'হারিসে'রও হবে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ঈমানের শক্তি ও ঐশী জ্ঞানতত্ত্বের জ্যোতি ও নিদর্শন দেখিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের নির্বাক করে দেবেন এবং সোচ্চার হৃদয়ে এর প্রভাব বিস্তার করবেন। বস্তুত তাঁর ঈমানের শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিরূপী প্রস্রবণ যেমনটি বীরত্ব, দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা, সত্যবাদিতা ও স্বচ্ছতা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার স্রোতধারায় বয়ে যেতে থাকবে তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়াদির বর্ণনায় আর বিরুদ্ধাবাদীদের সামনে আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিক প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে প্রবহমান থাকবে। এটি সেই প্রস্রবণেরই অনুরূপ হবে যা কুরাইশের পবিত্র পুণ্যাত্মা আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক ও আলী মুর্তজা (রিজওয়ানিল্লাহি আলাইহিম) লাভ করেছিলেন। তাঁদের ঈমানকে ঊর্ধ্বলোকের ফিরিশ্তারাও বিস্ময়ের চোখে দেখতেন। তাঁদের পবিত্র ও স্বচ্ছ তত্ত্বজ্ঞান হতে এত জ্ঞান ও আলো এবং কল্যাণরাজি আর বীরত্ব ও দৃঢ়তার নির্ঝর নির্গত হয়েছিল, যা মানুষের কল্পনাতীত ছিল। অতএব, আমাদের প্রভু ও অভিভাবক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই হারিসও যখন আসবে তখন সে-ও একই ঈমানের ঝর্ণা ও ঐশী জ্ঞানতত্ত্বের উৎসের স্রোত প্রবাহের মাধ্যমে জাতির বৃক্ষরাজিকে সিঞ্চিত করবে। তাদের মলিন ও নির্জীব হৃদয়গুলোকে পুনরায় সজীব করে তুলবে। বিরুদ্ধবাদীদের সকল অযৌক্তিক অভিযোগ ও অপবাদকে তার সত্যতার পদতলে পিষ্ট করবে। তখন ইসলাম পুনরায় স্বীয় মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন

করবে। নির্লজ্জ শূকর হত্যা করা হবে। মু'মিনরা সেই সম্মানের আসন লাভ করবে যা তাদের প্রাপ্য। মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এটাই, যা এখানে আমি তুলে ধরেছি। এদিকেই বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ নিম্নরূপ এলহাম (ঐশীবাণী) ইঙ্গিত করে:

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمد یاں بر منار بلند تر محکم افتاد

[অর্থাৎ আনন্দিত হও, তোমার সময় সন্নিকট। মুসলমানদের পদ উচ্চতর মিনারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'– অনুবাদক)]। এরই দিকে সেই এলহামও ইঙ্গিত করে যা এ অধমের স্বপক্ষে ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসের বরাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ এলহাম হয়। এটি বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লিখিত আছে আর তা হলো:

لو کان الإیمان معلقًا بالثریا لنالہ رجل من فارس إنّ الذین کفروا وصدّوا عن سبیل اللّٰہ ردّ علیھم رجل من فارس شکر اللّٰہ سعیہ خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس۔

(অর্থ: 'ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলীতেও চলে যায় তবুও পারশ্য বংশোদ্‌ভূত এক ব্যক্তি তা পুনরুদ্ধার করবে। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, পারস্য বংশীয় এই ব্যক্তি তাদের সব আপত্তি ও সন্দেহ-সংশয় খণ্ডন করেছে। আল্লাহ্ তার এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি তাঁর গুণগ্রাহী। হে পারস্য বংশোদ্‌ভূতরা! তোমরা তওহীদকে আঁকড়ে ধরো, তওহীদকে ধারণ করো।'– অনুবাদক)

এ এলহামটিতে সুস্পষ্টত বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই পারস্য বংশোদ্‌ভূত ব্যক্তি যার অপর নাম হলো 'হারিস', তার বড়ো বিশেষত্ব হলো তার ঈমান অত্যন্ত দৃঢ়। ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে থাকলেও (আল্লাহ্ প্রেরিত) এই মহাপুরুষ সেখান থেকেই তা পুনরুদ্ধার করতেন। খোদা তার গুণগ্রাহী যে তিনি ইসলাম ধর্মের অস্বীকারকারীদের সমস্ত আপত্তি অপবাদ ও সন্দেহ-সংশয় খণ্ডন করে 'হুজ্জত' বা যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের কাজ পূর্ণ করেছেন। তওহীদকে আকড়ে ধর তওহীদকে আকড়ে ধর, হে পারস্য বংশোদ্‌ভূত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ তওহীদের পথসমূহ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ কর এবং একত্ববাদ শিখাও। যে একত্ববাদ পৃথিবী থেকে পতনোন্মুখ ও হারিয়ে যাচ্ছে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। এটিই সবচেয়ে অগ্রগণ্য। এটি মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। এস্থলে 'ইবন' (অর্থাৎ পুত্র) শব্দের পরিবর্তে 'আব্‌না' (অর্থাৎ পুত্রগণ) শব্দটি অবলম্বন করা হয়েছে। অথচ সম্বোধিত কেবল এক ব্যক্তি অর্থাৎ এই অধম। এটি হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মানসূচক। যেমন, কোন কোন হাদীসে رجال من فارس -لو کان الإیمانُ مُعلَّقًا بالثُّریَّا لنالہ رجلٌ من فارسٍ এর পরিবর্তে রয়েছে

(অর্থাৎ পারস্য বংশোদ্ভূত পুরুষগণ)। তা সত্যিকার অর্থে অনুরূপ সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে। বাস্তবে প্রত্যেক জায়গায় 'রাজুলুন' (অর্থাৎ একজন ব্যক্তি)-কেই বোঝানো হয়েছে। এ পুরো গবেষণা থেকে জানা গেল, হারিস সম্পর্কে হাদীসসমূহে অতি উত্তম এ চিহ্নটিই রয়েছে যে, তিনি ঈমানী আদর্শ নিয়ে দুনিয়ায় আসবেন এবং স্বীয় ঈমানী শক্তির শাখাপ্রশাখা এবং সুফলসমূহ প্রকাশ ও প্রদর্শনে দুর্বলদের শক্তি যোগাবেন ও তাদের অবলম্বন হবেন আর স্বীয় সত্যতার আলোকরশ্মি দ্বারা অন্ধকারপ্রিয় বিরুদ্ধবাদীদের চোখ বিস্ফারিত করে দিবেন। কিন্তু মু'মিনদের জন্য চোখের জ্যোতি, স্নিগ্ধতা ও হৃদয়ের প্রশান্তির আদলে শান্তি, স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভের কারণ হবেন। আর বিশ্বাসসংক্রান্ত জ্ঞানতত্ত্বের শিক্ষক হয়ে বিশ্বাস ও ঈমানের আলো জাতির মাঝে ছড়াবেন। আমি 'ফতেহ ইসলাম' পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি, প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ (আ.)-ও একজন ঈমান সম্পর্কিত সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন এবং ঈমানী ও আধ্যাত্মিক আলো দানকারী ছিলেন। আর এটিও প্রকাশ করে এসেছি যে, আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ও জাগতিক যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যে আসবেন না। বরং বুখারী তার লক্ষণ লিখেছে: يضع الحرب (অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন– অনুবাদক)। আর এ-ও যে, 'কাফের নিধন হবে তাঁর নিঃশ্বাস দ্বারা, তরবারি দ্বারা নয়' অর্থাৎ যুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রমাণপুষ্ট কথা দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে (কাফের) হত্যা করবেন।

অতএব, মসীহ্ ও হারিস উভয়ের উক্ত চিহ্ন দুটির অংশীদার হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, হারিস ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি। আর এটি হলো প্রতিশ্রুত হারিসের প্রথম চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য যা আমি বর্ণনা করে এসেছি। অর্থাৎ এই যে, তিনি তরবারি বা বর্শা দ্বারা নয়, বরং স্বীয় ঈমানের শক্তি ও স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি দ্বারা তাঁর জাতিকে শক্তি যোগাবেন যেমন 'কুরায়শ' অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও আলী হায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মক্কার অন্যান্য মু'মিনগণ অবিচল দৃঢ়তার গুণাবলির মাধ্যমেই পবিত্র মক্কা নগরীতে আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্মের ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন।

উল্লিখিত প্রথম চিহ্নটির প্রমাণ এ অধমের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ওপর প্রতিভাত হবে অর্থাৎ এ অধম এই ঈমানী শক্তির উদ্দীপনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের সর্বব্যাপী তবলীগের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলাম প্রচারের মানসে প্রায় বার হাজার ইশতেহার (বা প্রচারপত্র) রেজিস্ট্রি যোগে বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় প্রধান, আমীর-উমারা ও দেশের কর্ণধারদের নামে প্রেরণ করে। এমনকি রেজিস্ট্রিডাকে একটি বিজ্ঞাপনপত্রসহ বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজের বরাবরেও পাঠায় এবং বৃটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী গ্লেড স্টোনের নামেও উক্ত বিজ্ঞাপনসহ পত্র পাঠানো

হয়। তেমনিভাবে (জার্মান) যুবরাজ বিস্‌মার্কের নামে এবং বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত শাসকবর্গের বরাবর উক্ত ইশতেহার ও পত্রাবলি রেজিস্ট্রিডাকে পাঠানো হয়, যে সংক্রান্ত কাগজপত্রে একটি সিন্দুক পরিপূর্ণ। এটি স্পষ্ট যে, এহেন কর্মকাণ্ড (আল্লাহ্ প্রদত্ত) 'ঈমানী শক্তি ব্যতিরেকে সাধিত হতে পারে না। এ কথাটি আত্মপ্রশংসারূপে নয়, বরং সত্য তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র, যাতে সত্যান্বেষীদের কাছে কোন কথা অস্পষ্ট না থাকে। তাছাড়া অদৃশ্য সমর্থনের আদলে অলৌকিকভাবে যে ঈমানী শক্তির জ্যোতি প্রকাশ পায় এবং যা খোদা তা'লার অনুগ্রহ, দয়া ও নৈকট্যের স্বাক্ষর বহন করে, সেবিষয়ে ঐসব প্রচারপত্রে লেখা হয়েছে। ঈমানী শক্তির যেসব জ্যোতি (এ অধমের মাধ্যমে) প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলোর সম্পর্কেও উক্ত ইশতেহারে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। বিরোধী কোন ধর্মাবলম্বী কখনো উক্ত মর্যাদার অধিকারী হয় নি যা 'ঈমানী শক্তি'র ফলে ও 'সিরাতে মুস্তাকীমে' দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে এ অধমকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে। যদি হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ানো উচিত এবং নিজের আধ্যাত্মিক আশিষের এই অধমের সাথে তুলনা করা উচিত যা স্বধর্মের অনুসরণে তার লাভ হয়ে থাকবে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ালো না। প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ও তুচ্ছ মানবের সামর্থ্য নেই যে সে কেবল তার ধূর্ততা ও দুষ্টামিপ্রসূত পরিকল্পনা বা বিদ্বেষমূলক হঠকারিতায় সেই জামা'তের মুখোমুখি হতে পারে যাকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি সত্যিই বলছি, যদি কেউ এই সিলসিলার বিরোধিতায় ঐশী কল্যাণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, তবে তাকে চরম লাঞ্ছনার সাথে ধরাসায়ী করা হবে। কেননা এই কর্মকাণ্ড ও এ জামা'ত মানুষের হাতে সূচিত হয় নি বরং সেই পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী সত্তার পক্ষ থেকে যার হাত এই গ্রহ-নক্ষত্র খচিত করে আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছে এবং ভূমিকে এর অধিবাসীদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন। আক্ষেপ, আমাদের জাতির মৌলবী ও উলামা এমনিতে কাফির আখ্যা দেয়ার জন্য তড়িঘড়ি কাগজ ও দোয়াত-কলম নিয়ে বসে যায় কিন্তু একটু চিন্তা করেন না, মিথ্যার মাঝে সারা বিশ্বকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার মতো ত্রাশ ও প্রতাপ থাকে কি (আবার বলবে যে) কেউ সামনে আসতে সক্ষম হবে না? কেউ কি মিথ্যাবাদীদের মাঝেও এমন বীরত্ব ও অবিচলতা প্রত্যক্ষ করেছেন, যা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সামানে এ স্থলে প্রদর্শিত হয়েছে?

যদি তাদের কারও সন্দেহ থাকে তাহলে ইসলামবিরোধীদের যতজন শীর্ষনেতা, বক্তা ও শিক্ষক রয়েছে, তাদের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিক এবং নিজেদের বিকৃত ধ্যানধারণার মাধ্যমে তাদের মদদপুষ্ট করে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দাঁড় করাক আর তারপর দেখুক খোদা তা'লা আমাকে সমর্থন করেন কি-না। তারপর

দেখুক, খোদা তা'লা আমার সহায় হন কি-না। হে নিষ্প্রাণ মৌলবীগণ! আর বেদা'তক্লিষ্ট সুফি-সাধকগণ! তোমাদের জন্য আক্ষেপ কেননা তোমাদের দৃষ্টিশক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি হওয়া তো দূরের কথা, বরং সমান সমানও দেখতে অক্ষম। الآيات بعد المأتين হাদীস নিজেরাই শোনাও এবং বলে থাক, বারোশ হিজরির পর প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবসহ (আখেরি যুগের) লক্ষণাবলি প্রকাশিত হওয়া জরুরী। শুধু তাই নয়, বরং আপনাদের মাঝে সে সকল মৌলবী-মাওলানা আছেন, যাঁরা শর্তরেখে বইপুস্তক লিখে ছেপেও দিয়েছেন যে, চৌদ্দ শতাব্দির প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন খোদা তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুত নিদর্শনাবলি প্রকাশ করলেন, তখন সর্বপ্রথম আপনারাই অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হলেন!

আর ঈমানী শক্তির বৈশিষ্টাবলির মাঝে যা এ অধমকে দান করা হয়েছে সেগুলোর একটি হলো দোয়া গৃহীত হওয়াসংক্রান্ত। এ অধমের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে, যেবিষয় এ অধমের দোয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হবে সেটি অন্য কোনো উপায়ে গৃহীত হবে না। এ অধমের মাধ্যমে যে-দ্বার উন্মুক্ত করা হয় সেটি অন্য কিছুর মাধ্যমে রুদ্ধ হতে পারে না। তবে এই গ্রহণীয়তার প্রভাব কেবল সেসব লোকের ওপর স্বীয় প্রভাব ফেলবে যারা পরম পর্যায়ের বন্ধু বা চরম পর্যায়ের শত্রু হয়ে থাকবে। যে-ব্যক্তি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আমাদের কাছে ফিরে ফিরে আসে এমন আন্তরিকতার সাথে যাতে কোনো ত্রুটি লুকিয়ে নেই এবং যা কুধারণা ও কুবিশ্বাসে পর্যবসিত হয় না আর যার ভেতর কোন প্রচ্ছন্ন কপটতার বিষ নিহিত নেই, সেরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে এই সকল বরকত ও আশিস প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এগুলোর ভাগী হতে পারবে এবং নিঃসন্দেহে সে নিজের সামর্থ্য অনুসারে এ প্রস্রবণকে সনাক্ত করবে। কিন্তু যেব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে অন্বেষণ করবে না সে নিজেরই ভুলের কারণে বঞ্চিত থাকবে এবং অপরিচিত মানুষের মতো আচরণের ফলে 'আপন' হতে পারবে না। ঈমানী শক্তির আরেকটি সুফল হলো, ঐশী সত্য রহস্যাবলি ও ধর্মীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের রত্ন-ভাণ্ডার খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এ অধমকে দান করা হয়েছে। অতএব যেব্যক্তি এ অধম প্রণীত বইপুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন, অথবা এ অধমের সাহচর্যে থাকবেন তাঁর ওপর এ সত্য আপনা আপনি প্রতিভাত হবে যে, খোদা তা'লা এ অধমকে কী পরিমাণ প্রকৃত ধর্মীয় সূক্ষ্মগূঢ়তত্ত্ব বিশেষভাবে দান করেছেন! দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিহ্ন হলো বুখারী বা সমরকন্দী (তথা পারস্য) বংশোদ্‌ভূত হওয়া এবং জমিদার ও বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সদস্য হওয়া– এ দুটি বৈশিষ্ট্য দৃশ্যত ও স্পষ্টত এ অধমের মাঝে সপ্রমাণিত। এস্থলে আমি নিজের পূর্বপুরুষের ইতিহাস জীবন বৃত্তান্ত কিছুটা সংক্ষেপে তুলে ধরা যথাযথ ও সমীচীন বলে মনে করি। অতএব প্রথমে এ বিষয়টি

ব্যক্ত করতে চাই যে, প্রায় বিশ বছর পূর্বে মি: গ্রিফিন নামের একজন ইংরেজ যিনি এ জেলা (অর্থাৎ গুরুদাসপুরেরর) ডেপুটি কমিশনার এবং ভূপাল ও রাজপুতানার এস্টেটগুলোর রেজিডেন্ট পদমর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিও পাঞ্জাবের চীফ্ বা রইসদের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসের আদলে প্রণয়ন করে প্রকাশ করেছিলেন। সেটিতে তিনি পরলোকগত আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের বিষয়ে উল্লেখ করে কিছুটা সংক্ষেপে লিখেছেন যে, তিনি সমরকন্দী বংশোদ্ভূত এবং জমিদার পরিবারের সদস্য ছিলেন। কিন্তু আমি এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ঐ বিষয়গুলো বিশদভাবে লিখতে চাই, যা হবে মহানবীর এই হাদীসের সার্বিক ব্যাখ্যার সত্যায়ন স্বরূপ। যেন এ অধমের গোড়া থেকেই সমরকন্দী বংশদ্ভূত হওয়া এবং পূর্বকাল থেকে এ পরিবারটির একটি জমিদার পরিবার হওয়ার বিষয়টি মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যায় যেমন কিনা হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীসটির অভিপ্রেত। বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, এ পরিবারের মুরব্বী ও জ্যেষ্ঠদের রেখে যাওয়া প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবরের সময়ে 'ঐশী কৃপাপ্রার্থী' এই অধমের সম্মানিত পূর্বপুরুষরা (পারস্যের অন্তর্ভুক্ত) সমরকন্দ থেকে কোন অজানা কারণে এক বড়ো জনগোষ্ঠীসহ হিজরত করে দিল্লী আগমন করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না যে, তারা বাবরের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছেন নাকি তার অব্যবহিত পরেই এ দেশে আগমন করেন। কিন্তু বাবরের সঙ্গে এসে থাকুন বা কিছুকাল পরে অধিকাংশ কাগজপত্র পর্যালোচনা করে একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এ 'শাহী' পরিবারের সাথে তাদের এমন কোন (বিশেষ) সম্বন্ধ ছিল যার ফলে তারা এই সরকারের দৃষ্টিতে সম্মানিত বিশিষ্ট প্রধানদের মধ্যে গণ্য হতেন। যেমন সমসাময়িক সম্রাটের কাছ থেকে তাঁরা পাঞ্জাবে বহু সংখ্যক গ্রাম জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন এবং তাদের একটি বড়ো জমিদারীর তালুকদার বা ভূস্বামী বানানো হয়। এ গ্রামগুলোর মাঝামাঝি একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা নিজ বসবাসের জন্য দুর্গস্বরূপ একটি বসতি স্থাপন করেন। এর নাম "ইসলামপুর ক্বাজি মাঝি' রাখেন। সেই ইসলামপুরই এখন 'কাদিয়ান' নামে সুখ্যাত। এ জনবসতিটির চারদিকে একটি প্রাচীর ছিল যার উচ্চতা ছিল প্রায় বিশ ফিট। এটি এতো প্রশস্ত ছিল যে, তিনটি গরু-গাড়ি পাশাপাশি একসঙ্গে চলাচল করতে পারত। চারটি বড়ো 'বুর্জ' (মিনার) ছিল। এগুলোতে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী অবস্থান করত। এ জায়গাটির নাম 'ইসলামপুর ক্বাজী মাঝি' হওয়ার কারণ ছিল, শুরুতে দিল্লীর সম্রাটদের পক্ষ থেকে এ গোটা অঞ্চলের শাসনের দায়িত্বভার আমাদের

জ্যৈষ্ঠদের প্রদান করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ অর্থাৎ প্রজাদের মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দায়িত্ব তাঁদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছিল। আর এই শাসনব্যবস্থা ততদিন প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় ছিল যতদিন পাঞ্জাব প্রদেশ দিল্লীর রাজ সিংহাসনকে রাজস্ব প্রদান করত। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে মুঘল রাজত্বে আলস্য ও দুর্বলতা, বিলাসিতা ও অযোগ্যতার কারণে সিংহাসনে আসীনদের মাঝে বহু রকম ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা দেখা দেয়। ফলে শাসনাধীন বহু প্রদেশ হাতছাড়া হয়ে যায়। সেদিনগুলোতেই পাঞ্জাবের বৃহাদাংশ মুঘল শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদেশটি এমন এক বিধবার ন্যায় হয়ে গেল যার কোন অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক নেই। খোদা তা'লার কুদরতের লীলাখেলা যে, তিনি শিখ জাতির উন্নতি দিতে চাইলেন যারা নিছক অশিষ্ট-উশৃঙ্খল কৃষিজীবী এক জনগোষ্ঠী ছিল। তাদের উত্থান ও পতনের দুইটি যুগ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে তাদের কেচ্ছাও অলীক স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। মোটকথা সে সময়ে যখন মুঘল রাজত্ব নিজ অযোগ্যতা ও অব্যবস্থার কারণে পাঞ্জাবের এ অংশটি থেকে সম্পূর্ণভাবে হাত গুটিয়ে নিল তখন এ অঞ্চলের বড়ো বড়ো জমিদার স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদায় নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হলো। অতএব সে যুগেই ঐশী কৃপায় এ অধমের প্রপিতামহ মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব, ভূস্বামী হিসেবে স্বীয় জমিদারীর একজন সার্বভৌম ও স্বাধীন রইস, অরাজক অবস্থার মাঝে নিজ দখলে রয়ে যাওয়া শুধু চুরাশি কি পঁচাশিটি গ্রাম সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আর নিজের স্বাধীন স্টেটে পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা জারি করেন। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বড়ো সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাঁর গোটা জীবন এমতাবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, তিনি অন্য কোন রাজা-বাদশার অধীনে ছিলেন না আর কাউকে করও দিতেন না। বরং তাঁর স্টেটে তিনি একজন পূর্ণ স্বাধীন শাসক ছিলেন। তাঁর প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছিল। তিনটি তোপও ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-উলামার মধ্যকার তিন-চারশ লোক তাঁর দরবারী ও মোসাহেব ছিলেন। প্রায় পাঁচশ জন কুরআন করীমের হাফেজ ছিলেন, যারা নিয়মিত ভাতা পেতেন এবং কাদিয়ানেই বসবাস করতেন। সকল মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে নামায, রোযা পালনের কড়া তাগিদ ছিল। শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন রকম কাজ তাঁর সীমানার মাঝে প্রচলিত হতে দিতেন না। মুসলমান হয়েও কেউ যদি ইসলামের রীতিনীতি বিরোধী পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে অভ্যস্ত হত তাহলে তাকে কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হত। রুগ্ন ও গরিব-মিসকিনদের দেখাশুনা ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নগদ ও পণ্যাকারে এক পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি বরাদ্দ থাকত যা বিভিন্ন সময়ে তাদের মাঝে বিতরণ করা হত। এ হলো সেই সময়কার রেকর্ড-পত্রে লিখিত বর্ণনাসমূহের

সারসংক্ষেপ, যা আমাদের হস্তগত হয়েছে। যা সম্পর্কে পরম্পরাগতভাবেও মৌখিক সাক্ষ্য অদ্যাবধি শুনতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এ-ও লেখা আছে যে, ঐ সময়ে মুঘল রাজত্বের গিয়াসুদ্-দৌলা নামের একজন মন্ত্রী কাদিয়ান আসেন এবং মরহুম মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেবের ধৈর্য-স্থৈর্য, সুশাসনব্যবস্থা, তাক্ওয়া, পবিত্র জীবনধারা, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা দেখে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, 'আমি যদি আগে জানতে পারতাম, মুঘল পরিবারের এমন একজন পুরুষ পাঞ্জাবের একটি কোণায় মওজুদ রয়েছেন, তাহলে আমি মুঘল পরিবারটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মানসে তাকেই দিল্লীর সিংহাসনারোহী করার চেষ্টা করতাম।

মোটকথা, মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব মরহুম একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী সুপুরুষ, খোদাভীরু ও পরম বিচক্ষণ এবং প্রথম সারির বীরপুরুষ ছিলেন। যদি সে সময় ঐশী সিদ্ধান্ত মুসলমানদের বিপক্ষে না হতো, তাহলে পরম আশা ছিল, এরূপ অকুতভয় দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তি শিখদের চরম নৈরাজ্য থেকে পাঞ্জাবকে মুক্ত করে ইসলামের বিশাল একটি রাষ্ট্র এদেশে কায়েম করতে পারতেন। যেভাবে রণজিৎ সিং তার পৈত্রিক সূত্রে মাত্র নয়টি গ্রাম পেয়েছিলেন– এমন অল্প পরিমাণ সম্পত্তি সত্ত্বেও তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন যে, পেশোয়ার থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত কেবল 'খালসা' আর 'খালসা'ই চোখে পড়ত, আর সর্বত্র পঙ্গপালের ন্যায় শিখদের জঙ্গীবাহিনী পরিদৃষ্ট হত। কাজেই এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তির (অর্থাৎ মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের) পক্ষে ঐসব বিজয় লাভ করা ধারণাতীত হতে পারে কী? যার হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তখনও চুরাশি বা পঁচাশিটি গ্রাম অবশিষ্ট ছিল এবং তাঁর প্রায় এক হাজার সেনাবাহিনী ছিল। অধিকন্তু তিনি নিজেও ব্যাক্তিগত বীরত্বের জন্য এমন সুখ্যাত ছিলেন যে, সমসাময়িক সাক্ষ্যসমূহের মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ দেশে তাঁর কোন নজির বা দৃষ্টান্ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু মুসলমানদেরকে তাদের সীমাহীন ঔদাসীন্যের কারণে সতর্ক করতে চেয়েছেন, সে কারণে মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব এ দেশে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিকে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারেন নি। মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের জীবনের বিস্ময়কর ঘটনা ও অবস্থাবলির মধ্যকার একটি হলো, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও তাঁর ওলী হওয়াতে বিশ্বাস করত আর তার কিছু অলৌকিক বিষয় জনমনে গেঁথে গিয়েছিল। এমনটি অত্যন্ত বিরলই ঘটে যে, কোনো ভিন্নধর্মী লোক তার শত্রুর কেরামতের স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু এই লেখক মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের কতক অলৌকিক ঘটনা এমনসব শিখদের মুখে শুনেছে যাদের পিতাপিতামহ বিপক্ষ দলের হয়ে যুদ্ধ করত। অধিকাংশ লোকের বর্ণনা বা সাক্ষ্য হলো, প্রায়শ মরহুম মির্যা সাহেব একা হাজার হাজার মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রণাঙ্গণে

অবতীর্ণ হয়ে সবার ওপর বিজয়ী হতেন। শত্রু বাহিনী তোপ বা বন্দুকের গোলা বা গুলি দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে প্রাণপন চেষ্টা করলেও তাঁর ধারেকাছে ভিড়ারও কার সাধ্য ছিল না। কিন্তু কোন গুলি বা গোলা তার ওপর কার্যকর হত না। তাঁর এই নিদর্শনের কথা অসংখ্য শত্রু-মিত্র শিখের মুখে শোনা গেছে যারা এরকম যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী পিতাপিতামহ থেকে বিশ্বস্তসূত্রে শুনে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা বিস্মিত হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়। সামরিক বাহিনীতে চাকরিকালে অনেক মানুষ জীবনের বৃহদাংশ যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়ে থাকেন এবং ঐশী শক্তির অধীনে কখনো তরবারি বা বন্দুকের হাল্কা কোন আঘাত বা জখমও তাদের স্পর্শ করে না। অতএব এই কেরামত যদি যৌক্তিকভাবে বর্ণনা করা যায় যে, খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপায় শত্রুদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করতে থাকেন তাহলে এটি কোন আপত্তির বিষয় নয়। এতে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকতে পারে না যে, মরহুম মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব দিবসে একজন প্রতাপান্বিত বীর পুরুষ এবং নিশিতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী সাধক ছিলেন। এক কথায় তিনি সার্বক্ষণিক সাধনায় নিয়োজিত ও শরীয়তের বিধিবিধানে পরিচালিত ছিলেন। তখনকার যুগে কাদিয়ানে ইসলামের এমন এক জ্যোতি উদ্ভাসিত ছিল যে, আশপাশের মুসলমান এ জনবসতিটিকে মক্কা বলে অভিহিত করত। কিন্তু মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের তিরোধানের পর অধমের দাদা মির্যা আতা মোহাম্মদ সাহেবের আমলে সহসা একটি মারাত্মক বিপ্লব মাথাচাড়া দেয়। বিরোধিতা করার পর যেসব জঙ্গী শিখ নিছক কপটতাবসত সমঝোতা ও সন্ধি সম্পাদন করল, তাদের বেঈমানী, বজ্জাতি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে সেই পরিবারের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদাবলি আপতিত হলো। কাদিয়ান এবং কয়েকটি গ্রাম ছাড়া সবই তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। পরিশেষে শিখরা কাদিয়ানও দখল করে নিল এবং মরহুম দাদা সাহেবকে পরিবার-পরিজনসহ দেশান্তরিত করা হলো। সেদিন শিখরা প্রায় পাঁচশ' কপি কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দিল। বহু মূল্যবান বইপুস্তক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল। মসজিদগুলোর মধ্যে কয়েকটি তারা বিধ্বস্ত করল। কিছু মসজিদকে তারা তাদের বাসগৃহ বানাল। সেগুলো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ঐ নৈরাজ্যের সময় যতজন জ্ঞানীগুণী, আলেম-উলামা ও সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গ কাদিয়ানে বাস করতেন, তারা সবাই বের হয়ে যান এবং বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এ জায়গাটি ঐসব দৃষ্কৃতকারী ও ইয়াযিদী স্বভাবসম্পন্ন লোকে ভরে গেল, যাদের ধ্যানধারণা ও মন-মানসিকতায় দুষ্কর্ম ও পাপাচার বৈ আর কিছু ছিল না। এরপর বৃটিশ রাজত্বের কিছুকাল পূর্বে, অর্থাৎ সেই সময় যখন পাঞ্জাবে মহারাজা রঞ্জিৎ সিং-এর একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ অধমের শ্রদ্ধেয় পিতা

অর্থাৎ মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব কাদিয়ানে ফিরে এসে বসবাসকরা আরম্ভ করেন। তারপরও শিখদের অত্যাচার-নির্যাতন ও হুলফোটানো অব্যাহত থাকে। ঐ যুগে আমরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) এত অপমানিত ও অপদস্ত ছিলাম যে, দেড়-দুই টাকায় কেনা যায় এমন একটা বাছুরকে আমাদের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি সম্মানের চোখে দেখা হত। আর এ পশুটাকে সামান্য আঁচড় দেয়ার অজুহাত ধরে মানব হত্যা বৈধ মনে করা হত। শত শত নিরপরাধ মানুষকে কেবল এ সন্দেহে হত্যা করা হত যে, তারা কিনা এ পশুটিকে জবাই করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। জানা কথা যে, পশুহত্যার কারণে যে রাষ্ট্র মানুষ হত্যাকে নিজেদের অবশ্যকর্তব্য বলে জ্ঞান করত এমন রাষ্ট্র খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দীর্ঘকালব্যাপী অবকাশ ও অব্যাহতি পাওয়ার কখনো যোগ্য হতে পারত না। কাজেই খোদা তা'লা এই ভীতিকর অবস্থাকে মুসলমানদের ওপর থেকে অতি শীঘ্র তুলে নিলেন এবং রহমতবারির ন্যায় একটি সরকার আমাদের জন্য বহু দূর-দূরান্ত থেকে আনয়ন করলেন। আর সেই গ্লানি ও তিক্ততা, যা শিখদের যুগে আমরা বয়ে ও সয়ে আসছিলাম, বৃটিশ সরকারের শাসনাধীন আসায় আমরা তা ভুলতে পেরেছি। তাই আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা যেন এই আশিষমণ্ডিত সরকারের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকি। ইংরেজ শাসনামলে শ্রদ্ধেয় পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব তালুকদারী বা ভূস্বত্বের তিনটি গ্রাম এবং পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে কাদিয়ানের মালিকানা স্বত্ব ফিরে পান, যা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। এটি (পবিত্র হাদীস বর্ণিত) 'হাররাস (তথা বিশিষ্ট জমিদার') শব্দটির সত্যায়নস্থল ও সত্যায়নকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমার মরহুম পিতা এ দেশের বিশিষ্ট জমিদারদের মাঝে গণ্য হতেন। গভর্নরের দরবারে তাকে চেয়ার দেয়া হত। আর বৃটিশ সরকারের প্রতি তিনি সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞ ও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের দিনগুলোতে তিনি পঞ্চাশটি ঘোড়া নিজ অর্থে ক্রয় করে এবং দক্ষ (চালক হিসেবে) শক্তিশালী ও সুঠাম যুবক সংগ্রহ করে সরকারকে সাহায্যস্বরূপ দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি এ সরকারের সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ তাঁর মনস্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতেন। প্রয়াশ কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার সাহেব তাঁর বাসভবনে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এসব বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ পরিবার একটি সম্মানিত জমিদার পরিবার, যারা অতীতের বাদশাহদের আমল থেকে অদ্যাবধি উল্লিখিত আভিজাত্যের স্বাক্ষর বহণ করে আসছে।

فالحمد لله الذى أثبت هذه العلامة إثباتًا بينا واضحًا من عنده (অর্থ: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি উল্লিখিত চিহ্নটি নিজ পক্ষ থেকে অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। – অনুবাদক)।

আর চতুর্থ ও পঞ্চম লক্ষণটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, বরং এগুলো স্বয়ং স্বতঃস্পষ্ট। কাদিয়ানকে খোদা তা'লা যে দামেস্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং নিজ এলহামী বাণীতে এ-ও বলেছেন: أُخرِجَ منه اليزيديون [এখানে এযিদী স্বভাবের লোকদের উদ্ভব ঘটান হয়েছে।"–অনুবাদক] তা ঐসব নাস্তিক ও দুষ্টলোকদের কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে যারা এ শহরে বাস করে। এ শহরটির বেশিরভাগই ঐসব লোকে পরিপূর্ণ যাদের মৃত্যুর কথাও স্মরণ নেই। তারা রাতদিন কেবল পার্থিব চিন্তা ও প্রতারণায় লিপ্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি অন্তরায় না হত, তাহলে এদের অন্তর সব ধরনের অপরাধ করতে উদ্যত কেবল কিছু লোক ব্যতীত। এদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা খোদার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং কোন (নিষিদ্ধ) বিষয়কে তারা হারাম (নিষিদ্ধ) বলে মনে করে না। তাদের যে চিন্তাধারা আমি লক্ষ করি তদনুসারে ব্যাভিচার থেকে শুরু করে অবৈধ হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত তাদের দৃষ্টিতে সুযোগ সাপেক্ষে কেবল বৈধই নয়, বরং এ ধরণের কাজ প্রশংসনীয়। আমি এদের দৃষ্টিতে সম্ভবত পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট। কিন্তু এজন্য আমার কোন আক্ষেপ নেই, আমার আধ্যাত্মিক ভ্রাতা মসীহ্‌র বাক্য: 'নবী কেবল তাঁর জন্মস্থানেই অপদস্ত হয়ে থাকেন– আমার মনে পড়ে।' সত্যিই বলছি, এ লোকগুলো যদি ইমাম হুসাঈন (রা.)-এর সময়ে হত, তাহলে আমার ধারণা, ইয়াযিদ ও শিমারের চেয়েও (নিষ্ঠুরতায়) তারা এগিয়ে যেত। মসীহ্‌র যুগ পেলে তাদের চক্রান্তের সামনে ইহুদা ইস্ক্রিউতিকেও হার মানতে হত। খোদা তা'লা যে ইয়াযিদের সাথে এদের তুলনা করেছেন, এমনটি তিনি বিনা কারণে করেন নি। বরং তিনি এদের অন্তঃকরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সরল নয়। এদের চালচলন লক্ষ করেছেন যা সঠিক নয়; তখন তিনি আমাকে (এলহাম যোগে) জানিয়েছেন, এ লোকগুলো ইয়াযিদি স্বভাব বিশিষ্ট এবং এ শহরটি (তথা কাদিয়ান) দামেস্ক সদৃশ। অতএব, খোদা তা'লা অতি গুরুত্ববহ এক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই 'দামেস্কে' এ অধমকে অবতীর্ণ করেছেন।

بطرف شرقی عند المنارة البيضاء من المسجد الذی من دخله كان آمناً فتبارك الذی أنزلنی فی هذا المقام والسلام علی رسوله أفضل الرّسل وخير الانام-منه

[অর্থ: 'সেই মসজিদের পূর্বদিকে শুভ্র মিনারার কাছে অবতীর্ণ করেছেন যে মসজিদটিতে যেব্যক্তিই প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রাপ্ত হবে। অতএব কল্যাণময় তিনি, যিনি আমাকে এই স্থানে অবতীর্ণ করেছেন। আর শান্তি বর্ষিত হোক সেই রসূলের ওপর, যিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও সর্বোৎকৃষ্ট মান।' – অনুবাদক]।– গ্রন্থকার

ষষ্ঠ টীকা

এ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন নওয়াস বিন-সামআন। অন্য কেউ এটি বর্ণনা করে নি। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ হাদীসটির সম্পর্কে মনে করা হয় যে, সাহাবীদের এ সম্পর্কে 'ইজমা' ছিল কিন্তু অচিরেই স্পষ্ট হবে যে, এটি অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থি।– গ্রন্থকার

সপ্তম টীকা

দীর্ঘদিন বলতে দুঃখকষ্টের দিনকেও বুঝায়। কোন কোন বিপদ এত বেদনাদায়ক হয়ে থাকে যে, এক একটি দিন বছরের সমান বলে মনে হয়। কোন কোন বিপদ বা কষ্ট এমন হয়ে থাকে যে, একটি দিন একটি মাসের সমান বলে মনে হয়। আবার কোন সময় বিপদসংকুল একটি দিন এক সপ্তাহের সমান দীর্ঘ বলে প্রতীয়মান হয়। এরপর ধীরে ধীরে ধৈর্যের উন্মেষ ঘটায় সে দীর্ঘদিনগুলোই সাধারণ দিনের মতো মনে হতে আরম্ভ করে। ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অবশেষে এগুলোকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। মোটকথা, এটি একটি রূপক বর্ণনা। এ সম্পর্কে চিন্তা করুন, প্রকৃতপক্ষে এসব দীর্ঘ দিন (সেভাবেই রূপক) যেমনটি তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমার স্ত্রীদের মাঝে প্রথমে তিনি মারা যাবেন যাঁর হাত হবে লম্বা।– গ্রন্থকার

অষ্টম টীকা

'মানুষ আমাকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে মনে করে'– ইবনে সাইয়্যাদের উক্ত বর্ণনাটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, সকল সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে মনে করতেন, অন্য কোন রকম দাজ্জাল বলে নয়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর এ বিষয়েই 'ইজমা' তথা সর্ববাদিসম্মত ঐকমত্য ছিল যে, ইবনে সাইয়্যাদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল।– গ্রন্থকার

নবম টীকা

কুরআন করীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে যে জায়গায় 'তাওয়াফ্ফি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সর্বত্রই 'তাওয়াফ্ফি'-এর অর্থ কেবল মৃত্যুই করা হয়েছে।– গ্রন্থকার

ষষ্ঠ টীকা ৭২ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক
সপ্তম টীকা ৭৯ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক
অষ্টম টীকা ৮২ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক
নবম টীকা ৯৪ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

দশম টীকা

হাদীসটির আসল অনুবাদ হচ্ছে: "আমাকে (মৃত্যুর পর) চল্লিশ দিনব্যাপী কবরে রেখে দেয়ার চেয়ে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে আমার পদমর্যাদা অবশ্যই অনেক উচ্চতর বটে, অর্থাৎ আমি উক্ত সময়সীমার মধ্যেই জীবিত হয়ে আকাশের দিকে উত্থিত হব।" এখন দেখা আবশ্যক, (মৃত্যুর পর) কবরে পুনর্জীবিত হওয়া ও আকাশের দিকে উত্থতি হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনিব ও অভিভাবক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেয়ে হযরত ঈসার মর্যাদা বড়ো হওয়ার কারণ কী? প্রকৃত সত্য এটাই যে, (আত্মিক মর্যাদায়) হযরত ঈসার জীবন তো হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনের চেয়েও নিম্নস্তরের ছিল। অতএব পূর্ববর্তী সর্বজনমান্য বুযুর্গানের বিশ্বাস ও সর্বসম্মত অভিমতের পাশাপাশি মি'রাজের হাদীসও একতার সরব স্বাক্ষী যে, নবীগণ মৃত্যুর পর (আধ্যাত্মিক জগতে) ইহজাগতিক জীবন-সদৃশ (এক প্রকার) দৈহিক জীবনসহ জীবিতাবস্থায় রয়েছেন এবং শহীদদের তুলনায় অবশ্যই তাদের জীবন অধিকতর পরিপূর্ণ ও অধিকতর দৃঢ়। আর সবচেয়ে অধিক পরিপূর্ণ, সর্বাধিক দৃঢ় ও মহামর্যাদাপূর্ণ জীবন হচ্ছে আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন; আমি ও আমার পিতা-মাতা যার জন্য চির উৎসর্গীকৃত। হযরত মসীহ্ তো কেবল দ্বিতীয় আকাশে তাঁর খালাতো ভাই ও তাঁর প্রথপ্রদর্শক হযরত ইয়াহ্ইয়ার সাথে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমাদের অভিভাবক ও মওলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (আধ্যাত্মিক) আকাশের সর্বোচ্চ মার্গে ও শীর্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর অবস্থানস্থল হলো عند سدرة المنتهى بالرفيق الاعلى (অর্থাৎ মি'রাজের শেষ মার্গ سدرة المنتهى-এর কাছে, তাঁর সর্ব মহান বন্ধু আল্লাহ্র পার্শ্বে।–অনুবাদক) এবং উম্মতের সার্বিক 'সালাম ও দোয়া' সদাসর্বদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমীপে পৌঁছানো হয়।

اللّٰهم صل على سيدنا محمد وعلى اٰل سيدنا محمد أكثر مما صليت على أحد من انبيائك وبارك وسلم

[অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তোমার সমগ্র নবীকুলের ওপর বর্ষিত 'সালাম ও দোয়া, কল্যাণ ও আশিসের চেয়েও অধিক সংখ্যক ও বহুগুণ বেশি পরিমাণে বর্ষণ করো আমাদের মনিব ও অভিভাবক মুহাম্মদ ও তাঁর 'আল' (তথা প্রকৃত অনুসারীদের) ওপর।"–অনুবাদক]। আর নবীগণ জীবিত অবস্থায় কবরে অবস্থান করেন– এ ধারণাটি সঠিক নয়। তবে কবরের সঙ্গে তাদের এক প্রকার সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে। এ কারণেই

দশম টীকা ৯৫ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনে তাদেরকে নিজ নিজ কবরে দেখা যায় কিন্তু এমনটি নয় যে তাঁরা কবরেই পড়ে থাকেন বরং তাঁরা তো ফেরেশ্‌তাদের মত বেহেশ্‌তের মাটিতুল্য আকাশসমূহে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী (নির্ধারিত) মাকাম ও মার্গের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা জাগ্রত অবস্থায় (দিব্যদর্শনে) পবিত্রচেতা লোকদের সাথে কখনো কখনো পৃথিবীতে এসে দেখা-সাক্ষাৎও করে থাকেন। প্রায়শ আওলিয়াদের সাথে একেবারে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কিত বৃত্তান্তে পুস্তকাদি পরিপূর্ণ রয়েছে এবং এ পুস্তকের প্রণেতাও কয়েকবার এ বিরল সৌভাগ্যে ভূষিত হয়েছে। الحمد لله على ذلك (এজন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই)। বস্তুত নবী করীম (সা.)-এর এ হাদীসটিতে 'কবরে আমি চল্লিশ দিনও অবস্থান করব না।' এ বাক্যটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, প্রথম কয়েকদিন যত পূত-পবিত্র মানুষই হোন না কেন, কবরের সাথে এবং ইহজাগতিক ভুবনের সঙ্গে তাঁদের একটা বাড়তি সম্পর্ক থাকে– কারও বা ধর্মের কাজ করার প্রবল পিপাসার কারণে এবং কারও-বা অন্যান্য কারণ বশত। তবে পরবর্তীতে সে-সম্পর্কটি এতহ্রাস পায় যে, ঐ সমাহিত ব্যক্তি যেন সে-কবরটি থেকে বেরিয়ে যান, (কবরটি সম্পূর্ণ ছেড়ে যান)। অন্যথায় রূহ বা আত্মা তো মৃত্যুর পরে পরেই ঊর্ধ্বলোকে তার আত্মিক মার্গে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে।– গ্রন্থকার

একাদশ টীকা

আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

(১) وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ– অর্থাৎ 'আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি।' *(সূরা আল হাদীদ: ২৬)*

(২) قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا– অর্থাৎ 'আমরা তোমাদের ওপর পোশাক অবতীর্ণ করেছি'। *(সূরা আল আ'রাফ: ২৭)*

(৩) وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ– অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছেন।' *(সূরা আয যুমার: ৭)*

তেমনিভাবে তওরাতে এই বাক্যগুলো রয়েছে: (১) 'মরু প্রান্তরে আমাদের অবতীর্ণ হওয়া *(গণনা, অধ্যায়: ১০, শ্লোক ৩১)*। (২) 'আমাকে জর্দানের পাড়ে অবতীর্ণ হতে হবে' *(দ্বিতীয় বিবরণ: অধ্যায়: ৪ শ্লোক: ২২)*। (৩) 'আমার অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা আছে' *(আদিপুস্তক: ২৩, ২৪)*।

এখন এই সকল আয়াত ও শ্লোক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'অবতীর্ণ হওয়া' বলায়

একাদশ টীকা ১১৩ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

কখনো আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বোঝায় না বরং যেমনটি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, দুই আর দুইয়ে কত হয়? তখন যদি সে উত্তরে বলে চারটি রুটি; 'অবতীর্ণ হওয়া' শব্দের সঙ্গে আকাশ শব্দ যোগ করা এমনই বিষয়।

দ্বাদশ টীকা

একত্ববাদী বলে দাবিদার একটি ফির্কার কিছু লোক কুরআনের আয়াতের বরাতে বিশ্বাস রাখেন যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (কিনা মাটি দিয়ে) নানা রকম পাখি তৈরি করে সেগুলোতে ফুঁ মেরে জীবিত করে দিতেন। এ কারণে ও এর ভিত্তিতেই এ অধমের বিরুদ্ধে তারা আপত্তি করে বলেন, 'মসীহ্সদৃশ' হওয়ার যেহেতু দাবি রয়েছে সেহেতু আপনিও কোন মাটির পাখি তৈরি করে সেটি জীবিত করে দেখিয়ে দিন। কেননা যেখানে হযরত মসীহ্র বানানো কোটি কোটি পাখি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান, চারদিকে যাদের উড়ে বেড়াতে দেখা যায় তাই 'মসীহ্সদৃশ' হওয়ার দাবিদারের পক্ষেও কোন পাখির স্রষ্টা হওয়া উচিত।

এসব ভ্রান্ত ধারণার উত্তর হলো, যে-সব আয়াতে ওরকম বিষয় লেখা আছে বলে তাদের বিশ্বাস সেগুলো 'মুতাশাবিহাত' (তথা রূপক ভাষায় বর্ণিত আয়াত)-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর এ অর্থ করা যে, খোদা তা'লা কিনা তাঁর ইচ্ছায় এবং আদেশক্রমে হযরত ঈসাকে স্রষ্টা হওয়ার বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলিতে শরিক বা অংশীদার বানিয়েছিলেন এটা সুস্পষ্টত এলহাদ (পথ ভ্রষ্টতা) ও চরম ঈমান শূন্যতা বৈ আর কিছু নয় কেননা খোদা তা'লা যদি তাঁর খোদা হওয়ার গুণাবলিও অন্যকে দান করতে পারেন তাহলে তাঁর খোদায়ী (ঈশ্বরত্ব) বাতিল হয়ে যায়। উল্লিখিত 'তৌহিদবাদী' মহোদয় তাঁর উক্ত আপত্তি প্রসঙ্গে আরও বলেন, "হযরত ঈসা (আ.) ব্যক্তিগত শক্তিতে স্রষ্টা ছিলেন বলে তারা বিশ্বাস করেন না বরং তাদের বিশ্বাস হলো, তাঁকে এই ক্ষমতা ও শক্তিসামর্থ্য খোদা তা'লার সরাসরি ইচ্ছায় ও আদেশক্রমে দান করা হয়েছিল এবং স্বেচ্ছায় ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তাঁর স্রষ্টা হওয়ার গুণে অংশীদার বানিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, তাঁর সদৃশ বানাতে পারেন! কেননা তিনি হলেন সর্বশক্তিমান।"

তাঁদের উল্লিখিত এসব বিশ্বাস বস্তুত সার্বিকভাবে মুশরিকসুলভ ও কুফরীর চেয়েও নিকৃষ্ট। ওই একত্ববাদীকে এ-ও বলা হয়, 'আপনারা কি এখন সনাক্ত করতে পারেন–

দ্বাদশ টীকা ১২০ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

এসব পাখির মাঝে কোন্‌গুলো খোদা তা'লা কর্তৃক সৃষ্ট এবং কোন্‌গুলো হযরত ঈসা কর্তৃক সৃষ্ট পাখিদের বংশধর? তখন সে-ব্যক্তি তাঁর নীরব থাকার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এ উত্তরই দিলেন যে তিনি তা সনাক্ত করতে পারবেন না।

জানা আবশ্যক, এ যুগের কতক একত্ববাদীর এরকম আকিদা ও বিশ্বাস যে, পাখিকুলের মাঝে কতক খোদার সৃষ্টি এবং কতক হযরত ঈসার সৃষ্টি– এটা সর্বৈব অবান্তর ও শির্‌কপূর্ণ ধ্যানধারণা এবং এসব ধ্যানধারণার ধারক ও বাহক নিঃসন্দেহে ইসলামের প্রকৃত গণ্ডি বহির্ভূত।

তাঁদের একথা বলা যে, হযরত ঈসাকে তারা খোদা হিসাবে মানেন না বরং তাদের বিশ্বাস হলো খোদা তা'লা তাঁর কতক খোদাসুলভ গুণ তাকে দান করেছিলেন– উল্লিখিত এ অজুহাত অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি অজুহাত। কেননা খোদা তা'লা যদি নিজ আদেশে ও স্বেচ্ছায় তাঁর খোদা হওয়ার (ঐশ্বরিক) গুণাবলি বান্দাদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন তাহলে তিনি তাঁর সমগ্র ঐশ্বরিক গুণাবলি কোন বান্দাকে দান করে তাকে পরিপূর্ণ খোদায়ও পরিণত করতে পারেন! অতএব এভাবে পৌত্তলিক এবং যারা সৃষ্টির উপাসনা করে তাদের সকল মতবাদ সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। খোদা তা'লা যদি কোন মানুষকে তাঁর আদেশ বলে ও স্বেচ্ছায় স্রষ্টা হওয়ার মৌলিক গুণ দান করতে পারেন, তাহলে তো এ ধারায় তিনি কাউকে আদেশবলে ও স্বেচ্ছায় নিজের মত আলেমুল-গায়েবও (তথা অজ্ঞেয় বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞাত) বানাতে পারেন এবং তাকে এমন ক্ষমতাও দান করতে পারেন যার ফলে সে খোদা তা'লার মত সর্ববিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা হয়ে যাবে। অতএব এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খোদার ঐশ্বরিক গুণাবলিও যদি মানুষের মাঝে বিতরণযোগ্য হতে পারে তাহলে খোদা তা'লার 'ওয়াহ্‌দাহু লা শারিক' তথা 'একক ও অদ্বিতীয়' হওয়া বাতিল হয়ে যায়। দুনিয়াতে যে সব সৃষ্টি-পূজারি রয়েছে তারাও তাদের উপাস্যদের খোদা আখায়িত করে না। বরং উল্লিখিত এসব একত্ববাদীর ন্যায় যারা সৃষ্টির উপাসনা করে তাদের বক্তব্যও এটাই যে, তাদের উপাস্যদের খোদা তা'লাই ঐশ্বরিক ক্ষমতাসমূহ দিয়ে রেখেছেন। রাব্বুল-আ'লা তথা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু-প্রতিপালক তো তিনিই, আর এরা কেবল ছোটো ছোটো খোদা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ লোকগুলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (হে আল্লাহ্‌র রসূল!) বাক্যটি শির্‌কপূর্ণ মনে করে এটি উচ্চারণ করতে বারণ করে কিন্তু হযরত মরিয়মের মানবসুলভ অক্ষম ও দুর্বল পুত্রকে তারা ঈশ্বরত্বের অংশীদার বানিয়েছেন!

হে ভ্রাতাগণ! আপনাদের প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিশ্বাস এটাই যে, 'খোদায়ী' বা ঈশ্বরত্বও সৃষ্টজীবের মাঝে একটি বিতরণযোগ্য বস্তু। খোদা তা'লা যাকে চান তাকেই তাঁর

খালেক, রাযেক্ব, আলীম ও ক্বাদীর ইত্যাদি ঐশী গুণাবলিতে চিরস্থায়ীভাবে শরিক বানিয়ে দেন। এতে করে আপনারা কেনই-বা আপনাদের বেদাতী ভাইদের সঙ্গে এত যুদ্ধ বা সংগ্রাম শুরু করে রেখেছেন! সেই হতভাগারাও তাদের আউলিয়াদের খোদা হিসেবে মানে না। বরং কেবল এটুকুই বলে যে খোদা তা'লা নিজ আদেশবলে ও স্বেচ্ছায় কিছু কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাদের দিয়ে রেখেছেন! তারা কেবল ঐশী আদেশে প্রাপ্ত এসব ক্ষমতাবলেই কাউকে পুত্রসন্তান দান করেন আর কাউকে কন্যাসন্তান দিয়ে থাকেন। তারা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা। তারা উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং ভক্তদের অভিষ্ট ও বাসনা পূরণ করে থাকেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ রকম বিশ্বাস সর্বৈব মিথ্যা এবং শির্কপূর্ণ ধ্যানধারণা হয়ে থাকলে পবিত্র কুরআনের সেই সব আয়াতের সঠিক অর্থ কী– যেগুলোতে কিনা লিখা আছে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মাটির পাখি বানিয়ে সেগুলোতে ফুঁ দিতেন, আর এতে করে সেগুলো আল্লাহ্‌র আদেশে পাখি হয়ে (উড়ে) যেত।

অতএব জানা আবশ্যক, নবীগণের মু'জিযা বা নিদর্শনসমূহ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমত যেগুলো কেবল স্বর্গীয় ও অলৌকিক ব্যাপার হয়ে থাকে, যেগুলোতে মানুষের চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার কোন দখল বা হাত থাকে না। যেমন 'শাক্‌কুল কামার' তথা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিদর্শন ছিল। খোদা তা'লার সীমাহীন ক্ষমতা একজন পরম সত্যবাদী ও সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ নবীর মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রকাশার্থে এটি দেখিয়েছিল। দ্বিতীয়ত যৌক্তিক মু'জিযাসমূহ, যা সেই অসাধারণ বুদ্ধি বা যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং ঐশী বাণীর কল্যাণে লাভ হয়, যেমন হযরত সুলায়মানের صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ *(সূরা আন নমল: ৪৫)* আয়াতে বর্ণিত মু'জিযাটি- রয়েছে; যা দেখে রাণী বিলকিসের পক্ষে ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

স্মরণ রাখা উচিত! দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসার উল্লিখিত নিদর্শন হযরত সুলায়মানের মু'জিযার মতো কেবল বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, সেই যুগে মানুষের প্রবণতা ভেলকিবাজি জাতীয় বিষয়াদির দিকে বেশি আকৃষ্ট ছিল যা প্রকৃতপক্ষে বৃথা ও নিষ্ফল হলেও সাধারণ মানুষদের বিমোহিত করত। ফেরাউনদের যুগে মিশরে যেসব লোক এ ধরনের কাজ করত, অর্থাৎ তারা সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দিত এবং নানা রকম প্রাণী তৈরি করে সেগুলোকে জীবিত প্রাণীদের মত বিচরণশীল করে চালিয়ে দিত, ঐসব লোক হযরত মসীহ্‌র যুগে মোটের ওপর ইহুদী অধ্যুষিত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহুদীরা তাদের কাছ থেকে বহু

যাদু বিদ্যা শিখে নিয়েছিল, যেমন কুরআন করীমও এ বিষয়ের সাক্ষ্য দান করে। কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যদি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্কে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে এমন পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন, যেমন মাটির খেলনা, এতে লাগানো কল বা বুতামে টিপ দেয়াতে বা এর কোথাও ফুঁ মারায় উড্ডয়নশীল পাখির ন্যায় এগুলো উড়ে অথবা উড়তে সক্ষম না হলে পায়ে হেঁটে চলে। কেননা মরিয়মপুত্র হযরত মসীহ্ (আ.) তার পিতা ইউসুফের সঙ্গে বাইশ বছরকালব্যাপী সূত্রধরের কাজও করতে থাকেন। আর এটা স্পষ্ট যে, কাঠমিস্ত্রীর কাজ প্রকৃতপক্ষে এমন এক কাজ যাতে বিভিন্ন কলকবজা ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার এবং বিভিন্ন জিনিপত্র বা আসবাব তৈরির কারণে বুদ্ধি প্রখর হয়ে ওঠে।

মানুষের মাঝে যেমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে তদনুপাতে নিদর্শনমূলকভাবে সাহায্য লাভ হয়। যেমন আমাদের নেতা ও মনিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলি সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্বরাশিতে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রখর ও দৃঢ় ছিল। অতএব সে অনুসারেই তাঁকে কুরআন করীমের মু'জিযা বা নিদর্শন দান করা হয় যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঐশী জ্ঞানতত্ত্বাবলির সমাহার। অতএব এতে মোটেও বিস্মিত হওয়া উচিত নয় যে, হযরত মসীহ্ তাঁর দাদা সোলায়মানের মত তৎকালীন বিরুদ্ধবাদীদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এ মু'জিযা দেখিয়ে থাকবেন। আর এরূপ মু'জিযা দেখানো যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বহির্ভূত কোন ব্যাপারও নয়। কেননা সাম্প্রতিক কালেও দেখা যায় প্রায়শ কারিগররা এমন (যান্ত্রিক) পাখি তৈরি করে থাকে যা হেলে-দুলে চলে এবং কথাও বলে। আমি শুনেছি, কতক পাখি যন্ত্রের মাধ্যমে উড়েও। মুম্বাই ও কোলকাতায় এ রকম খেলনা অনেক তৈরি হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে; আর প্রত্যেক বছর নিত্যনতুন বের হচ্ছে। যেহেতু কুরআন করীম বেশিরভাগ রূপক বর্ণনায় পরিপূর্ণ তাই আমরা উল্লিখিত আয়াতগুলোর রূপকভাবে এ অর্থ গ্রহণ করতে পারি যে, মাটির পাখি দ্বারা সেসব নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোকদের বোঝায় যাদের হযরত ঈসা নিজের সঙ্গী-সাথি বানিয়েছিলেন অর্থাৎ অন্য কথায় তিনি তাদের নিজ সাহচর্যে নিয়ে যেন আধ্যাত্মিক পাখির আকারে পাখির কাটামো তৈরি করেন এবং তাদের মাঝে হেদায়াতের রূহ্ ফুঁকে দেন। যার ফলে তারা (আধ্যাত্মিক ভুবনে) উড্ডয়নশীল হয়ে ওঠে।

তাছাড়া হতে পারে, উল্লিখিত এসব নিদর্শন عمل الترب অর্থাৎ 'মেসমেরিজম' এর আদলে প্রকাশিত হয়ে থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়– তা আমোদ-প্রমোদ

ক্রীড়াকৌতুক হিসেবেই বটে, বাস্তব সত্যস্বরূপ নয়। কেননা তিরব প্রক্রিয়া যাকে অধুনা যুগে মেসমেরিজম বলে অভিহিত করা হয় এমন সব বিরল বিস্ময়াবলি নিহিত রয়েছে যে, এর পুরো চর্চা ও অনুশীলকারীরা অন্যান্য বস্তুতে তাদের আত্মার উষ্ণতার প্রভাব ফেলে সেগুলোকে জীবিত বস্তুর মত করে দেখিয়ে থাকে। মানবাত্মার এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, এটি তার জীবনীশক্তির উষ্ণতা দ্বারা সম্পূর্ণ একটি প্রাণহীন জড়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে ফলে জড়বস্তুতে জীবিতদের মত কতক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এ গ্রন্থকার উল্লিখিত বিদ্যার কোন কোন অনুশীলনকারীদের প্রত্যক্ষ করেছে যারা তিন পা বিশিষ্ট একটি কাঠের টেবিলের ওপর হাত রেখে সেটিতে স্বীয় জৈবিক শক্তির প্রভাব ফেলে এমনভাবে সঞ্জীবিত করে তুলেছে যে, সেটি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় নড়তে চড়তে শুরু করে এবং কত মানুষ ঘোড়ার মত সেটির ওপর বসেছে তবু এর নড়াচড়া ও গতি একটুও হ্রাস পায় নি। অতএব নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, এই কলায় পূর্ণ দক্ষতা রাখে এমন কোন ব্যক্তি যদি মাটির একটি পাখী তৈরী করে সেটিকে উড্ডয়নরত পাখি হিসেবেও দেখিয়ে দেয় তবে তা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা এ বিদ্যাটিতে চূড়ান্ত প্রতিভার মাত্রা কোথায় কতটুকু তা মানুষ আন্দাজ করতে এখনও সক্ষম হয় নি। আর আমরা যখন সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ বিদ্যাটি দ্বারা একটি জড়বস্তুতে গতি সঞ্চারিত হয় এবং সেটি জীবজন্তুর ন্যায় চলতে আরম্ভ করে, এরপর সেটি যদি উড়েও তবে তা অসম্ভব হবে কেন? তবে স্মরণ রাখা আবশ্যক, মাটি বা কাঠ ইত্যাদির তৈরি এমন কোন পাখি বা জন্তুর মধ্যে মেসমেরিজমের প্রক্রিয়ায় কেউ নিজ আত্মার উষ্ণতা সঞ্চার করে, সেটি আক্ষরিকভাবে জীবিত হয় না, বরং সেটি যথারীতি প্রাণহীন ও জড়বস্তুই থেকে যায়। কেবলমাত্র মেসমেরিজমের প্রভাব প্রয়োগকারী ব্যক্তির আত্মিক উষ্ণতা বারুদের মত সেটিকে গতিশীল করে থাকে মাত্র। আর এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এ জাতীয় পাখিগুলোর উড্ডয়ন করা কুরআন করীম থেকে কখনো প্রমাণিত হয় না। বরং ঐগুলোর নড়াচড়াও প্রমাণসিদ্ধ নয়, তাই আক্ষরিক অর্থে এগুলোর জীবিত হয়ে ওঠাও প্রমাণিত হয় না। এস্থলে এ-ও জানা আবশ্যক যে, রোগব্যাধী দূরীভূত করা বা জড়বস্তুতে কারও আত্মিক উষ্ণতা সঞ্চার করা প্রকৃতপক্ষে এসবকিছুই মেসমেরিজমের শাখাপ্রশাখা বিশেষ। সব যুগেই এ শ্রেণির মানুষ ছিল এবং এখনও এমনসব লোক রয়েছে, যারা এ আত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগ দূরীভূত করেছেন। তাদের মনঃসংযোগে পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীরা নিরাময় লাভ করে থাকে। ব্যাপক তত্ত্বতথ্য জানা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমার এ বর্ণনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, কতক নক্‌শবন্দী ও সোহরাওয়ার্দী ফকির-দরবেশরা এ সকল

অনুশীলনে অনেক বেশি মোনোযোগ নিবন্ধ করেছেন। তাদের মাঝে এমন কতক পারদর্শীও অতীত হয়েছেন যাঁরা শতশত রোগীকে ডানে-বায়ে বসিয়ে রেখে কেবল দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে রোগমুক্ত ও সুস্থ করে দিতেন। মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শীতা রাখতেন। আওলিয়া ও পুণ্যপথযাত্রীদের ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাতে জানা যায়, পূর্ণ সিদ্ধিপ্রাপ্তগণ এমন বিদ্যার অনুশীলনকে এড়িয়ে চলতেন, পরিহার করতেন। কিন্তু কতক লোক তারা যে ওলী সেই প্রমাণ দেয়ার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন মানসে এসব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর এখন এ বিষয়টি চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ঐশী আদেশে আল ইয়াসা নবীর মতো এ عمل الترب (মেসমেরিজম) বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যদিও নিপুণতায় আল ইয়াসা নবী থেকে নিম্ন স্তরে ছিলেন। কেননা, আল ইয়াসা'র শবদেহও এ নিদর্শন দেখিয়েছে যে, তাঁর হাড়গোড়ের স্পর্শে এক মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু চোরদের শবদেহ হযরত মসীহ্র দেহের সাথে স্পর্শ করায় কোনক্রমেই জীবিত হতে পারে নি, অর্থাৎ সেই দুজন চোর, যারা মসীহ্র সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। মোটকথা, হযরত মসীহ্র এইসব মেসমেরিজমমূলক কার্যাবলি যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতির দাবি ছিল। তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কার্যক্রম সেভাবে মূল্যায়নের যোগ্য নয়, যেমন কি-না জনসাধারণ এটিকে মনে করে থাকে। এ অধম যদি এ কার্যক্রমকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য মনে না করত, তাহলে খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় দৃঢ় আশা রাখত যে, এ অধম এসব অসাধারণ বিষয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের চেয়ে পিছিয়ে থাকত না। কিন্তু আমার সেই রূহানী (আধ্যাত্মিক) পদ্ধতিটি পছন্দনীয়, যেটিতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পদচারণা করেন। বস্তুত হযরত মসীহ্ও ঐ দৈহিক ও জাগতিক প্রক্রিয়াকে ইহুদীদের বস্তুগত জাগতিক হীন ধ্যানধারণার কারণে ঐশী আদেশে অবলম্বন করেছিলেন। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্র দৃষ্টিতেও ঐ সব কার্যক্রম পছন্দনীয় ছিল না। স্মরণ রাখা উচিত, এ দৈহিক ও জাগতিক কার্যক্রমটির এক অত্যন্ত ক্ষতিকর বিশেষত্ব হলো, যে ব্যক্তি একাজে জড়িয়ে যায় এবং শারীরিক রোগব্যধি দূরীকরণে নিজের মন ও মনন শক্তিকে ব্যয় করতে থাকে, সে তার ঐসব আধ্যাত্মিক প্রভাব ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে যায়, যা আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করে আধ্যাত্মিক রোগব্যধিসমূহ দূর করে থাকে। আর হৃদয়কে আলোকিত করা ও আত্মশুদ্ধি সাধন সম্পর্কিত মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্যটি সে ব্যক্তির মাধ্যমে খুবই কম পরিমাণে সম্পাদিত ও সাধিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত মসীহ্ যদিও দৈহিকভাগে রোগাক্রান্তদের রোগমুক্ত করতে থাকেন, কিন্তু হেদায়াত দেয়া, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত ধর্মীয় দৃঢ়তা মানব হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত

করার ক্ষেত্রে তাঁর কার্যক্রম এতটা নিম্নমানের ছিল যে, সেটিকে ব্যর্থতার কাছাকাছি বলা যায়। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেহেতু এসব দৈহিক ও জাগতিক বিষয়াদির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি এবং তাঁর আত্মার সার্বিক শক্তি মানুষের হৃদয়ে হেদায়াত সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন; এ কারণেই আত্মিক পূর্ণতা সাধনে তিনি (সা.) সর্বাগ্রে ছিলেন এবং খোদা তা'লার সহস্র সহস্র বান্দাকে (উন্নতির) পরম মার্গে পৌঁছে দেন। মানুষের সংশোধন ও অভ্যন্তরীণ শুভ-পরিবর্তন আনয়নে সেই 'ইয়াদে বাইজা' তথা 'শুভ্রহস্ত'– সুলভ এমন সিদ্ধহস্ততা প্রদর্শন করেন, যার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর 'আমালুত্ তারব' (বা মেসমেরিজম) দ্বারা যেসব মৃত জীবিত হত, অর্থাৎ মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়া যেসব লোক তাঁর হাতে জীবন ফিরে পেত, তারা আবার তৎক্ষণাৎ কয়েক মিনিটেই মরেও যেত। কেননা, মেসমারিজমের প্রক্রিয়ায় আত্মায় উষ্ণতার সঞ্চার হওয়া ও জীবন লাভ কেবল অস্থায়ীভাবে হত। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জীবিত করেন, তারা সদা-সর্বদা জীবিত থাকে। মেসমেরিজম' জাতীয় বিদ্যাটির নাম যে আমি عمل الترب রেখেছি আর হযরত মসীহ্ (আ.)-ও কিছুমাত্রায় দক্ষতা রাখতেন, এটি এলহাম যোগে প্রাপ্ত নাম। খোদা তা'লা আমার নিকট ব্যক্ত করেছেন, এটি عمل الترب (মেসমেরিজম প্রক্রিয়া)। এর বিস্ময়কর লীলাসমূহ সম্পর্কে এ এলহামও অবতীর্ণ হয়:

هذا هو الترب الذى لا يعلمون, অর্থাৎ এটি সেই মেসমেরিজম প্রক্রিয়া, যার প্রকৃত স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষ কিছুই জানে না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গুণাবলিতে 'লা-শরীক' (এক-অদ্বিতীয়) হওয়ার মর্যাদা রাখেন। তিনি 'উলুহিয়্যাত' বা ঈশ্বরত্বের গুণাবলিতে অন্য কাউকে অংশীদার করেন না। কুরআন করীমের স্পষ্ট আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয়ের এত তাগিদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা কারও কাছে গোপন নয়। যেমন, তিনি বলেন:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

অর্থাৎ 'খোদা হলেন সেই সত্তা, যিনি সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি। কেউ এর অংশীদার নয়। তাঁর কোন পুত্র নেই এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনেও তাঁর কোন জুড়ি নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি

করেছেন এরপর তার দেহ, তার শক্তি-নিচয় ও তার আয়ুর কিছুটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুশরিক বা অংশীবাদীরা এই প্রকৃত খোদাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য এমন সব খোদা সাব্যস্ত করে রেখেছে, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের লাভ-লোকসানেরও মালিক নয় এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠারও মালিক নয়।' *(সূরা আল ফুরকান: ৩-৪)*

এখন লক্ষ করুন! খোদা তা'লা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা নেই; বরং আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিতভাবে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। পরিষ্কার ভাষায় তিনি আরও বলেন, কোন ব্যক্তিই জীবন, মৃত্যু এবং লাভ ক্ষতির মালিক হতে পারে না। এস্থলে এটা স্পষ্ট যে, কোন সৃষ্টজীবকে মৃত্যু ও জীবনের মালিক বানিয়ে দেওয়া এবং নিজের গুণাবলিতে শরিক করা যদি ঐশী স্বভাব ও রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত হত, তাহলে তিনি ব্যতিক্রম হিসেবে এমন লোকদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন এবং এমন উন্নত ও উচ্চস্তরের একত্ববাদের শিক্ষা আমাদের কখনো দিতেন না। কারও অন্তরে যদি এ সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগে যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে কুরআন করীমের যে জায়গায় পাখি তৈরির বৃত্তান্ত রয়েছে, সেখানে تخلق শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন? বাহ্যত যার অর্থ হল, 'তুমি সৃষ্টি করো বা করে থাকো?' এর উত্তর এটাই যে, এ জায়গায় হযরত ঈসাকে রূপকার্থে 'খালেক' স্বরূপ আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخَالِقِيۡنَ *(সূরা আল মু'মিনূন: ১৬)*। নিঃসন্দেহে প্রকৃত ও সত্যিকার 'খালেক' বা স্রষ্টা হলেন খোদা তা'লা। যারা মাটি বা কাঠের খেলনা তৈরি করে থাকে, তারাও 'খালেক' বটে, তবে তারা নকল বা কৃত্রিম 'খালেক' (বা স্রষ্টা), যাদের কাজের কোন বাস্তবতা নেই।

আর যদি বলা হয়, হযরত ঈসা (আ.) ঐশী ইচ্ছায় মু'জিযাস্বরূপ বাস্তবে পাখি বানাতেন এবং মু'জিযাসুলভ তাঁর ফুঁৎকারে সেসব পাখি আকাশে উড়ে যেত– এমনটি নিদর্শনমূলকভাবে কেন বৈধ হবে না? অতএব এর উত্তর হলো, খোদা তা'লা স্বীয় আদেশে বা স্বীয় ইচ্ছায় কোন ব্যক্তিকেই জীবন-মৃত্যু ও লাভ-লোকসানের মালিক বানান না। দোয়া ও কাকুতিমিনতি করে নবীগণ আল্লাহ্র কাছে নিদর্শন যাচ্না করে থাকেন। মানুষ যেমন হাত-পা নাড়াতে সক্ষম, নবীগণ সেভাবে মু'জিযা দেখাতে সক্ষম নন।

মোটকথা, উল্লিখিত বিষয়টি মু'জিযার প্রকৃত স্বরূপ ও অর্থের ঊর্ধ্বে এবং খোদা তা'লার সেসব বিশেষ গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, যা কোন অবস্থাতেই মানুষের লাভ হতে পারে না। মু'জিযা প্রাকৃতিক (সাধারণ) নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী একটি বিষয় অথবা মানুষের কল্পনা ও ধারণাতীত একটি বিষয় যা আশাতীতভাবে তিনি তাঁর কোন রসূলের সম্মান ও সত্যতা প্রকাশার্থে এবং তার বিরুদ্ধবাদীর অক্ষমতা ও পরাজয়ে উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিজ ইচ্ছায় অথবা সেই রসূলের দোয়া ও বিশেষ প্রার্থনার কারণে নিজে থেকে প্রদর্শন করেন। তবে এমনভাবে করেন, যা তাঁর তওহীদ, তাঁর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যেন পরিপন্থি না হয় এবং তাতে অন্য কারও ওকালতি বা কৌশল ও কারসাজির এতে কোন ভূমিকা থাকবে না।

এখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন যে, খোদা তা'লা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করার এবং এতে তাকে ফুঁ দেওয়ার অনুমতি ও আদেশ দান করায় সেটি বা সেগুলো প্রকৃতপক্ষে জীবিত হয়ে যাবে এবং সেগুলোতে জীবজন্তুসুলভ হাড়, মাংস, রক্ত এবং যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হবে; এ চিত্রটি কোনভাবে মু'জিযার ধরন নয়। এটি স্পষ্ট যে, খোদা তা'লা যদি পাখী সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে নিজের 'খালেক' বা স্রষ্টা হওয়ার বৈশিষ্ট্য কারও হাতে তুলে দিতে পারেন, তাহলে তিনি সৃষ্টির সার্বিক বিষয়ে পুরো কার্যনির্বাহের পদটিও কাউকে দান করতে পারেন! এরূপ অবস্থায় খোদা তা'লার সকল গুণাবলিতে শরিক সাব্যস্ত হওয়া বৈধ হয়ে যাবে, তা তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমেই হোক না কেন! আর এতে করে এমন স্রষ্টাদের সামনে এবং فتشابه الخلق عليهم [অর্থ: অতএব সৃষ্টির বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়।"– অনুবাদক] এর বাধ্যবাধকতার কারণে প্রকৃত স্রষ্টার পরিচিতিও সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে! মোটকথা, এটি নিদর্শন বা মু'জিযার প্রকৃতস্বরূপ বা ধরণ নয়, বরং এটা তো খোদা তা'লার অংশীদার তৈরি করার নামান্তর।

শির্ক (অংশীবাদিতা) এড়ানোর উদ্দেশ্যে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক এ অজুহাত পেশ করে থাকেন যে, হযরত মসীহ্ (আ.) যেসব পাখি বানাতেন, সেগুলো বেশিক্ষণ জীবিত থাকত না। তাদের আয়ুষ্কাল স্বল্পকালীন হতো। কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে সেগুলো পড়ে মরে যেত। কিন্তু এ অজুহাতটি একেবারেই খোঁড়া ও বৃথা। এটি কেবল তখন গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন এ বিশ্বাস করা হয় যে, ঐ পাখিগুলোর মাঝে সত্য ও প্রকৃত জীবন সৃষ্টি হত না বরং প্রতিবিম্বমূলক, রূপক ও মিছেমিছি জীবন, যা

عمل الترب বা মেসমেরিজমের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে, সে-রকম একটা মিথ্যে ঝলকের ন্যায় সেগুলোতে দৃশ্যমান হত। অতএব, যদি বিষয় এটুকু হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তো আমরা আগেই স্বীকার করেছি। আমাদের মতে মেসমেরিজমের ফুঁতে সেই শক্তি সৃষ্টি হতে পারে যা সেই ধোঁয়াতে সৃষ্টি হয় যার কারণে বেলুন শূন্যে উড়ে। প্রকৃতির স্রষ্টা এ সৃষ্টিতে অনেক সুপ্ত বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এ কথা সত্য যে, খোদার গুণাবলির অংশীদার হওয়া সম্ভব নয়, এছাড়া আর কোন শিল্পকর্ম আছে যা মানুষের জন্য অসম্ভব? আর যদি এরকম বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, ঐ পাখিগুলোতে সত্যিই প্রকৃত জীবন সৃষ্টি হত এবং সত্যিসত্যি হাড়গোড় ও রক্তমাংস এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি তৈরি হয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হতো, তাহলে এ-ও মানতে হবে যে, সেগুলোতে জীবের সব আবশ্যকীয় উপাদানও সৃষ্টি হতো। আর সেগুলো খাওয়ার উপযোগী হত এবং সেগুলোর বংশও এখন পর্যন্ত কোটি কোটি পাখির আকারে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে; অধিকন্তু সেগুলো কোন রোগের কারণে বা কোন শিকারীর হাতে যদি মারাও যেত তবে এরকম বিশ্বাস নিঃসন্দেহে শির্ক বৈ কিছু নয়। বহু লোক এ ভ্রান্ত সন্দেহের শিকার হয়ে থাকেন যে, কোন নবীর দোয়ায় যদি কোন মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে যায় অথবা কোন জড়বস্তু জীবিত প্রাণী হয়ে যায়, এতে শিরকের কী আছে? এসব লোকের স্মরণ রাখা উচিত যে, এস্থলে দোয়ার কোনো উল্লেখ নেই। দোয়া গ্রহণ করা বা না করা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর হাতে এবং দোয়ায় যে কাজ সংঘটিত হয় সেটি খোদার কাজ হয়ে থাকে; নবীর এতে কোনো ভূমিকা থাকে না। দোয়া করার পর নবী ইন্তেকাল করলেও (কোন সমস্যা নেই কেননা) নবীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির এতে কোন আবশ্যকতা নেই। মোটকথা, নবীর পক্ষ থেকে কেবল দোয়া হয়ে থাকে, যা কখনো গৃহীত হয়, আবার কখনো অগ্রাহ্যও হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই। চারটি ইঞ্জিল দৃষ্টে পরিষ্কার জানা যায়, হযরত মসীহ্ জাতিকে যে এসব কাজ দেখাতেন, তা কখনো দোয়ার মাধ্যমে হতো না। কুরআন করীমেও কোথাও এর উল্লেখ নেই যে, মসীহ্ (আ.) রোগীদের আরোগ্যের জন্য বা পাখি তৈরির সময় দোয়া করতেন, বরং তিনি 'রুহুল কুদুস', তথা পবিত্রাত্মার কল্যাণে তাঁর আশিসমণ্ডিত আত্মা দ্বারা এসব অলৌকিক কাজ দেখাতেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি জীবনে কখনো গভীর মনোযোগসহ ইঞ্জিল পড়ে থাকে, সে অবশ্যই দৃঢ়-বিশ্বাসে আমার এ বর্ণনা বা বক্তব্যের সত্যায়ন করবে। কুরআন করীমের আয়াতসমূহও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে যে, এসব বিস্ময়কর কার্যাবলিতে হযরত মসীহ্কে বিশেষ সামর্থ্য দান করা হয়েছিল। খোদা তা'লা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, সেটি এক প্রকৃতিগত ও স্বভাবজ শক্তি ছিল, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে

প্রকৃতিকভাবে অন্তর্নিহিত রাখা হয়েছে; হযরত মসীহ্‌র এতে কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই। এ বিষয়টির অভিজ্ঞতা এ যুগেও হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্‌র মু'জিযাসমূহ সেই পুকুরটির কারণে অসুন্দর ও মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল, যা হযরত মসীহ্‌র জন্মেরও পূর্বে বিস্ময়াবলির বিকাশস্থলস্বরূপ ছিল। সেটিতে কুষ্ঠ, শ্বেতীরোগ ও পক্ষাঘাত ইত্যাদি সবরকম রোগে আক্রান্তরা পুকুরটিতে এক ডুবেই ভালো হয়ে যেত। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা যে এ রকম মু'জিযা বা কেরামতি দেখিয়েছে, তখন এমন কোন পুকুর ছিল না।

মোটকথা, এ বিশ্বাসটি একেবারেই ভ্রান্ত, অসত্য ও শির্‌কপূর্ণ একটি বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আ.) মাটির পাখি তৈরি করে সেগুলোতে ফুঁ মেরে সত্যিকার জীবন্ত পাখি বানিয়ে দিতেন? কখনো না। বরং তা কেবল عمل الترب (মেসমেরিজম) ছিল, যা আত্মিক শক্তি প্রয়োগে বিশেষ অনুশীলনের কল্যাণে উন্নত-পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এ-ও সম্ভব যে, হযরত মসীহ্ এসব কাজের জন্য উল্লিখিত পুকুরটির মাটি আনতেন, যাতে পবিত্রাত্মার প্রভাব রাখা হয়েছিল। মোটকথা, এসব মু'জিযা কেবল এক ধরনের ভেলকি ছিল এবং সেই মাটি সামেরীর গো-বৎসের মতো কেবল মাটি হিসেবেই পড়ে থাকত। فتدبّر - فانه نكتة جليلة ما يلقها إلا ذو حظ عظيم - منه
(অর্থ: 'অতএব গভীরভাবে চিন্তা করো, কেননা এটি নিশ্চয় এক মহাগুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্মতত্ত্ব, যা কেবল বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তিকেই শেখানো হয়)।– গ্রন্থকার

ত্রয়োদশ টীকা

'মসীহ্‌র নিঃশ্বাসে মরে যাওয়া' কথাটির প্রকৃত অর্থ আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, এ দ্বারা দলিলপ্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি এবং উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে নির্মূল হওয়া বুঝায়। নচেৎ এমন ধারণা করা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বহির্ভূত যে, কোনো বিষাক্ত ও মহামারির জীবাণু হযরত মসীহ্‌র মুখ বেরিয়ে বাতাসে মিশে দুর্বল কাফেরদের ধ্বংস করবে, কিন্তু দাজ্জালকে মারতে পারবে না।– গ্রন্থকার

ত্রয়োদশ টীকা ১৪৮ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।– অনুবাদক

Izala-e-Auhaam

(The Removal of Misconceptions)

Part-1

This famous book written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, the Promised Messiah and Mahdi (as) contains some specific subject-matters, where he (as) compared the miracles shown by Jesus and himself (as). He also answered some objections generally raised against his claim to be the Promised Messiah and Mahdi. He also mentioned the signs which where prophesied in the previous scriptures regarding the advent of the Promised Messiah, and how all those signs have been fulfilled. The death and the alleged resurrection of Jesus are fully discussed in the light of the Christian and Muslim scriptures. Furthermore, he (as) discussed an irrefutable criterion through which the truth or falsehood of his claim can be justified and the true Messiah can be easily identified. This book also contains a commentary on 30 verses of the Holy Quran and various traditions of Prophet Muhammad (sa), which proves beyond doubt that Jesus the son of Mary passed away and died a natural death. The significance of the words “Nuzul” and “Tawaffi” have also been shed light upon in this book. Gog and Magog is another aspect that he (as) highlighted here. He also declared a prizemoney of 1,000 rupees to anyone who could show different meanings to the ones he showed of the words “Nuzul” and “Tawaffi”.

© Islam International Publications Ltd., U. K.

9789849910701